পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য

Thematic and Musical Varieties in The Songs of Radharamon and Hason Raja

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মো. রওশন আলম
নিবন্ধন নম্বর : ২৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য

Thematic and Musical Varieties in The Songs of Radharamon and Hason Raja

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মো. রওশন আলম
নিবন্ধন নম্বর : ২৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারপত্র

আমি নিম্ন-স্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য' শীর্ষক পিএইচ. ডি. গবেষণাকর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন ও অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছি। এটি আমার মৌলিক এবং একক গবেষণা।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের কোন অংশ বা অংশবিশেষ অপর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের নিমিত্তে উপস্থাপন করিনি।

এতদ্ব্যতীত, বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ বা অংশবিশেষ কোথাও প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থাকারে প্রকাশের নিমিত্তে উপস্থাপন করিনি।

গবেষক

মো. রওশন আলম
নিবন্ধন নম্বর : ২৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো. রওশন আলম কর্তৃক উপস্থাপিত 'রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য' শীর্ষক পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্তভাবে উপস্থাপনের পূর্বে গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. গবেষণার শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবন্ধ বিভাগীয় উচ্চতর শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে সফলভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি এবং বর্তমান অভিসন্দর্ভে কোনো অংশ বা অংশবিশেষ অন্য কোথাও প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি।

28.12.2025

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০

বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জ্ঞানচর্চা একাকী যাত্রা, কিন্তু এ পথে ছায়ার মতো পাশে থাকেন অনেকে– কখনো দৃশ্যমান, কখনো নীরব ও অন্তরালে। আমার পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের এই দীর্ঘ, জটিল ও ধৈর্যনির্ভর যাত্রাটি কেবল আমার একক শ্রমের ফসল নয়; এটি অনেক প্রজ্ঞাবান, সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষের অবদান ও ভালোবাসার সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের প্রতি আমার হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁর আলোকবর্তিকায় আমার গবেষণাযাত্রা আলোকিত হয়েছে– আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী। তাঁর প্রজ্ঞা, বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তরিক তত্ত্বাবধানে আমার চিন্তাশক্তি শানিত হয়েছে। গবেষণার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও ভালোবাসা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে প্রতিটি স্তরে। তিনি কেবল একজন তত্ত্বাবধায়ক নন– তিনি একজন মেধার দীপ্ত অভিভাবক, একজন নির্ভরযোগ্য আলো, যাঁর প্রতিটি পরামর্শ ছিল আমার জন্য দিক–নির্দেশনার দ্যুতি। জটিলতম সময়ে যখন নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারাতে বসেছি, তখন তাঁর সাহস যোগানোর অনুপ্রেরণাই ছিল পুনরুজ্জীবনের স্পর্শ। এমন একজন মননশীল পথপ্রদর্শক পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি। এই দুই মহান প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত সহযোগিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা এবং একাডেমিক পরিবেশ আমার গবেষণাকাজকে প্রভাবিত করেছে প্রতিনিয়ত। গবেষণার বিভিন্ন ধাপে উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের অকুণ্ঠ সহায়তা আমাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, গবেষণাগার, তথ্যভাণ্ডার এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এই অভিসন্দর্ভের ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রতি, যাঁরা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য, সময় এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে সহায়তা করেছেন– তাঁদের অনেকেই হয়তো এই পৃষ্ঠায় নাম পাবেন না, কিন্তু তাঁদের উদারতা আমার গবেষণার আত্মা। তাঁদের আন্তরিকতা ও অন্তর্জগতে প্রবেশ করার অনুমতি আমাকে বাস্তবতাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। আমার গবেষণাসঙ্গী ও বন্ধুদের প্রতিও অন্তরের কৃতজ্ঞতা। গবেষণার পথচলা অনেকটা দীর্ঘ এক পর্বতারোহণ, যেখানে ক্লান্তির মুহূর্তে এক বন্ধুর কাঁধ কিংবা পরামর্শ হয়ে ওঠে নতুন উৎসাহের বাতাস। তাঁরা ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা, কখনো আলোচনার সঙ্গী, কখনো সমালোচনার দর্পণ, আবার কখনো নিঃশব্দ শ্রোতা। এ যাত্রায় তাঁদের নানামাত্রিক আন্তরিকতা আমাকে অনেক ঋদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার জীবনের সবচেয়ে দৃঢ় ভিত্তি– আমার পরিবার। আমার বাবা মঈন উদ্দিন ও মা রমিছা খাতুন, যাঁদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, নীরব প্রার্থনা এবং আত্মত্যাগের ছায়া আমি প্রতিনিয়ত অনুভব করেছি। তাঁদের চোখে আমি দেখেছি আমার স্বপ্নের প্রতিবিম্ব। আমার জীবনসঙ্গী আফরিনা আক্তার ছিলেন আমার জন্য আশ্রয়ের এক আশ্চর্য নীড়– তিনি কেবল পারিবারিক ভারই বহন করেননি, বরং আমার মানসিক ভারও ভাগ করে নিয়েছেন নিঃশব্দে। সংসার, গবেষণা, আবেগ আর ক্লান্তির জটিল সমীকরণে তিনি সবসময় আমাকে সহানুভূতির পরশ দিয়েছেন।

সবশেষে, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গবেষণার প্রতিটি সফল অধ্যায়, প্রতিটি নতুন ভাবনার জন্ম, প্রতিটি মসৃণ সমাপ্তির পেছনে আমি অনুভব করেছি তাঁর অসীম দয়া ও কৃপা। যেসব মুহূর্তে মনে হয়েছে আমি আর পারছি না, তখনই অন্তরের গভীর থেকে ভেসে এসেছে অনির্বচনীয় এক শক্তি– যা আমাকে আবার উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। এ যেন আলোর অতলান্তিকা থেকে আসা এক অদৃশ্য আশ্বাস।

এই অভিসন্দর্ভ কেবল একটি একাডেমিক প্রয়াস নয়– এটি আমার জীবনের একটি সাধনা, যেখানে বহু মানুষের ভালোবাসা, সহানুভূতি ও অবদানের স্পর্শ আছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলমগীর পারভেজ, বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ড. সাহেদ মন্তাজ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর সংগীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইয়াতসিংহ শুভ; হাসান মুহাম্মদ রাসেল, ড. তপন বাগচী, মোঃ আব্দুল কাদের, মোঃ রাগীব ছাফওয়ান, মোঃ নাজমুল হোসেন এবং শ্রী সন্তোষ কুমার সেন প্রমুখ। আমি তাঁদের সকলকে হৃদয়ের গভীরতা থেকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা আমার এই পথচলায় সহযাত্রী হয়েছেন– নীরবে, নিঃশব্দে, তবু অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে।

মো. রওশন আলম

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : গবেষণা পরিচিতি ১

১.১ পটভূমি ১
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ১
১.৩ গবেষণার তাৎপর্য ২
১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ৩
১.৫ গবেষণার গুরুত্ব ৩
১.৬ গবেষণার পদ্ধতি ৬
১.৭ সাহিত্য পর্যালোচনা ৭
১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১০
১.৯ উপসংহার ১০

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাধারমণ ও হাসন রাজার মানসগঠন ও জীবনদর্শন ১৪

২.১ রাধারমণের মানসগঠন ও জীবনদর্শন ১৪
২.২ হাসন রাজার মানসগঠন ও জীবনদর্শন ৩০
আত্মতত্ত্ব ৩৭
দেহতত্ত্ব ৩৯
অসাম্প্রদায়িকতা ৪০
সুফিবাদ ৪১
মানব ও প্রকৃতিপ্রেমী হাসন রাজা ৪৩

তৃতীয় অধ্যায় : রাধারমণের গানের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য ৪৮

৩.১ রাধারমণের গানের বিষয় ৪৮
৩.১.১ ভক্তিমূলক ভাববাণী ৫২
৩.১.২ গুরুতত্ত্ব বিষয়ক ভাববাণী ৫৭
৩.১.৩ দেহতত্ত্ব বিষয়ক ভাববাণী ৬২
৩.১.৪ গৌরপদমূল ভাববাণী ৬৬
৩.১.৫ গোষ্ঠ বিষয়ক ভাববাণী ৭৩
৩.১.৬ পূর্বরাগ বিষয়ক ভাববাণী ৭৮
চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদ ৭৯
জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদ ৮০
বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদ ৮০
গোবিন্দদাসের পূর্বরাগের পদ ৮০
৩.১.৭ অনুরাগ বিষয়ক ভাববাণী ৮৯
৩.১.৮ অভিসার বিষয়ক ভাববাণী ৯৮
৩.১.৯ বাসকসজ্জা বিষয়ক ভাববাণী ১০০

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১০ বিরহ বিচ্ছেদ বিষয়ক ভাববাণী ১০৫
৩.১.১১ মান ও মানভঞ্জন বিষয়ক ভাববাণী ১১২
৩.১.১২ মিলন বিষয়ক ভাববানী ১২০
৩.১.১৩ মনোশিক্ষা বিষয়ক গীতি ১২৪
৩.১.১৪ বৈষ্ণব সহজিয়া বিষয়ক ভাববাণী ১৩১
শান্তরস ১৩২
দাস্যরস ১৩২
সখ্যরস ১৩৩
বাৎসল্যরস ১৩৩
মধুররস ১৩৩
৩.১.১৫ ধামাইল ১৩৯
৩.১.১৬ জলভরা বিষয়ক গান ১৪০

৩.২ রাধারমণের গানের সুরবৈচিত্র্য ১৪৬
৩.২.১ আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি ১৪৮
৩.২.২ রাধারমণের গানে বিচ্ছেদী সুরের প্রভাব ১৫৫
৩.২.৩ রাধারমণের গানে ধামাইল সুরের প্রভাব ১৬৩
৩.২.৪ রাধারমণের গানে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব ১৬৫
৩.২.৫ রাধারমণের গানে বাউল সুরের প্রভাব ১৭৫

চতুর্থ অধ্যায় : হাসন রাজার গানের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য ১৮৮
৪.১ হাসন রাজার গানের বিষয় ১৮৮
৪.১.১ হাসন রাজার গানে শরিয়ততত্ত্ব ১৯৭
৪.১.২ হাসন রাজার গানে নবিতত্ত্ব ২০১
৪.১.৩ হাসন রাজার গানে মুর্শিদতত্ত্ব ২০৪
৪.১.৪ হাসন রাজার গানে আশেক মাশুক ২০৮
৪.১.৫ হাসন রাজার গানে সুফি রহস্য ২১২
৪.১.৬ হাসন রাজার গানে মারফততত্ত্ব ২২৩
৪.১.৭ হাসন রাজার গানে ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ তত্ত্ব ২২৯
৪.১.৭ হাসন রাজার গানে পুরাণতত্ত্ব ২৩৫

৪.২ হাসন রাজার গানের সুরবৈচিত্র্য ২৪৪
৪.২.১ হাসন রাজার গানে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব ২৫১
৪.২.২ হাসন রাজার গানে সারি গানের সুরের প্রভাব ২৫৪
৪.২.৩ হাসন রাজার গানে মারেফতি গানের সুরের প্রভাব ২৫৮
৪.২.৪ হাসন রাজার গানে ধামাইল সুরের প্রভাব ২৬২
৪.২.৫ হাসন রাজার গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব ২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ২৭১

৫.১ পটভূমি ২৭১

৫.১.১ ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ২৭৪

৫.১.২ গীতিকবিতার আঙ্গিক ও সুর ২৭৬

৫.১.৩ ছন্দ ও অলংকারে প্রকৃতি ২৭৯

৫.১.৪ ভনিতার ব্যবহার ২৮৩

৫.১.৫ প্রেমের ধরন ২৮৪

৫.২ বৈষ্ণবতত্ত্ব ও সুফিতত্ত্বের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ২৮৬

৫.৩ রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ২৮৯

৫.৪ রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে ব্যবহৃত তাল ২৯১

৫.৫ সমসাময়িক জনপ্রিয়তা ও পরিবেশনা ২৯১

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার ৩০৪

গ্রন্থপঞ্জি ৩০৯

পরিশিষ্ট ৩১৪

পরিশিষ্ট ১ : রাধারমণের বংশলতিকা ৩১৪

পরিশিষ্ট ২ : হাসন রাজার বংশলতিকা ৩১৬

পরিশিষ্ট ৩ : রাধারমণের আত্মপরিচয়ক ত্রিপদী ৩১৭

পরিশিষ্ট ৪ : হাসন রাজার আত্মপরিচয়ক ত্রিপদী ৩২৩

পরিশিষ্ট ৫ : রাধারমণের ছবি ৩২৪

পরিশিষ্ট ৬ : হাসন রাজার ছবি ৩২৫

পরিশিষ্ট ৭ : হাসন রাজার বাড়ি ৩২৬

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের ইতিহাসে লোকসংগীত এক অনন্য ধারাবাহিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, যার শিকড় বিস্তৃত সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও আত্মিক অভিজ্ঞতায়। এই লোকসংগীতের মূল সুরটি ধরা পড়ে বাংলার মহান কবি-সাধকদের গানে, যারা কেবল কবি বা গীতিকার ছিলেন না, বরং সমাজ-সংস্কৃতি ও আত্মার গভীর অন্বেষণকারী হিসেবে লোকজীবনের অন্তরতম বেদনা ও আনন্দকে আত্মস্থ করে সুরে ও বাণীতে প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনই কেবল গানের সাধক নন, একেকজন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক ভাবনার দুই বিপরীত ধারা, যাঁদের গান মানুষের অন্তর্জগতে প্রবেশ করে আত্মনিরীক্ষা ও মুক্তির কথা বলে।

রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা–দুজনেই জন্মেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সিলেট অঞ্চলে, তুলনামূলকভাবে নিরবচ্ছিন্ন লোকজ সাংস্কৃতিক ধারার মাঝে, যেখানে বৈষ্ণব ভাবধারা, সুফিতত্ত্ব, মরমিয়া চিন্তা ও সহজিয়া দর্শনের প্রভাব একসাথে কাজ করত। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষাপট এই গানের ভাব ও রূপ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রাধারমণ একজন সংস্কারবাদী বৈষ্ণব কবি ও গীতিকার, যিনি একাধারে ধর্মপ্রবণ এবং প্রেমনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর গান বৈষ্ণব সাধনার রসতত্ত্ব ও অনুরাগ দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। অপরদিকে, হাসন রাজা এক পরিণত মরমিয়া সাধক, যিনি জীবনের পরিপূর্ণতাকে খুঁজেছেন অন্তরলোকের আলোকে এবং গানকে ব্যবহার করেছেন এক আত্মদর্শন ও বিশ্বচেতনার ভাষা হিসেবে।

অভিসন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘গবেষণা পরিচিতি’। এই অধ্যায়ে গবেষণার পটভূমি, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, যৌক্তিকতা, গুরুত্ব, পদ্ধতি, সাহিত্য পর্যালোচনা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘রাধারমণ ও হাসন রাজার মানসগঠন ও জীবনদর্শন’। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে দুই কবির মানসগঠন ও জীবনদর্শন নিয়ে। রাধারমণ দত্ত ছিলেন একজন শাস্ত্রীয় শিক্ষায় পুষ্ট, পিতার অনুপ্রেরণায় গীতিরচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠা বৈষ্ণব সাধক। তাঁর জীবনের প্রতি বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন, ভক্তিরস ও প্রেমতত্ত্বের মেলবন্ধন তাঁকে এক অদ্বিতীয় গীতিকার করে তুলেছে। তাঁর চোখে জগৎ কেবল দুঃখ ও মায়ার মিশ্রণ নয়, বরং ঈশ্বরানুরাগে পূর্ণ এক লীলাভূমি। তাঁর গানগুলোতে একাধারে আছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, ভক্তির আত্মসমর্পণ এবং দেহতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব ভাবনার সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ। অন্যদিকে,

Dhaka University Institutional Repository

হাসন রাজা ছিলেন জীবনের প্রাক-পরিণতির দ্বন্দ্বে দগ্ধ, একজন সুফিপ্রাণ ব্যক্তি। জীবনের আভিজাত্য, বিলাসিতা ও বিলোপসীমায় পৌঁছে তিনি সন্ধান করেন আত্মা ও ঈশ্বরের। একপ্রকার ব্যক্তিগত অনুশোচনা, নিঃসঙ্গতা এবং তীব্র আত্মান্বেষণ তাঁকে পরিণত করে এক মরমিয়া সাধকে। তাঁর গানে জীবন ও মৃত্যুর ধ্যান, দেহ ও রুহের সম্পর্ক, মানব-ঈশ্বরের সেতুবন্ধন, ও নিরাকার ঈশ্বর ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'রাধারমণের গানের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য'। এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে রাধারমণের গানের বিষয়বস্তু ও সুরের বৈচিত্র্য। তাঁর গান বাংলা লোকসংগীতের এক নিটোল রূপায়ণ, যেখানে মেলে বৈষ্ণব পদাবলির স্বচ্ছতা এবং দেহতত্ত্বের গূঢ় দার্শনিকতা। তাঁর রচনায় যেমন রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের পারস্পরিক প্রেম এবং বিচ্ছেদের ব্যথা, তেমনি আছে সংসার ও পরিতাপ, দেহ-মনের দ্বন্দ্ব, এবং আত্মসমর্পণের তত্ত্ব। সুরের ক্ষেত্রে রাধারমণ এক অনন্য সংযোজক। তিনি উত্তর-পূর্ব বাংলার ধামাইল, ভাটিয়ালি, সারি ও কীর্তন ধারার সংমিশ্রণে এক নিজস্ব সংগীতজগৎ নির্মাণ করেন। তাঁর গানে শাস্ত্রীয় রাগের প্রভাব থাকলেও তা জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আত্মিক করে তোলেন স্থানীয় সুর ও রচনার মাধ্যমে। তাঁর গানগুলো মূলত মুখে মুখে প্রচারিত হলেও সেগুলোতে রয়েছে ছন্দের সাবলীলতা, ভাষার সারল্য ও ভাবের গভীরতা। তাঁর গানের সুর এমনভাবে গঠিত যে তা শ্রোতার মনে চঞ্চলতা নয়, বরং গভীর ভাবাবিষ্টতা জাগায়।

'হাসন রাজার গানের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরের বৈচিত্র্য নিয়ে। হাসনের গানে মরমিয়া ভাবধারার একটি অন্তর্গত আকুলতা আছে। তিনি তাঁর গানে প্রশ্ন তুলেছেন অস্তিত্বের, জীবনের অর্থের, ঈশ্বরের কাছে মানুষের স্থান নিয়ে। তাঁর সৃষ্ট গানের প্রধান অনুষঙ্গ হলো আধ্যাত্মিক বোধের গভীর অনুসন্ধান। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার বসবাস, সৃষ্টি এবং স্রষ্টা এক অভিন্ন সূতায় গাঁথা মালা। তাই তিনি বলেন, 'বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি, সোনামামি সোনা মামিগো, আমারে করিলারে বদনামি'–এ এক অনন্য মানবতাবাদী সৃষ্টি, যেখানে ধর্ম, জাতি, বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকেই ঈশ্বরের অনুপম প্রকাশ হিসেবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। হাসনের গানে প্রেম নিছক ব্যক্তি বা লৌকিক প্রেম নয়, বরং এক গূঢ়তর আত্মিক আকর্ষণ, যা আত্মার অনুপম অঙ্গীকার। সুরের দিক থেকে হাসনের গান মূলত ভাটিয়ালি, বাউল, মারফতি ও সুফি ধারার সংমিশ্রণ। তাঁর সুর এমনভাবে তৈরি যে তা একদিকে সহজ, আবেগঘন ও হৃদয়গ্রাহী, আবার অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ও ভাবগম্ভীর। তিনি এক ধরনের অন্তর্জাগতিক সুর সৃষ্টি করেছেন, যা একযোগে সৃষ্টি করে ভাব ও রসের মিলন।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায় 'রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ'। এই অধ্যায়ে তাঁদের গানের নানামাত্রিক তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ মধ্যে ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, গীতিকবিতার আঙ্গিক ও সুর, ছন্দ ও অলংকারের প্রকৃতি, ভণিতার ব্যবহার, প্রেমের ধরন, বৈষ্ণব ও সুফি তত্ত্বের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, গানে ব্যবহারিত তাল ও বাদ্যযন্ত্র, সমসাময়িক জনপ্রিয়তা এবং পরিবেশনা ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই তুলনা শুধু গানের বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, বরং গানের কাঠামো, সুরচয়ন, আধ্যাত্মিক দর্শন এবং সমাজ ও মানবজীবন উপলব্ধির ক্ষেত্রেও বিশ্লেষিত হয়েছে। রাধারমণের গান যেখানে এক প্রকার ভক্তিভাব ও নির্ধারিত ভাবতত্ত্বের অন্তর্গত, সেখানে হাসনের গান তুলনামূলকভাবে স্বাধীন, প্রশ্নাত্মক ও পরমাত্মাকেন্দ্রিক। রাধারমণ তাঁর গানে ঈশ্বরের প্রেমে নিমজ্জিত হওয়াকে মুক্তির পথ মনে করেন, আর হাসন রাজা আত্মদর্শন ও মানুষকে জানার মধ্যেই ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি খোঁজেন। তাঁদের দুজনের গানই মানুষকে ভাবায়, অনুভব করায় এবং এক ধরনের নীরব চেতনার জাগরণ ঘটায়। তবে এই দুই সাধকের সুরের জগৎ, ভাষার রীতিমালা এবং আঙ্গিকগত প্রকাশ ভিন্ন হলেও, তাঁদের মূল অভিসার হলো আত্মার মুক্তি এবং প্রেমের চরম উপলব্ধি।

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সার-সংক্ষেপ এবং গবেষণার উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে। দেখা যায়, রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য নিয়ে এই গবেষণা কেবল সংগীতগত দিক থেকেই নয়, একটি বৃহত্তর দার্শনিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই সাধকের অবস্থান ও অবদানকে মূল্যায়নের একটি প্রয়াস। এই দুই কবি কেবল তাঁদের সময় নয় বরং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক চেতনার জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হয়ে থাকবেন। তাঁদের গান এক ধরনের আত্মিক রেনেসাঁর ভাষা, যা মানুষকে অন্তরের ভেতরের প্রশ্ন করতে শেখায়, আর সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে এক অনন্ত যাত্রার আহ্বান জানায়।

সবশেষে গ্রন্থপঞ্জি, এবং পরিশিষ্টে রাধারমণ ও হাসনরাজার বংশলতিকা, তাঁদের আত্মপরিচায়ক ত্রিপদী, শিল্পী অঙ্কিত দুজনের ছবি, হাসন রাজার জমিদার বাড়ির ছবি ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা শিরোনাম : রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য

গবেষক : মো. রওশন আলম
বিভাগ : সংগীত

অ্যাবস্ট্রাক্ট

রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা বাংলার লোকসাহিত্যের জগতে দুটি শক্তিশালী নাম, যাঁরা ভিন্ন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারক হলেও একই মূলধারার একটি অভিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। রাধারমণ দত্ত ছিলেন বৈষ্ণব ভাবধারার অনুসারী, আর হাসন রাজা ছিলেন সুফি ও ইসলামি মরমিয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের এই ধর্মীয় অবস্থান তাঁদের গানকে ভিন্ন এক আধ্যাত্মিক রূপ দিলেও মানবিক অনুভূতি, আত্মার আর্তি এবং স্রষ্টার প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা–এই মৌলিক চেতনাতেই তাঁরা অভিন্ন হয়ে ওঠেন। এই দুই সাধক কবির গান সমাজের প্রান্তিক মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে, কারণ তাঁরা কাব্য ও সুরে তুলে এনেছেন সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ এবং অতল এক অন্তর্দর্শনের খোঁজ।

রাধারমণ দত্তের গান প্রধানত বৈষ্ণব পদাবলির আদলে রচিত, কিন্তু সুর ও ছন্দে তিনি লোকসংগীতের পরম্পরাকে এক নতুন মাত্রা দেন। তাঁর সৃষ্ট ধামাইল গান আজও গ্রামীণ বিয়ের অনুষ্ঠানে জনপ্রিয়; এর মধ্য দিয়ে একধরনের সামষ্টিক ভক্তি ও আনন্দের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, হাসন রাজার গান একেবারেই অন্তর্মুখী। তাঁর গানে পাওয়া যায় মরমি আত্মজিজ্ঞাসা, পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব এবং স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর রচনায় সুফি দর্শনের যে উপাদানগুলি বিদ্যমান, তা কোনো বিশেষ ধর্মের প্রচারের চেয়ে বরং একটি সার্বজনীন মানবিক চেতনার ওপর জোর দেয়। সুর ও ছন্দের বিচারে রাধারমণ ও হাসন উভয়েই লোকসঙ্গীতের নানা উপধারা যেমন ভাটিয়ালি, মারফতি, মুর্শিদি, সারিগান প্রভৃতি ধারার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। সাহিত্যমূল্য বিচারে তাঁদের গান কেবল সংগীতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক একটি কাব্যিক রচনার মতোই তা গভীর জীবনবোধ ও মানবিক চেতনার ধারক। রাধারমণের ভাষা ছিল সহজ, ছন্দবদ্ধ এবং চিত্রময়। প্রেম, বিরহ, ভক্তি ও প্রকৃতির এক অপূর্ব সমাহার তিনি গড়েছেন তাঁর পদাবলিতে। অন্যদিকে হাসন রাজা তাঁর গানগুলোয় ব্যবহার করেছেন সরল সিলেটি উপভাষা, যা তাঁর মরমি ভাবনার গভীরতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে অসাধারণ দক্ষতায়। তাঁর শব্দচয়ন, উপমা ও রূপকল্প একাধারে কবিত্বপূর্ণ ও দার্শনিক–যা লোকসাহিত্যের পরিধিকে প্রসারিত করেছে বহু দূর।

এই দুই লোককবির অবদান বাংলা লোকসংগীতকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি বরং তারা প্রমাণ করেছেন যে আধ্যাত্মিক চেতনা, সংগীত এবং কাব্য মিলেই মানুষের আত্মার প্রকৃত ভাষা। ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা সামাজিক পরিচয়কে অতিক্রম করে তাঁরা যে ধারা তৈরি করেছেন, তা আজও জীবন্ত এবং প্রাসঙ্গিক। তাঁদের গান আজও গীত হয়, চর্চিত হয়, গবেষণা হয়–এটা কেবল তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বকেই নয়, বরং তাঁদের সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতাকেও প্রমাণ করে।

যদিও তাঁদের গানের প্রতি শিল্পী ও গবেষকদের দিনদিন আগ্রহ বাড়ছে, কিন্তু মূল দর্শন ও রচনাশৈলী অনেক সময় মূল হারাচ্ছে। কিছু শিল্পী শুধু গানটির জনপ্রিয় অংশ গ্রহণ করে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবেশন করছেন, যার ফলে গানগুলোর মূল ব্যঞ্জনা হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, অনেক গান এখনো গ্রন্থিত হয়নি, ফলে মৌলিক রচনাগুলোর সংরক্ষণ ও সঠিক পরিবেশনার অভাব রয়েছে। এছাড়া, প্রযুক্তি–নির্ভর পরিবেশনায় যন্ত্রানুষঙ্গ কখনো কখনো মূল ভাবধারাকে ছাপিয়ে যায়, যা গানগুলোর বৈষ্ণব ও মরমি আবহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবুও, রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের চর্চা এখন এক নবজাগরণে পৌঁছেছে বলা চলে। নতুন প্রজন্মের শিল্পী, গবেষক ও শ্রোতারা যদি এই গানগুলোর আত্মিক দিক ও দর্শন অনুধাবনের চেষ্টা করেন, তবে এই গানের ঐতিহ্য আরো সমৃদ্ধ হবে। প্রামাণ্য দলিল, সংরক্ষণশীল পরিবেশনা এবং গবেষণাভিত্তিক চর্চার মাধ্যমে রাধারমণ ও হাসন রাজার গান বাংলা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে টিকে থাকবে বহুকাল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

বাংলা লোকসংগীতের অন্যতম দুজন বিশিষ্ট সাধক হলেন রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা। তাঁদের গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত, তাঁরা যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের (আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সুফি তত্ত্ব, ফানা-ফিল্লাহ, পুরাণতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, মিলন, বিরহ, গৌরপদ, প্রার্থনা, গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অনুরাগ, সহজিয়া) ইত্যাদি বিষয়ের উপর গান রচনা করেছেন এবং যে সুররূপতত্ত্ব (ভাটিয়ালি, সারি, বাউল, মুরর্শিদি, বিচ্ছেদ, ধামাইল ও শাস্ত্রীয় সংগীত) তাঁদের লেখন ও সুরের উপর প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান গবেষণায় এই দুটি দিক একত্রিত করে পারস্পারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু, ভাবধারা এবং সুরবৈচিত্র্যের মধ্যে বিদ্যমান মিল ও অমিলকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে অনুসন্ধান করা। উভয় সাধককবি ও গায়কের গান বাংলা লোকসংগীতের ধারায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁদের গানের মধ্য দিয়ে যে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে, তা এ গবেষণার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এই গবেষণায় রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে প্রতিফলিত প্রেম, ভক্তি, সমাজচেতনা, জীবনদর্শন ও মানবতাবোধের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের গানের সুর, তাল, রাগ-রাগিণী ও সংগীত কাঠামোর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হবে।

এ গবেষণার আরেকটি লক্ষ্য হলো উভয় কবির গানে ব্যবহৃত ভাষা, ছন্দ, আঞ্চলিক শব্দ ও সংগীত উপাদানের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা, যার মাধ্যমে তাঁদের সৃষ্টির নান্দনিক সৌন্দর্য ও সংগীতচিন্তার স্বাতন্ত্র্য উদ্ভাসিত হবে। পাশাপাশি রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের মাধ্যমে বাংলার লোকসংস্কৃতি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার যে প্রকাশ ঘটেছে, তা অনুধাবন করাও এ গবেষণার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি, তাঁদের সুর ও ভাবধারার আধুনিক সংগীত ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লোকসংগীতের ধারাবাহিকতা ও রূপান্তরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই গবষেণার মূল উদ্দশ্যে হলো রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু, ভাবধারা এবং সুরবেচিত্র্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা। গবষেণার নির্দিষ্ট উদ্দশ্যেসমূহ নিম্নরূপ :

১. রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানে প্রকাশতি ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও মানবকি ভাবধারার বিশ্লেষণ করা।

২. তাঁদের গানের বিষয়বস্তুতে প্রেম, ভক্তি, সমাজচতেনা ও জীবনদর্শনের উপস্থাপন পর্যালোচনা করা।

৩. উভয় গায়কের সুর, তাল ও সংগীত কাঠামোর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

৪. দুই শিল্পীর গানরে ভাষা, ছন্দ ও আঞ্চলকি উপাদানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।

৫. রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের মাধ্যমে বাংলার লোকসংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রকাশভঙ্গি অনুসন্ধান করা।

৬. লোকসংগীতের ধারায় তাঁদের অবদান ও প্রভাব অনুধাবন করা।

৭. আধুনকি সংগীতে তাঁদের সুর ও ভাবধারার প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়ন করা।

১.৩ গবেষণার তাৎপর্য

বাংলা লোকসংগীতের ভুবনে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁদের গান শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি বাঙালির আধ্যাত্মিক চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ ও মানবপ্রেমের গভীর প্রতিফলন। তাঁদের গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা লোকসংগীতের দর্শন, রূপান্তর এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা অনুধাবন করা সম্ভব। এই গবেষণা বাংলা লোকসংগীতের ধারায় সাধক সংগীত ও ভাবসংগীতের মধ্যে নিহিত সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারার পরিচয় নতুনভাবে উদ্ভাসিত করেছে।

রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গান আমাদের সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি, মানবপ্রেম, আত্মচেতনা ও আধ্যাত্মিক জাগরণের যে বাণী প্রচার করেছে, তা আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁদের গানের সাহিত্যিক ও সংগীতিক দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ গবেষণা বাংলা সংগীতচিন্তা ও লোকসংস্কৃতি গবেষণায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংগীত গবেষক, সাহিত্য বিশ্লেষক ও সংস্কৃতিবিদদের জন্য এটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী ভিত্তি।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা বাংলার লোকসংস্কৃতির শিকড় অনুধাবন ও সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে রাধারমণ ও হাসন রাজার সংগীতধারার আধুনিক সংগীতে প্রভাব এবং এর সাংস্কৃতিক পুনর্পাঠ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁদের গানের প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্যবোধ তুলে ধরতে সহায়তা করবে।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলা লোকসংগীতের ইতিহাসে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা এমন দুই সাধক, যাঁদের গান কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার প্রকাশ নয়, বরং বাঙালি সমাজের নৈতিক, ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। তাঁদের গান বাংলার গ্রামীণ সমাজে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আত্মচেতনার জন্ম দিয়েছে, তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে ক্রমশ ম্-ান হয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে তাঁদের গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করা সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয়।

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণার গুরুত্ব নিহিত রয়েছে তাঁদের গানে নিহিত জীবনদর্শন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, প্রেম, ভক্তি ও মানবতার বাণী পুনরাবিষ্কারে। পাশাপাশি রাধারমণ ও হাসন রাজার সংগীতধারার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বোঝা সম্ভব হবে–কীভাবে আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তাঁদের সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক সংগীতে তাঁদের ভাবধারার প্রভাবও এই গবেষণার আলোচ্য, যা বাংলাদেশের সংগীত-গবেষণার ক্ষেত্রকে নতুন দৃষ্টিকোণ প্রদান করবে।

অতএব, এ গবেষণা শুধুমাত্র সংগীতচর্চার জন্য নয়, বরং বাঙালির সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনচিন্তার গভীরতর উপলব্ধির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এটি বাংলাদেশের লোকসংগীত গবেষণায় একটি ঘাটতি পূরণ করবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য নতুন দিক-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

১.৬ গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু, ভাবধারা ও সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণের জন্য গ্রন্থপাঠ, গানপাঠ, এবং সংগীত বিশ্লেষণকে গবেষণার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও

Dhaka University Institutional Repository

তুলনা করার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive) ও তুলনামূলক (Comparative) পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্যসূত্র হিসেবে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার মৌলিক গানসংগ্রহ, পুথি, অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং, এবং প্রত্যক্ষ সংগীতচর্চা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বই, গবেষণা নিবন্ধ, প্রবন্ধ, থিসিস, এবং লোকসংগীত বিষয়ক সাময়িকী ও জার্নালে প্রকাশিত রচনাসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে বিষয়ভিত্তিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে বিষয়বস্তু, ভাব, সুর, তাল ও সংগীত কাঠামোর দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ গবেষণায় গানের বিষয়বস্তুর দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক অনুধাবনের জন্য ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ (Interpretative Analysis) প্রয়োগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের সুররীতি, রাগ-রাগিণী ও তাল-লয়ের উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁদের সংগীতধারার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সবশেষে, সংগৃহীত উপাত্ত ও বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা লোকসংগীতের ধারায় তাঁদের অবদান, প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা এ গবেষণাকে একটি সামগ্রিক ও প্রামাণ্য রূপ দিয়েছে।

১.৭ সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলা লোকসংগীতের ইতিহাসে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা দুইজন বিশিষ্ট সাধককবি ও সুরকার। তাঁদের গানে নিহিত রয়েছে বাঙালির ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, মানবপ্রেম, আত্মচেতনা ও আধ্যাত্মিক ভাবনা। এই দুই সাধকের জীবন, দর্শন ও গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা বর্তমান গবেষণার ভিত্তি ও প্রাসঙ্গিক আলোচ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

রাধারমণ দত্ত সম্পর্কিত গবেষণা পর্যালোচনা

জাহিদুল কবীরের *রাধারমণ দত্ত লোকদর্শন ও গীতিরূপ বিশ্লেষণ* (২০২১) গবেষণা-গ্রন্থটির প্রথম ভাগে বাংলার লোকজীবন ও অধ্যাত্ম সাধনধারা, প্রেমানলে অঙ্গজ্বলে ও রাধারমণের সাধনগীত, বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও সহজিয়া সাধনা; দ্বিতীয় ভাগে সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে এর গুরুত্ব, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণে গীতশৈলীর ভূমিকা, বাংলার লোকগান ও রাধারমণের গানের তুলনামূলক আলোচনা; তৃতীয় ভাগে রাধারমণ দত্ত বৈষ্ণব কবি ও লোককবি প্রসঙ্গে; চতুর্থ ভাগে রাধারমণের গানের বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণিবিন্যাস ও রসতত্ত্ব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং পঞ্চম ভাগে বৈষ্ণব গানের স্বরলিপি তুলে ধরা হয়েছে।

তপন বাগচীর (সম্পা.) *রাধারমণের গান* (২০০৯) গবেষণা-গ্রন্থের প্রথম ভাগে রাধারমণের জীবনী ও জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; পরবর্তী অংশে রাধারমণের গান প্রকাশ করা হয়েছে।

নন্দলাল শর্মা (সম্পা.) *রাধারমণ গীতিমালা* (২০১৪) গ্রন্থের প্রথম ভাগে রাধারমণের জীবনকথা, সংগীত চর্চা, রাধারমণ গীতির সাহিত্যমূল্য, লোকসংস্কৃতি ও রাধারমণ; এবং দ্বিতীয় ভাগে রাধারমণের গানের বিষয় ও সংগৃহীত গানের সংকলন উপস্থাপিত হয়েছে।

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর *বাউল কবি রাধারমণ* গ্রন্থে গবেষক রাধারমণের জীবনকথা, গীতসংগ্রহের কথা, গানের ভাষা, গীতিছন্দ, কাব্যমূল্য ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন।

বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) *রাধারমণ-এর গান ও স্বরলিপি* (২০১৫) গবেষণা-গ্রন্থের প্রথম ভাগে রাধারমণের বংশপরিচয় ও জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রাধারমণের গানের তালিকাসহ স্বরলিপি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশ্বজিৎ রায় (সম্পা.) *রাধারমণের অপ্রকাশিত গান* গবেষণা-গ্রন্থের প্রথম ভাগে রাধারমণের জীবনীসহ ২১৭টি গান প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া রাধারমণের ২০টি গানের স্বরলিপি স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে।

মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম প্রণীত *লোককবি রাধারমণ : জীবনদর্শন ও কবিতা* শীর্ষক গবেষণা-গ্রন্থে রাধারমণ দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, রাধারমণের দর্শন, বৈষ্ণব পদাবলির ধারায় রাধারমণের কবিতা, রাধারমণের কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক, বৈষ্ণব পদ রচনায় রাধারমণের স্বকীয়তা, রাধারমণের রচনায় পূর্ববর্তী কবিদের সাহিত্যের প্রভাব এবং পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের রচনায় রাধারমণের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুমনকুমার দাশ (সম্পা.) *অগ্রন্থিত রাধারমণ* গ্রন্থের ভূমিকা অংশে রাধারমণের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রাধারমণের অগ্রন্থিত ৪৬টি গান স্থান পেয়েছে।

সৈয়দ মুরাদুল ইসলাম (সম্পা.) *রাধারমণ দত্তের গানসংগ্রহ* গ্রন্থে রাধারমণ দত্তের গীতিসম্ভার নিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিকতা, ভক্তি, প্রেম ও মানবিক চেতনার দিকগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে রাধারমণের বৈষ্ণব ভাবধারা ও সুররীতির বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"রাধারমণ দত্তের গানের অন্তর্গত মহিমা" শীর্ষক প্রবন্ধে গবেষক অসীম সাহা রাধারমণ দত্তের জীবন ও গানে বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শনের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

রাধারমণ দত্তকে কেন্দ্র করে রচিত এ-সব গবেষণার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো–মূলত রাধারমণের জীবনী, আধ্যাত্মিক দর্শন, ধর্মভাবনা এবং লোকসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব গবেষণার মধ্যে রাধারমণের জীবনদর্শন, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, শৈশব ও যৌবনের ঘটনা, দেহতত্ত্বভিত্তিক ভাবধারা, এবং সহজিয়া-বাউল চিন্তার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে ব্যক্তি রাধারমণের আত্মিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট কিছুটা পরিষ্কার হলেও, শিল্পী ও কবি রাধারমণের যে একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে তা এই গবেষণাগুলোতে পরিপূর্ণভাবে উঠে আসেনি।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীবনীভিত্তিক গ্রন্থে রাধারমণের গানকে শুধুই আধ্যাত্মিক বা ভক্তিমূলক সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব গবেষণায় গানের ভাব, অর্থ ও দর্শন বিশ্লেষণ করা হলেও, গানের ভাষারীতি, ছন্দ-প্রকৃতি, সাহিত্যরূপ এবং উপমার ব্যবহার ইত্যাদি সাহিত্যিক দিকগুলো উপেক্ষিত থেকেছে। তেমনভাবেই অবহেলিত থেকে গেছে রাধারমণ দত্তের গানে সুরের বৈচিত্র্য এবং সুরারোপের শৈল্পিকতা। অথচ তাঁর গানসমূহে যে বৈচিত্র্যময় রাগ-রাগিণী, তাল-লয় এবং আঞ্চলিক সুরপ্রবাহের সম্মিলন ঘটেছে, তা বাংলা লোকসংগীতের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সুরের এই বিশাল সম্ভার কেবল শ্রুতিমাধুর্যই নয়, বরং রাধারমণের গানের ভাবসম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তার সৃষ্ট সুরের কাঠামোতে বৈষ্ণব, শাক্ত, সুফি এবং আঞ্চলিক ধারা একত্রে প্রবাহিত হয়েছে, যা তাকে একজন সুরসাধক হিসেবেও বিশিষ্টতা প্রদান করে। কিন্তু পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর অধিকাংশই এই দিকটি এড়িয়ে গেছে, ফলে রাধারমণ দত্তের গানের সংগীতগত মূল্যায়ন যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তবে অল্পসংখ্যক গবেষণায় রাধারমণের গানের সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। কেউ কেউ তার গানের শব্দচয়ন, উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার, লোকজ শব্দভাণ্ডার, এবং আবেগপ্রবণতার উপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এই আলোচনা তুলনামূলকভাবে সীমিত এবং খণ্ডিত। ফলে বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় রাধারমণ দত্তের কাব্যিক অবদান সেভাবে মূল্যায়িত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

এইসব গবেষণা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট–রাধারমণ দত্তকে নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি একপাক্ষিক প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান ছিল। তাঁর দর্শনচিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা গভীরভাবে আলোচিত হলেও, শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতে তার অবদান এখনো প্রান্তিকভাবে বিবেচিত।

পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো রাধারমণের সাধকসত্তাকে যথার্থ মর্যাদা দিলেও, কবিসত্তা, সুরসাধক রূপ এবং সাহিত্যিক প্রতিভাকে ততটা তুলে ধরতে পারেনি। বর্তমান গবেষণায় এই ঘাটতিগুলো পূরণ করে রাধারমণ দত্তকে একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়নের যথাসম্ভব প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

হাসন রাজা সম্পর্কিত গবেষণা পর্যালোচনা

আবু সাঈদ জুবেরী রচিত মরমি *কবি হাসন রাজা* (২০১৭) শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম ভাগে হাসন রাজার জীবনী এবং দ্বিতীয় ভাগে হাসন রাজার সংগীতের তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.) *হাসন রাজা মরমি মৃত্তিকার ফসল* (২০০৯) গ্রন্থে বাংলার মরমি লোকসংগীত, বাঙালির মন মনন-মানস ও ভাবসাধনার অন্তরঙ্গ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাসন রাজা গানের মানুষ তাই গানের ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর জীবনের কামনা-বাসনা আর জগৎ রহস্যের বাতেনী কথা। স্বশিক্ষিত এই লোক সঠিক অন্তত দর্শনের এমন কথা উচ্চরণ করেছে বা রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছে। চৌধুরী সম্পাদিত এই গ্রন্থে হাসন রাজার জীবন, দর্শন সংগীতের তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধাবলি স্থান পেয়েছে।

দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) *হাসন রাজা সমগ্র* একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য সংকলন। এ গ্রন্থে হাসনের গান, জীবনদর্শন ও লোকভাবনার ঐক্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

জাহিদুল কবীরের লেখা *বাঙালির মরমি সাধনায় হাসন রাজার গান* (২০২১) গ্রন্থের প্রথম ভাগে মরমি কবি হাসন রাজার জীবন, সাধনা, গ্রামীণ গীতধারা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে হাসন রাজার কৈশোরে সংগীত চর্চা, জমিদারি পরিচালনা, সংগীতের মুক্তি, সংগীত আসরে হাসন রাজা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে হাসন রাজার গানের বিষয়, সমাজচেতনা, হাসন রাজা ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাসন রাজার গানের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা (সম্পা.) *হাসন রাজা সমগ্র* (২০০৯) গ্রন্থের প্রথম ভাগে জীবনী ও জমিদার দেওয়ান হাসন রাজা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে হাসন রাজার বাংলা ও হিন্দি

Dhaka University Institutional Repository

গান প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে হাসন রাজার গানে মর্ম দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকগণের আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। গ্রন্থের চতুর্থ ভাগে সৌখিন বাহার, কোড়া পাখির বর্ণনা, দোয়েল পাখির বর্ণনা, হাতির বর্ণনা, ঘোড়ার বর্ণনা ও স্ত্রীলোকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মোস্তাক আহমেদ-এর *হাসন রাজার মরমী সংগীতের সুফি রহস্য* (২০১৯) গবেষণা-গ্রন্থটির প্রথম ভাগে হাসন রাজার পরিচয়, হাসন রাজার প্রেমিক সত্ত্বার মূর্ত প্রকাশ, সুফি ভাবনা ও তত্ত্বদর্শন সম্পর্কিত সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ ভাগে হাসন রাজার সুফি গানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষক Haroonuzzaman প্রণীত *Selected Songs Hason Raja* (2012) গ্রন্থে হাসন রাজার জীবনী উপস্থাপনসহ নির্বাচিত কিছু গানের ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে।

আনিসুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম (সম্পা.) *প্রবন্ধসমগ্র* গ্রন্থে হাসন রাজার গানকে বাংলার সুফি ও ভাবসংগীত ধারার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মতে, হাসনের গানে আত্মঅন্বেষা, মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম একই সূত্রে গাঁথা।

মাহবুবুল হক ও সৈয়দ আমিরুল ইসলাম তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, রাধারমণ ও হাসন রাজা–উভয়ের সংগীতে ধর্মীয় ভাবধারা থাকলেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। রাধারমণের গানে কৃষ্ণভক্তি ও বৈষ্ণব ভাবনা যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, হাসনের গানে সুফি দর্শনের গভীর মানবিকতা ও বিশ্বপ্রেম প্রতিফলিত হয়েছে।

বাকি বিল্লাহ প্রণীত "হাসন রাজার অন্তঃপুরে" (২০১৭) শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধটিতে গবেষক হাসন রাজার জীবন ও মরমি দর্শন সম্পার্কে আলোচনা করেছেন।

প্রভাত কুমার শর্মা "মরমি কবি হাসন রাজা" শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধে হাসন রাজার জীবন ও দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ ছাড়া বাংলা একাডেমি, লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র এবং সিলেটের আঞ্চলিক সংগীতসংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বেশকিছু গবেষণাপত্রে দুই সাধকের সুরবৈচিত্র্য, সংগীতরীতি ও তাল-লয়ের আঞ্চলিক রূপান্তর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ গবেষণায় তাঁদের আলাদাভাবে আলোচনা করা হলেও, উভয়ের গানের বিষয়বস্তু ও সুরবিন্যাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এখনো সীমিত পর্যায়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে এ-সকল গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, হাসন রাজা বাংলা লোকসংগীতের এক অনন্য সাধক, যাঁর গান মরমি দর্শন, সুফিবাদ, এবং গ্রামীণ জীবনবোধের গভীর বহিঃপ্রকাশ। এসব আলোচনায় মূলত তাঁর জীবন, জমিদারি, মরমি সাধনা এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। তবে গানগুলোর সুরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গবেষণা এখনও তুলনামূলকভাবে অবহেলিত রয়ে গেছে।

প্রথমত, হাসন রাজার জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে গবেষকরা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর জমিদার পটভূমি, কিশোর বয়সের পরিবর্তনশীলতা, এবং কিভাবে সামাজিক প্রভাব ও ধর্মীয় ভাবাদর্শ তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখিয়েছেন। হাসন রাজার জীবনচরিত নিয়ে কাজসমূহে গবেষকগণ তাঁর সাধনা ও আত্মিক অনুসন্ধানকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁর গানের মরমি ও সুফি দর্শন নিয়ে গবেষণা করেছেন অনেকেই। এই গবেষণাগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে, কিভাবে হাসন রাজার গান 'আত্মসন্ধান' এবং 'সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা'কে উপজীব্য করে এক গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার জাল বুনে। তাঁর গানে দেখা যায় নিঃস্বার্থ প্রেম, মানবতাবাদ ও ভক্তি–এসব বিষয়ের প্রকাশ, যা তাঁকে লালন ফকির বা বাউলদের ধারার কাছাকাছি এনে দেয়। তৃতীয়ত, তাঁর গানের গ্রামীণ জীবনধারা ও লোকঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গবেষণায় দেখা যায়, হাসন রাজার গান গ্রামীণ বাংলার সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক সংকট ও মানবিক মূল্যবোধের বাস্তবচিত্র তুলে ধরে। লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনি গানে ব্যবহার করেছেন স্থানীয় উপমা, সহজ ভাষা এবং চিত্রময় শব্দচয়ন।

তবে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়, তা হলো–তাঁর গানের সুর নিয়ে প্রায় কোনো গঠনমূলক বা সংগীততাত্ত্বিক গবেষণা হয়নি। কোন রাগে বা সুরে গানগুলি পরিবেশিত হতো বা এখনও পরিবেশিত হয়, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনুপস্থিত। তেমনি তাঁর গানের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস–যেমন প্রেম, ভক্তি, মৃত্যু, বেদনা, ত্যাগ ইত্যাদি নিয়ে প্রাসঙ্গিক গান বিশ্লেষণও তেমনভাবে দেখা যায় না। ফলে, তাঁর গানের রচনাশৈলী ও সংগীতভাবনার পূর্ণাঙ্গ রূপ আজও গবেষণার বাইরে রয়ে গেছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, হাসন রাজা নিয়ে গবেষণার বিস্তৃতি যতটা জীবন ও সাধনায় হয়েছে, ততটা তাঁর গানের টেক্সচুয়াল ও মিউজিক্যাল বিশ্লেষণ হয়নি। সুতরাং, বর্তমান গবেষণা হাসনের গানের সুরতাত্ত্বিক

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ, রাগতত্ত্ব, এবং বিষয়ভিত্তিক কাঠামোগত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে হতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সংযোজন।

অতএব, বর্তমান গবেষণা পূর্ববর্তী সাহিত্যসমূহের আলোকে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু, ভাবধারা ও সুরবৈচিত্র্যের মধ্যে বিদ্যমান মিল ও অমিল নিরূপণ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলা লোকসংগীতের ধারায় সাধক সংগীতের ভাববিন্যাস ও সুরপ্রকরণ নতুনভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

যে কোনো গবেষণার মতোই এ গবেষণারও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার অনেক গান মৌখিকভাবে প্রচলিত থাকায় সেগুলোর নির্ভরযোগ্য পাঠসংগ্রহ করা কঠিন ছিল। বিভিন্ন সংস্করণে গানের ভাষা ও সুরে সামান্য পার্থক্য থাকায় প্রামাণ্য রূপ নির্ধারণে কিছুটা সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গবেষণার ক্ষেত্র মূলত গুণগত ও পাঠনির্ভর হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত-নোটেশন বা কারিগরি বিশ্লেষণ সীমিত পর্যায়ে করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া দুই সাধকের গানের প্রাচীন রেকর্ড ও মূল দলিল অধিকাংশই দুর্লভ, যা গবেষণাকে আরও গভীরতর করতে পারত।

তৃতীয়ত, গবেষণায় সময় ও তথ্যসংগ্রহের সীমাবদ্ধতার কারণে সমগ্র বাংলাদেশের লোকসংগীত ধারার বিস্তৃত তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

তবুও প্রাপ্ত উপাত্ত ও সাহিত্যের আলোকে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য উপসংহার উপস্থাপন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১.৯ উপসংহার

রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা বাংলা লোকসংগীতের ইতিহাসে দুই অনন্য সাধক, যাঁদের গানে বাঙালির আধ্যাত্মিক চেতনা, মানবিক প্রেম, সমাজদর্শন ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অনন্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের সংগীতের মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবনদর্শন, আত্মসন্ধান এবং এক সর্বজনীন মানবতার বাণী, যা সময়ের সীমা অতিক্রম করে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাধারমণ দত্তের সংগীতে বৈষ্ণব ভক্তি, প্রেম ও সুরসৌন্দর্যের এক সূক্ষ্ম সমন্বয় বিদ্যমান; অন্যদিকে হাসন রাজার গানে আত্মানুসন্ধান, সুফি ভাবধারা ও সমাজচেতনার এক গভীর মেলবন্ধন দেখা যায়। তাঁদের গানের বিষয়বস্তু যেমন ভিন্নতর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়েছে, তেমনি সুরবিন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে আঞ্চলিক রীতি ও ব্যক্তিগত সৃষ্টিশক্তির স্বাতন্ত্র্য।

এই গবেষণার ফলাফল ইঙ্গিত করে যে, দুই সাধকের গানের মধ্য দিয়ে বাংলা লোকসংগীত কেবল বিনোদন নয়–এটি হয়ে উঠেছে মানুষের আত্মশুদ্ধি, সমাজচেতনা ও আধ্যাত্মিক জাগরণের এক শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁদের গানের সুর ও ভাষা আজও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গভীরে প্রোথিত।

বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বাংলার লোকসংগীত গবেষণায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করেছে। তাঁদের সংগীতচিন্তা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক মূল্যবোধ আধুনিক সমাজে যে অনুপ্রেরণা দিতে পারে, তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অতএব, বলা যায়–রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গান শুধু অতীত ঐতিহ্যের স্মারক নয়; বরং তা আজও বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রতীক, মানবতার ভাষা এবং সংগীতের মাধ্যমে অনন্তের অন্বেষণ।

এ লিটারেচার রিভিউতে আমরা প্রথমে রাধারমণ ও হাসন রাজার বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলির সারসংক্ষেপ, পূর্ববর্তী গবেষণার শূন্যতা, পরবর্তীতে এই গবেষণার অবদান এবং সবশেষে উন্নতির পরামর্শ উপস্থাপন করবো।

তথ্য-সহায়ক

১. আহমেদ, মোস্তাক, (২০১৯), *হাসন রাজার মরমী সংগীতের সুফি রহস্য*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা

২. কবীর, জাহিদুল, (২০২১), *বাঙালির মরমি সাধনায় হাসন রাজার গান*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

৩. কবীর, জাহিদুল (২০১২), *রাধারমণ দত্ত লোকদর্শন ও গীতিরূপ বিশ্লেষণ*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

৪. চৌধুরী, বিজনকৃষ্ণ, *বাউল কবি রাধারমণ*, বাংলা লাইব্রেরি, আগরতলা, ত্রিপুরা

৫. জুবেরী, আবু সাঈদ, (২০১৭), *মরমী কবি হাসন রাজা*, দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা

৬. বাগচী, তপন (সম্পা.), (২০০৯), *রাধারমণের গান*, বর্ণায়ন, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৭. বিল্লাহ, বাকি, (২০১৭), "হাসন রাজার অন্তঃপুরে", *প্রথম আলো*, ঢাকা

৮. ভট্টাচার্য্য, বিপ্রদাস (সম্পা.), (২০১৫), *রাধারমণ-এর গান ও স্বরলিপি*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা

৯. ইসলাম, মোহাম্মদ আজহারুল, *লোককবি রাধারমণ : জীবনদর্শন ও কবিতা*, ঢাকা

১০. চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পা.), (২০০৯), *হাসন রাজা মরমি মৃত্তিকার সফল*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

১১. দাস, সুমনকুমার (সম্পা.), (২০১১), *অগ্রন্থিত রাধারমণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

১২. রাজা, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার (সম্পা.), (২০০৯), *হাসন রাজা সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

১৩. রায়, বিশ্বজিৎ (সম্পা.), *রাধারমণের অপ্রকাশিত গান*, ঢাকা

১৪. শর্মা, নন্দলাল (সম্পা.), (২০১৪), *রাধারমণ গীতিমালা*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

১৫. সাহা, অসীম, (২০১৬), "রাধারমণ দত্তের গানের অন্তর্গত মহিমা", *দৈনিক সুনামকণ্ঠ*

১৬. Haroonuzzaman, (2011), *Hason Raja*, Adorn Publication, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাধারমণ ও হাসন রাজার মানসগঠন ও জীবনদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাধারমণ ও হাসন রাজার মানসগঠন ও জীবনদর্শন

২.১ রাধারমণের মানসগঠন ও জীবনদর্শন

বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চল না দেখলে এ অঞ্চলের প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। এ অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম। এ অঞ্চলের রয়েছে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য। বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তর সিলেট জেলার কিয়দাংশ নিয়ে এ বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চল। বছরে একটি ফসল আর মিঠাপানির মাছই হলো এ অঞ্চলের মূল অর্থনৈতিক সম্পদ। অর্থের এই দুই চালিকা শক্তির উপর নির্ভর করেই এ অঞ্চলের মানুষ জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকায় এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভালো। ভরা বর্ষায় হাওরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া জলতরঙ্গের গভীর অনুনাদ মানবমনের দিগন্তে প্রকৃতি ও জীবনের এক গভীর সমীকরণ তৈরি করে। বয়ে চলা জলতরঙ্গ মানবমনের অবচেতন কোনে তোলে সুরের লহরী। হাওরের এই অসাধারণ দৃশ্য প্রকৃতিপ্রেমীদের মনে ভাবের সঞ্চয় উদ্রেক করে খুব সহজেই।

এমন অসাধারণ প্রাকৃতিক লীলাভূমিতে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার কেশবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মহাত্মা শ্রী রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্ত। রাধারমণ দত্তের পিতা রাধামাধব দত্ত ছিলেন অশেষ গুণের অধিকারী। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে *কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের স্ব-ছন্দে টীকা*, *ভারত সাবেত্রী* ও *ভ্রমর গীত*। এ-ছাড়াও বাংলা রচনার মধ্যে *কৃষ্ণলীলা কাব্য পদ্মপূরাণ*, *সূর্যব্রতের গীত গোবিন্দ*, *ভোগের গান* ইত্যাদি। বৈষ্ণব এবং সহজীয়া ধর্মের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। রাধারমণ দত্তের আবির্ভাব এবং তীরোভাব নিয়ে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। সিলেটের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে রাধারমণ দত্ত সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে বলা হয়েছে :

> Radharamon Datta of Keshabpur, son of the poet Radha Madhab Datta was a contemporary poet of Dewan Hasan Raja. His Poems have been collected and edited by Mushi Ashraf Hussain under the title, ‘Radharamon Sangit. (Rizvi, 1970: 3)

এখানে তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। মোহাম্মদ সুবাসউদ্দীন রাধারমণের জন্ম, জন্মস্থান এবং মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

> আবহমান বাংলার বাউল ও ধামাইল গানের রচয়িতা, সহজিয়া দর্শনের দিকপাল বৈষ্ণব ভাব আন্দোলনের অগ্রপথিক বৈষ্ণব লোককবি রাধারমণ দত্ত ১৮৩৩ সালে (১২৪০ বঙ্গাব্দ) সুনামগঞ্জ জেলায় জগন্নাথপুর উপজেলার আতুয়াজান পরগনার অন্তর্গত কেশবপুর গ্রামে বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।' ..'রাধারমণ দত্তের বৈরাগ্য-জীবন ভাবনা সঙ্গীত ও সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২৬শে কার্তিক (১৯১৬ খ্রি:)। শুক্লাতিথিতে তাঁরই স্বভূমি কেশবপুরে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। (সুবাসউদ্দীন, ২০১৫ : ২৫)

রাধামাধব দত্তের কনিষ্ঠপুত্র রাধারমণ দত্তের জন্ম আনুমানিক ১২৪০ বঙ্গাব্দ (১৮৩৪ খ্রি.) বলে বিভিন্ন জীবনীকার লিখেছেন। সম্প্রতি কেশবপুর গ্রামে রাধারমণ দত্তের ভিটা খননকালে পিতলের তৈরি একটি প্রাচীন সিলমোহর পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে :

সন ১২৪১ বং
শ্রী রাধা কিসব দত্ত
পাঁচ তারিখ শ্রী রাধা
মাধব দত্ত আতুয়াজান

উক্ত সিলমোহরের তথ্য সম্পর্কে নন্দলাল শর্মা বলেন :

> রাধা কিসব (রাধাকেশব) নামে রাধামাধব দত্তের কোনো পুত্রের নাম তাদের বংশতালিকায় পাওয়া যাচ্ছে না। রাধারমণের পিতৃদত্ত নাম রাধাকেশব হতে পারে। গুরুদত্ত নাম হতে পারে রাধারমণ। রাধারমণের অনুজ কেউ ছিলেন না। কাজেই ১২৪১ বঙ্গাব্দকেই তাঁর জন্ম সাল বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। খ্রিঃ ১৮৩৪ হলে রাধারমণের জন্ম ১২৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পৌষ মাসের মধ্যে যে কোনো মাসের পাঁচ তারিখ'।...'১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৬ কার্তিক শুক্রবার রাধারমণ দত্ত ইহকাল ত্যাগ করেন।" (শর্মা, ২০১৪:০৮)

যদিও উপর্যুক্ত লেখক কর্তৃক *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন* গ্রন্থে রাধারমণ ১২৪০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানানো হয়েছে (শর্মা, ১৯৯৫ : ৫৭)। *বাউল কবি রাধারমণ গীতিসংগ্রহ* গ্রন্থে বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী 'রাধারমণ জীবন কথা' অধ্যায়ে তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ দিয়েছেন এভাবে–'(১২৪০–১৩২২ বঙ্গাব্দ, ১৮৩৪–১৯১৬)।' সেখানে তিনি উল্লেখ করেন :

> রাজবৈদ্য চক্রপাণি দত্তের অধস্তন পুরুষেরা শ্রীহট্টের প্রাচীন সভ্রান্ত বংশ। এই বংশের জনৈক প্রভাকর দত্ত ও কেশব দত্তের নামে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থানায় অন্তর্গত দুটি গ্রাম নামাঙ্কিত আছে।...১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৬শে কার্তিক শুক্রবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই কবি সাধকের দেহান্ত হয়। (চৌধুরী, ১৯৮৮: ৩)

এ-ছাড়াও *মরমি কবি রাধারমণ দত্ত* জীবনীগ্রন্থে তাঁর নাম ও জন্মসন উল্লেখিত হয়েছে–'কবির পুরো নাম শ্রী রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১২৪০ বঙ্গাব্দে বা ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। নিজের জন্মস্থান কেশবপুরে এই মহান কবি পরলোক গমন করে প্রায় ৮২ বছর বয়সে (২৬ কার্তিক ১৩২২ বঙ্গাব্দে, ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে) শত সহস্রভক্ত রেখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।' (খান, ২০০৬ : ০৫) *বাউল বৈষ্ণব সুফী* গ্রন্থে কবি রাধারমণের সম্পর্কে জন্ম-মৃত্যু সাল হিসেবে উল্লেখ রয়েছে: 'রাধারমণ দত্ত ১৮৩৩-১৯১১ মতান্তরে ১৯০৭) সুনামগঞ্জ।' (ভট্টাচার্য, ২০০৯ : ৭)

অন্যদিকে, *মরমী সাহিত্যে জালালাবাদ* গ্রন্থের প্রণেতা মুহম্মদ আসাদ্দর আলীর ভাষ্য :

> সিলেট বিভাগের হাজার হাজার লোককবি অসংখ্য মরমী মারফতী সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে এ পূন্যভূমিকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করে গেছেন। এক ডাকে চেনার মত 'রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ' তাদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার অধীন আতুয়াজান পরগনার বিখ্যাত কেশবপুর গ্রামে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় । (আলী, ২০১৫ : ১০৭)

এ-ছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাবের তথ্য দেওয়া হয়েছে। *সিলেটের একশত একজন* গ্রন্থে রাধারমণের জন্ম-মৃত্যু: ১৮৩৩-১৯০৭ (রহমান, ১৯৯৪ : ৬৯)। *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* গ্রন্থে রাধারমণ দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে জন্ম-মৃত্যুর সাল দেওয়া হয়েছে: '(১২৪০-১৩১৯ বাংলা)' (হোসাইন, ১৯৯৫ : ৭৩)। এ-প্রসঙ্গে হারুনুজ্জামান বলেন:

> Radharomon was born in Jagannathpur Upozila under Sunamgonj district of Sylhet in 1834. Some people differ over the year of his birth. According to them, Radharomon was born in 1833. (Haroonuzzaman, 2011: xxxv)

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, রাধারমণ দত্তের জন্ম এবং মৃত্যু সন নিয়ে বেশ কিছু মতান্তর বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল মতপার্থক্যে রাধারমণের গান ও সাহিত্যের মূল্যে তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। তবে রাধারমণের পিতা যে সুপণ্ডিত ছিলেন তা এ সকল গবেষণায় সহজেই অনুমান করা যায়। তাই রাধারমণের জন্ম তারিখ পারিবারিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, অনুসন্ধানে তা

পাওয়া যায়নি। প্রভাকর দত্ত থেকে দ্বাদশ পুরুষের জন্ম এই লোককবি রাধারমণ দত্ত যে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মূলত রাধারমণ দত্ত ছিলেন ভাবুক এবং সাধক কবি। তাই তাঁর গানের বাণী তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেননি, করেছেন তাঁর শিষ্যকুল। তবে ভক্তবৃন্দ তা গাওয়ার সময় গানের শেষ অন্তরায় ভনিতায় ভাই যে রাধারমণ কথাটির উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক, রাধারমণের গান যে কেবল বিনোদন ছিল না বরং তাঁর গান যে সাধনা ছিল, তা গানের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমেয়। তবে খ্যাতিমান এই মহাপুরুষের জন্ম-মৃত্যুর সন বিভ্রান্তি আমাদের বিস্মিত করে এবং তাঁর জীবন সাধনার রহস্যময়তাকে আরো বেশি রহস্যময় করে তোলে গবেষকদের কাছে।

রাধারমণ দত্তের জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুরের কেশবপুরে। তাঁর পিতা রাধামাধব দত্ত পুরাকায়স্ত ও মাতা শ্রীমতী সুবর্ণা দেবী। তিন পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। কবি বাল্যকালেই পিতৃহারা হন। ৩৫ বছর বয়সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রীর নাম গুনময়ী দেবী। তাঁর পূর্বপুরুষ এবং পূর্ববর্তী পুরুষদের নাম পরিচয় পাওয়া গেলেও এই মহান সাধকের পরিপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। মহীজনের কর্মযজ্ঞ ছড়িয়ে আছে তাঁর ভক্তবৃন্দের মুখে মুখে। এই মহান সাধকের জীবনী সম্পর্কিত নানান তথ্য তাঁর শিষ্য–প্রশিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। কবির যাপিত জীবন যে খুব বেশি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল তা নয়। এই নিভৃতচারী সাধকের জীবনে যে খুব সস্তা জনপ্রিয়তা ছিল তাও নয়। সমস্ত জাত-পাতের ঊর্ধ্বে থেকে রাধারমণ তাঁর সাধনা চালিয়ে গেছেন। সেজন্য তাকে সমাজপতিদের নানান অন্যায়-অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাধারমণের সাধনার সঙ্গীনি ছিলেন চমৎকার মঞ্জী। সমাজের কর্তা ব্যক্তিরা কবিকে এই নিচু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গ ছাড়া করার জন্য অনেক নির্যাতন করেছিলেন। তাঁর বসনে আগুন পর্যন্ত লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা রয়েছে। কিন্তু সমাজপতিদের সে আগুন তাঁর সাধনার পথকে দমাতে পারেনি। তিনি ধনী এবং গরিবের মাঝে ব্যবধান করেননি। কখনও মানুষকে ছোটজাত এবং বড়জাত হিসেবেও তিনি বিচার করেননি। তাঁর সাধনাই ছিল সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষ।

অনেক গবেষক রাধারমণ দত্তকে বাউল কবি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাধারমণ দত্তের পুরো জীবন এবং তার সাধনা বিশ্লেষণ করলে তাকে বাউল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করানো দুরূহ হয়ে পড়বে। কেননা বাউলেরা বাউল সম্প্রদায়ের অনুসারী। তারা স্বীকৃত ধর্ম বা ধর্মসমূহের অনুসারী নন। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাহায্য সাধনার মাধ্যমে আত্মিক শক্তি লাভ করার চেষ্টায় মগ্ন থাকে বাউল সম্প্রদায়।

রাধারমণ দত্ত প্রকৃত বাউল সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন না, এ বিষয়ে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন :

> পণ্ডিতগণের দ্বারা যাদের বাউল বলে আখ্যায়িত করা হয় রাধারমণ সে শ্রেণীর বাউল ছিলেন না। বাউল শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কোন কোন গবেষকের মতানুসারে বৌদ্ধদেব বজ্রযান নামক সম্প্রদায় থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। বজ্রযান সম্প্রদায়ের লোকগণ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তারা নির্বাণ লাভের জন্য মানবদেহের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ ও তার মাধ্যমে তাদের জন্মান্তরের শিকল থেকে মুক্তিলাভের জন্য সাধনা করতেন। অপরদিকে আর একদল পণ্ডিতের মতবাদ অনুসারে সংস্কৃত বাতুল শব্দের অপভ্রংশরূপে বাউল শব্দের উৎপত্তি। বাউলেরা হিন্দু ও মুসলিম এ উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে তাদের দেহস্থিত নানা সূক্ষ্ম মাধ্যমের দ্বারা দেহস্থি বা কোন কোন শ্রেণীর মতে দেহ-বহির্ভূত পরম পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সাধনা করতেন। এ সকল বাউলেরা হিন্দুদের সহিংসতা এবং মুসলিমদের শরীয়তকে অস্বীকার করে তাদের নিজস্ব সাধনামার্গে অগ্রসর হতেন। এদের মধ্যে একদিকে যেমন জাতের বিচার ছিল না, অপরদিকে তাদের আধ্যাত্মিক বংশতালিকাও ছিল।...বাউল ধর্ম সম্বন্ধে এ উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বোলপুর শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীরও অভিমত ছিল–বাউলেরা একটা স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। তাঁর মতবাদের আলোকে বিচার করলে স্পষ্ট বুঝা যায় রাধারমণ দত্ত সে শ্রেণীর বাউল ছিলেন না। তিনি হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করেন নি। হিন্দুদের মধ্যে যে চতুরাশ্রম–ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসকে তিনি পর্যায়ক্রমে পালন করেছেন। নলুয়ার হাওরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি বাণপ্রস্থাশ্রম পর্যায়ে হিন্দু ধর্মেরই আচার আচরণ পালন করেছেন। এজন্য তাকে বাউল বলে আখ্যায়িত করা যায় না। আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বাউল শব্দটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সংসারে বাস করেও ভগবান প্রেমে বা আল্লাহর ইশকে মশগুল তাদের বাউল বলে ধারণা করা হয়। রাধারমণকে আমাদের সিলেটের সর্বত্র কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।...প্রকৃতপক্ষে রাধারমণ ছিলেন বৈষ্ণব সহজিয়া।' (আজরফ, ১৯৯১ : ৩)

অনেকেই রাধারমণ দত্তকে বৈষ্ণব না বলে বাউল হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যা তথ্য নির্ভর নয়। যদিও তারা যুক্তি উপস্থাপন করেন, রাধারমণ তার নিজের গানেই কোন কোন জায়গায় বাউল শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাদের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে একটি প্রতিকী বিশ্লেষণ

লোকবিদের নামের আগে ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে বহু আগে থেকেই। বড় বড় মহাজনেরা তাদের গানে নিজেদের বাউল পরিচয় দিলেও তারা কেউ বাউল নন। রাধারমণের জন্মভিটার কাছাকাছি জায়গায় যারা গান লিখেছেন তাঁরা সকলেই প্রতিকী বাউল। বৃহত্তর সিলেট এবং ময়মনসিংহ জনপদের লোকবিদরা তাদের গানের ভনিতাংশে নামের আগে 'বাউল' অভিযুক্ত করাটাকে বাধ্যতামূলক মনে করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– ক. বাউল আব্দুল করিম বলে, খ. বাউল রাধারমণ কয়, গ. বাউলা কে বানাইল রে হাসন রাজারে বাউলা, ইত্যাদি। তবে রাধারমণ দত্তের গানের বাণী এবং তাঁর জীবন আচরণ দেখলে আমরা লক্ষ করব তিনি কোথাও বাউলদের আচার-আচরণ এবং সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। তাঁর গানের মাধ্যমেও তিনি বাউল ধর্মের প্রচার করেননি। সুতরাং রাধারমণ যে বাউল কবি নন তা বলা যেতে পারে। রাধারমণ দত্তের সাধনা এবং তাঁর সংগীতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সকলে একমত হবেন যে রাধারমণ বৈষ্ণব দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যেমন :

প্রাণ যায় যায় গো কালিয়ার বিচ্ছেদের জ্বালায়
ডালে বইসে কাল সর্পে দংশিল শ্রীরাধার ॥
সখীগো সর্পের বিষ ঝরিতেলামে, প্রেমের বিষ উজান বায়
উঝা বৈদ্যের নাইগো সাধ্য ঝারিয়া বিষ লামাইতো চায় ॥
থাকিগো বৈদ্যের উদ্দেশে আমার সর্বঅঙ্গ বিষে ছায়
তরা শীঘ্র করি আনগো তারে (নইলে)
শ্রীরাধিকা মারা যায় গো যায় ॥
ও সখীগো ভাইবে রাধারমণ বলে বলিগো তোমায়
তোমরা মইরো নাগো প্রেমের জ্বালায়
আইব তোমার শ্যামগো রায় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৫২)

সহজীয়া মতবাদে যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান তার সকল লক্ষণ রাধারমণের গানে বিদ্যমান। এই বৈষ্ণব ধর্মের মূল প্রভাব আসে তাঁর পিতার কাছ থেকে। বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাবিত হয়ে তিনি গৃহত্যাগীও হয়েছিলেন। তাইতো তাঁর জীবন দর্শন প্রভাবিত হয়েছিল বৈষ্ণব দর্শন দ্বারা। রাধারমণের প্রার্থনা বিষয়ক গানে তিনি নিজেকে সহজীয়া সাধক রূপে প্রকাশ করেছেন। এই সহজীয়া বিষয়ক পদে তিনি নিজের পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করেছেন। গুরু রঘুনাথের নীতি বাক্য ধারণ করেই এই প্রার্থনা বিষয়ক গান রচনা করেছিলেন। যার মাধ্যমে

মিশে গিয়েছিলেন বৈষ্ণব সহজীয়া সাধনায়। আর বৈষ্ণব এবং বাউল যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ তা লালন ফকিরের যোগ্য উত্তরসূরি শিষ্য দুদ্দুশাহ তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন :

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই ॥
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব,
পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ
তুলসী মালা অনুষ্ঠান সদাই ॥
বাউল মানুষ ভজে
যেখানে নিত্য বিরাজে,
বস্তুর অমৃতে মজে নারী সঙ্গী তাই ॥
নিত্যানন্দের দুই পুরুষ হয়,
বরিভদ্র বীর চূড়ামণি কয়,
দুইজন দুই মতের গোসাই
শুনতে পাই ॥
দরবেশী বাউলের ক্রিয়া
বীরভদ্র জানে সেই ধারা
দরবেশ লালন সাঁইয়ের কথায়
দুদ্দু জানায় তাই।

(উল্লাহ, ২০১৫ : ১১৪)

রাধারমণের গান গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি বাহ্যিক আচার অনুসরণের চেয়ে অন্তরের কৃষ্ণপ্রেমকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে তিলকমালা পরাই যথেষ্ট নয়, বরং অন্তরে হরি নামের মালা গাঁথার প্রতি আকর্ষণ থাকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অন্তরে হরি নামের মালা গাঁথতে গেলে ষড়রিপুকে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) বশ করতে হবে। আর এই ষড়রিপুকে বশে আনতে গেলে সদগুরুর সঙ্গ প্রয়োজন। রাধারমণের গুরুভক্তি বিষয়ক গানে এ কথা বারবার এসেছে। যেমন :

সজনীগো গুরু কী ধন চিনলাম না
অমূল্য ধন গুরুর চরণ ভজন হইল না।
বেচলাম জিনিস নগদ বাকি, লইয়া গেল দিয়া ফাঁকি

আর কত দিন বসে থাকি আসল উসল হৈল না ॥
আমার মনেতে মন পাগল, বনে পাগল ময়না
হৃদয় পিঞ্জিরার পাখি সয়ালে বেড়ায় না ।
কামনদীতে তিনধারা চিনতে পারলাম না
সেই নদী চিনতে পারলে তন্ত্রমন্ত্র লাগে না ॥
শ্রীরাধারমণ বলে আমার ঘাটে যাওয়া হইল না
বেভুলেতে দিন গয়াইলাম গুরুর চরণ ভজলাম না ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৮২)

রাধারমণ দত্তের গানে মূল ভাব হচ্ছে অধ্যাত্মচেতনা। তাই তাঁর মানসগঠনে মালসী, শাক্ত পদাবলি, বৈষ্ণব, বাউল, দেহতত্ত্ব, সহজীয়া ইত্যাদি ধারার সংগীতের দর্শন পরিলক্ষিত হলেও তাঁর সংগীতের মূল দর্শন বৈষ্ণব সহজিয়া। তাই তো রাধারমণ বিশ্বাস করতেন গুরুর নামের সুধা পান করলে ভবযন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। মিলবে অনন্ত মুক্তি। তাই এই গুরু পদে আশ্রয় করে তিনি এই পার্থিব জগতের দুঃখই দূর করেননি, বরং তিনি পৃথিবীর সকল জীবের মুক্তি চেয়েছেন।

এজন্য তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যার অন্তরে গুরু ভক্তি বা গুরু প্রেম নেই সে হতভাগা নরাধম। কেননা মানুষ হয়ে শুধু জন্মগ্রহণ করলেই হয় না, বরং নিজেকে মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত করতে হয়। সহজ মানুষ রূপে নিজেকে গড়তে হয়। আর এই সহজ মানুষ হওয়াই সহজীয়া সাধনার মূল কথা। সহজ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য গুরু ভক্তি, গুরু প্রেম অপরিহার্য, কেননা গুরুর সাধনার মাধ্যমেই কেবল এই জাগতিক জীবনের মোহ মায়া থেকে দূরে থাকা সম্ভব। তাই এসব ভব-জঞ্জাল পরিহার করে তিনি গুরুর চরণ সেবায় নিজেকে সমার্পণ করেছেন। তাই তাঁর সংগীতে এবং জীবন দর্শনের প্রতিটি পরতে পরতে গুরুর চরণ লাভের বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন :

আমি তোমায় ডাকি, গুরুহে গুরু
ডাক দিলে ডাক শুনোনা।
সাধন ভজন কিছুই জানি না ॥
গুরু আমি তোমার অধম ভক্ত
লোহা হতে অধিক শক্ত
আগুন দিলে লোহা গলে

গুরু আমার মনতো গলে না ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে ভবে আইলাম অকারণে

আমার মনের এই বাসনা, গুরু রাঙাচরণ ছাড়ব না ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৮২)

যদিও রাধারমণের মানসগঠনে বৈষ্ণব সহজীয়া ধারা প্রবাহিত। তবে বৈষ্ণব সহজীয়ার গুরুতত্ত্বের সাথে বাউলের গুরুত্ব বেশ সাদৃশ্যও রয়েছে। কেননা বৈষ্ণব সহজীয়ার যেমন গুরুর চরণ অমূল্য ধন, গুরু প্রেম অপরিহার্য, গুরু ছাড়া মানব মুক্তির পথ নেই, তেমনি বাউল ধর্মের গুরু হলেন আলেক সাঁই যার চরণে রয়েছে মানব মুক্তি। বাউল মতবাদই গুরুবাদী, গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ এবং গুরুর নির্দেশনার বাইরে গিয়ে বাউল হওয়া যায় না। এজন্য বাউলেরা গুরুকে সবার উপরে মান্য করে। তারা বিশ্বাস করে যিনি মুর্শিদ তিনিই মওলা। কারণ গুরু সিদ্ধপুরুষ, তিনি জানেন ঈশ্বরের সন্ধান। তাই গুরুর কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। লোক গবেষক ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর *বাংলা লোকসংগীতের ধারা* বইয়ে গুরু সম্পর্কে বাউলদের ধারণা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

ক. গুরু সিদ্ধ পুরুষ ;

খ. গুরু ধরে তার কাছে দীক্ষা নিতে হয় ;

গ. গুরুর নির্দেশ অনুসারে সাধনা করতে হয় ;

ঘ. গুরু মুক্তিদাতা ;

ঙ. গুরুর চরণাশ্রয় বাউলের একান্ত কাম্য ;

চ. গুরু পূজ্য : তাঁর মহিমাকীর্তন বাউলের কর্তব্যের অঙ্গ ;

ছ. গুরু পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছেন। শিশ্যকে তিনি তাঁর সন্ধান দেবেন ;

জ. বাউলেরা মানব গুরু আর দেব গুরুকে অভিন্ন দেখেন।

এ জন্যই সাধক লালন সাঁই বলেছেন :

ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার, সর্বসাধন সিদ্ধি হয় তার ॥

নদী কিংবা বিল বাওড় খাল, সর্বস্থলে একই এক জল।

একা মেরে সাঁই, ফেরে সর্ব ঠাঁই, মানুষ মিশে হয় বেদান্তর ॥

নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে, আকার সাকার হইল সে

যে জন দিব্যজ্ঞানী হয়, সেহি জানতে পায়, কলি যুগে হল মানুষ অবতার ॥

বহু তর্কে দিন বয়ে যায়, বিশ্বাসে ধন নিকটে পায়
সিরাজ সাঁই ডেকে কয় লালনকে, কুতর্কের দোকান করিসনে আর ॥

(মাননান, ২০১০ : ৩৬১)

ঠিক একইভাবে লালন সাঁইজী তাঁর অন্য গানে বলেছেন :

মুর্শিদকে মানিলে খোদার মান্য হয়।
সুভাব যদি হয় কাহারো, কেতাব দেখলে মিটে যায় ॥
দেখ বেমুরিদ যত, শয়তানের অনুগত
এবাদত বন্দেগী তার তো, সই দেবে না দয়াময় ॥
মুর্শিদের মেহের হলে, খোদার মেহের তারে বলে
হেন মুর্শিদ না ভজিলে, তার কি আর আছে উপায় ॥
মুর্শিদ পথের দাঁড়া, যাবে কোথায় তাঁরে ছাড়া
সিরাজ সাঁই কয় লালন গোড়া, মুর্শিদ ভজলে জানা যায় ॥

(মাননান, ২০১০ : ৩১২)

বাউল গুরু এবং বৈষ্ণব গুরুর মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হলো বাউল গুরুতে মানুষ গুরুকে অধিক প্রামাণ্য দেওয়া হয়েছে। কেননা বাউল পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যেই পরম গুরুর বসবাস। তাই মানুষ গুরুর সেবা করাকেই বাউলেরা পরমগুরু বা সৃষ্টিকর্তার সেবা মনে করেন। তবে বৈষ্ণব কবি রাধারমণের গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ গুরু মানব গুরু নয়, বেশির ভাগ সময়ে সৃষ্টিকর্তাকে গুরু হিসেবে কল্পনা করেছেন। যেমন :

গুরুশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়
সঙ্কীর্তনের শিরোমণি পতিত পাবন সবে কয় ॥
ঘোর কলির জীব তরাইতে যদি নদীয়ায় হইলে উদয়
আমি সাধনহীনকে না তরাইলে দয়াময় নাম কিসে রয় ॥
নিজ কৃপা গুণে যদি দেহ মোরে পদাশ্রয়
আমায় পাপী জাইনে ঘৃণা করলে নামেতে কলঙ্ক রয় ॥
নাহি মম শ্রদ্ধা ভক্তি শ্রীরাধারমণে কয়
গুরু সকলের প্রতি সদয় আমাকে হইলে নিদয় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৭৪)

রাধারমণের মানসপটে যেমন বৈষ্ণব ধারার প্রভাব চরমভাবে প্রতিয়মান, তেমনি তাঁর গানে ফুটে উঠেছে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়। রাধারমণের প্রায় তিন হাজার গানের মাঝে বেশ কিছু গান রয়েছে দেহতত্ত্ব বিষয়ক। দেহের ভিতর দিয়ে দেহাতীতের অনুসন্ধান কিংবা দেহের ভিতরে দেহাতীতের অধিষ্ঠান। দেহের মাঝে স্রষ্টা কীরূপে বিরাজ করে তা এ সকল গানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে দেহ সাধনার মধ্যে দিয়ে দেহতীতের সাধনায় পৌঁছানো সম্ভব তা প্রকাশ পায় দেহতত্ত্ব ভিত্তিক গানে। নিজেকে জানলে কীভাবে স্রষ্টাকে জানা যাবে তার ব্যাখ্যা রয়েছে এ সকল গানে। পবিত্র কুরানে বলা আছে, 'মান আরাফা নাফসুহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'। অর্থাৎ যে নিজেকে চিনল যে স্রষ্টাকেও চিনতে পারল। উপনিষদের 'আত্মানাং বিদ্ধি' সক্রেটিসের Know Theyself অর্থাৎ নিজেকে চেনার যে দর্শন তা ধর্মগ্রন্থ তথা প্রাচীন বিশ্বাসেও বিরাজমান ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মতে, চৈতন্য প্রকৃতি থেকে উৎসারিত নয় বরং তা আত্মার লক্ষণ। প্রত্যেক জীব বর্তমান জীব দেহ থেকে আলাদা। যা কেবল নিজেকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা সম্ভব। তাই বলা যেতে পারে আত্মা আদি, অমর, অপরিবর্তনীয় এবং অবিনশ্বর। নিজেকে সঠিকভাবে আবিষ্কার করলেই কেবল তার সন্ধান মিলতে পারে। এই দর্শনের ধারাবাহিকতায় সুফিবাদ এবং বৈষ্ণববাদের হাত ধরে বাংলা লোক সংগীতে এর প্রচার এবং প্রসার ঘটে। রাধারমণের গানেও রয়েছে এই দেহতত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব। যেমন :

চলেছে হরি নামের গাড়ি, আয় কে যাবি বৃন্দাবন
দীক্ষা শিক্ষা মহাবলী পথে, তিনটা ইস্টিশন।
প্রথম ঠিকানা নৈদাপুরী, স্টেশন মাস্টার গৌরহরি
নিতাই অদ্বৈত সহায়কারী, নামের গাড়ির মহাজন।
হরিদাসের চৌকিদারি সাতপণ দণ্ড, টাইম নিরূপণ
অজানা এ নামের গাড়ি নিষ্টাচাকে, দোকানদারি
ভক্তি আনল প্রেমের বাড়ি কামের, কৈলায় কৈরে দাহন।
সদামূলে ভাবের নিকট চালাও, বিশ্বাসের ইন্‌জিন।
গাড়ি পলকে গোলোকে চলে, কালের কোঠায় রূপ সনাতন।
গাড়ি মাঝে আশি কোঠা, ষোলো কোঠায় মালের কোঠা।
প্রেম রসের জিনিস মিঠা, পাঁচ রসিক তার মালের মহাজন
গাড়ি গোলোকে গোপনে চলে, বৈসে রইল গোসাই রমণ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৭৪)

রাধারমণের মানসগঠনে অসাম্প্রদায়িকতার চিত্র ফুটে ওঠে তাঁর পদ রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর গানে শুধু অধ্যাত্ম সাধনাই বিদ্যমান নয়, সেখানে রয়েছে মানবমুক্তির আখাঙ্ক্ষা। গানের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করেছেন সত্যকে এবং এই সত্যের মধ্য দিয়ে খুঁজে ফিরেছেন স্রষ্টাকে। আর স্রষ্টাকে অনুসন্ধান করতে গেলে তাঁর সৃষ্টিকে গুরুত্ব দিতে হয়। তাইতো রাধারমণের সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষ। সেখানে জাত-পাতের কোন সীমা রেখা নেই। কারণ রাধারমণ বিশ্বাস করতেন অসাম্প্রদায়িক দর্শনকে। এই অসাম্প্রদায়িক চিন্তায় ব্রত হয়েই তিনি ষড়রিপুর তাড়না থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

যাবে যদি মন সহজ ভাবের দেশে
অধর মানুষ বিরাজ করে সহজ রসে
হিংসা নিন্দা খুটিনাটি কৈতবাদি ময়লা মাটি
ছেড়ে হও খাঁটি
ত্যেজে গরল হওরে সরল রিপু ইন্দ্রিয় নেও বশে
সহজ রসে অধরা ধরা সহজের ফুল জিতে মরা
হইলে হয় সারা
দৈহতরী শ্রদ্ধা পালে অনুরাগ বাতাসে
সহজ রস আনন্দ চিন্ময় সহজ ভাবে নারী প্রেমের উদয়
সাধলে সিদ্ধ হয়
রাধারমণ বলে মনরে রইলে কার আশে।

(শর্মা, ২০১৯ : ২৪)

রাধারমণের গানের দর্শনে অসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে গবেষক ড. জাহিদুল কবীর বলেন :

> বাংলার নিজস্ব সুরে রচিত গানের মতোই এখানে সৃষ্টি দর্শন চেতনার পথও তৈরি হয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার হাত ধরেই। আমরা ব্যবহৃত উপাদানগুলোকে কোনোভাবেই নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব বস্তু বলে পরিচয় করে দিতে পারি না। (জাহিদুল কবীর, ২০২২ : ৬১)

রাধারমণ যে অন্য ধর্মের সাধকের প্রতি সদয় ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তারই গানের মধ্য দিয়ে। রাধারমণ এবং হাসন রাজার মধ্যে দর্শনগত মিল ছিল এবং ছিল আত্মিক যোগাযোগ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময় গানের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো। একবার হাসন রাজা গানের মাধ্যমে রাধারমণের কুশল জানতে চেয়েছিল এভাবে :

রাধারমণ তুমি কেমন
হাসন রাজা দেখতে চায়।

উত্তরে রাধারমণ লিখলেন :

কুশল তুমি আছো কেমন
জানতে চায় রাধারমণ।

রাধারমণ একজন অসাম্প্রদায়িক সাধক। তাঁর সংগীত দর্শন পর্যালোচনা করলে এটা খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। তাঁর গানের বাণীতে আমারা যেমন রাধা কৃষ্ণের নাম পাই তেমন পাই 'আল্লাহ' নাম। যেমন:

জয়রে জয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
জয় সুরধুনী ধন্য নৈদে অবতীর্ণ ॥
জয় প্রভু নিত্যানন্দ বড়ই বদান্য
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র বৈষ্ণবের গণ্য ॥
স্বরূপ রামানন্দ শ্রীরূপ সনাতন
সংকীর্তন যজ্ঞারম্ভে কর আগমন ॥
রঘুনাথ পদধুলি মস্তকে ভুষণ।
নামকীর্তন গায় শ্রীরাধারমণ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১২৪)

ও আমি সদায় থাকি রিপুর মাঝে–
মন ভালো নায়, কমু কারে ॥
ইমান থাকলে আল্লা মিলে–
কর্ম করলে পয়সা মিলে।
এগো, যা কিছু কামাইলাম ধন–
সব খোয়াইলাম ঘাটের কূলে ॥
ভালো মানুষের আত ধোওয়াইলে
একদিন কাম আয় নিদান কালে।
এগো, কমিন্দর লগে দুস্তি কইলে–
মুখ পোড়া যায় বিনা গুইনে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে–
প্রেম করোনা ছাইলার সনে।
এগো, ছাইলার আতে কথা দিলে
মাও বলিয়া আসব কোলে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৫৯)

রাধারমণের মানসগঠনে বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে মনোশিক্ষা। আত্মজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তোলে আর আত্মজ্ঞান সহজ মানুষ হওয়ার পথকে সুগম করে। বৌদ্ধ সহজিয়ার মতো বৈষ্ণব সহজীয়াগণও বিশ্বাস করে প্রত্যেক নরনারীর দৈহিক রূপের মাঝেই তাদের স্বরূপ লুকায়িত। নররূপে নর, স্বরূপে কৃষ্ণ, তেমনি নারীরূপে নারী, স্বরূপে রাধা। বৈষ্ণব সহজীয়াগণ আরো বিশ্বাস করে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা এবং রাধা জীবাত্মা। আর ষড়রিপুর তাড়না থেকে মুক্তি লাভের আশায় জীবাত্মা পরমাত্মার সন্ধান পায়। তাই আত্মজ্ঞান বিনে সাধন ভজন অসার হয়। আর আত্মজ্ঞানের শুদ্ধি আসে মনোশিক্ষার মাধ্যমে। বাউল এবং বৈষ্ণব সাধকগণ মনোশিক্ষাকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন। সাধক লালন সাঁই-এর মনোবিচার গান থেকেও আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করি। শুধু কাঠের মালা জপার নামই সাধনা নয়, পাশাপাশি মন কী বলতে চায় তা ঠিকঠাক যোগসাধন করলে সাধকের কাছে তা জ্যান্ত হয়। এমন হাজারো জ্ঞান মনোশিক্ষার মাধ্যমে আমাদের ভাবিত করে। সাধক লালন সাঁই বা তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই এভাবেই মনোশিক্ষা করেছেন। মনের মানুষের সন্ধান বা অ-পৃথিবীগত জ্যোতিষ্ক দেখার ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে কামকক্ষে কপাঁ দিতে হবে। এই কামকক্ষে তালা দিতে গেলে মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কেবল মনোশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এ বাঞ্ছার পূরণ হবে। রাধারমণের গানে আমরা দেখতে পাই ধারাবাহিক প্রাণায়মের মাধ্যমে নিজের মধ্যে চন্দ্র অগ্নিকে প্রতিহত করাই মনোশিক্ষার পরমকথা। বৈষ্ণব সহজীয়া মনোশিক্ষা দিয়ে সাধকগণ মানুষের নফসকে বা চরিত্রকে সুন্দর রাখার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ যেন বেভুলে-ভুলে দুনিয়ার লোভে কামের ফাঁদে পা না দেয়। সেই বার্তাই দিয়েছেন তাদের পদরচনার মধ্য দিয়ে। যেমন :

অজ্ঞান মনরে তুমি রহিয়াছ ভুলিয়া
লাভ করিতে আইলায় ভবে মহাজনের ধন লইয়া,
লাভে মূলে সব খোয়াইলায় কামিনীর সঙ্গ পাইয়া।
অমূল্য মাণিক, আইলায় সঙ্গেতে লইয়া,
বেভুলে হারাইলায় তারে সংসারে মজিয়া।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া,
যে ভাইয়ে জানিছে হিসাব যাইব পার হইয়া।

(শর্মা, ২০১৯ : ১৫৬)

মনোশিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাবলি বৃদ্ধি পায়। এবং এই মনোশিক্ষায় শান্তি, অহিংসা সহনশীলতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। বৈষ্ণব কবি রাধারমণের মানসপটে মনোশিক্ষার যে দর্শন তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে। যেমন :

ওরে মন কুপথে না যাইও
ঘরে বসি হরিনাম নিরবধি লইও ॥
অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বানাইয়াছি ঘর
ভাই নাই বান্দব নাই কে লইর খবর ॥
অকূল সমুদ্রমাঝে ভাসিয়া ফিরে পেনা
কতদিনে দয়াল গুরু লওয়াইবায় কিনারা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
পার হইমু পার হইমু বইলে দিন তো যায় গইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯: ১৬১-১৬২)

রাধারমণের জন্ম থেকে মৃত্যু সাল পর্যন্ত সময়কালকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, তাঁর জীবনকালে ভারতবর্ষে বাংলায় চলছিল সামাজিক পুনর্জাগরনের ঐতিহাসিক পালাবদল। যা কিছু পুরাতন জীর্ণ সে অচলায়তন-অর্গলকে ভেঙে চিরনতুনের জয়জয়কার। ভারতবর্ষের চিরায়ত প্রথানুযায়ী সাধনমার্গের যে ব্যাপ্তি তা পৌঁছে গিয়েছিল সুনামগঞ্জ জেলার নিভৃত পল্লিতে। কাগজে কলমে রাধারমণের গান লিপিবদ্ধ না করলেও তাঁর গানের বাণী এবং তাঁর গানের দর্শন পৌঁছে গেছে দূর থেকে দূরান্তে, যুগ থেকে যুগান্তরে। রাধারমণের মানসগঠনে আমরা দেখতে পাই, নির্যাতিত নিপীড়িত মেহনতী মানুষের হৃদয় কন্দরের শুষ্ক সুপ্ত হৃদয়হীন অবস্থাকে এক মহৎ হৃদয়বান প্রেমনির্ঝরিণী পরিপূর্ণ জাগ্রত মানবমনে উন্নীত করার দর্শন। তাঁর দর্শনের মর্মবাণীই হচ্ছে 'মানব দর্শন'। তিনি বিশ্বাস করতেন এই মানব জনম পেয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ না করতে পারলে মানব জনমই বৃথা। জ্ঞানহীন নিরক্ষর অজ্ঞান মন কুসংস্কারে আচ্ছাদিত মানব মনকে তিনি সবসময় বুঝিয়েছেন, মানব জনম দুর্লভ, যা একবার গেলে শত চেষ্টার পরেও আর ফিরে আসবে না। তাই এই দুর্লভ মানব জনমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে সৎ মানুষের সঙ্গ লাভের আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে :

তুমি চিনিয়া মানুষের সঙ্গ লইও
পাষাণ মন রে বুঝাও
যদি হয় রে কুজন, তার কাছে না যাইও মনরে

তুমি নিদাগেতে দাগ লাগাইবায় চাইও ॥
ভাইবে রাধারমণ কয়, শুন মন মহাশয়রে
তুমি রসিক পাইলে রসের কতা কইও ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫১০)

রাধারমণের মানসগঠনে এবং তাঁর দর্শনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আত্মদর্শন, নিজেকে জানার প্রবল আকুতি। নিজেকে বোঝার ক্ষমতা এবং জীবন দর্শনের মর্মবাণী জানার সক্ষমতা ছিল তাঁর। নারীকে প্রকৃতি বা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতো আদ্যাশক্তি জ্ঞান করেছেন তিনি। যা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে তাঁর রচিত গানের মাধ্যমে :

মাইয়া সামান্য তো নয়, মাইয়াতে উৎপত্তি সৃষ্টি
মাইয়াতে উৎপত্তি প্রলয়
অনন্তগুণে মাইয়ার কাছে সর্বশক্তিময়
মাইয়া জানেন মহেশ্বর মাইয়ার চরণ ধরে শিরে।
আরেক মাইয়া হৃদিপরে উলঙ্গ হইয়া রয় ।
মাইয়ার কাছে বস্তু আছে সাধনেতে সিদ্ধ হয়
মাইয়ার প্রেমে বান্ধা হরি দাসখতে দস্তখত করি ।
দেবদানব গন্ধর্ব মানব সে মাইয়ার বশে রয়
স্ত্রী রত্নধন বহু কষ্টে যদি কারো ভাগ্যে ঘটে
মরে ভূতের বেগার খাইটে না পাইয়ে মাইয়ার পরিচয় ।
রসিক জানে মাইয়ার মর্ম, রাধারমণ কয়।

(শর্মা, ২০১৯ : ৫২২)

মহাত্মা রাধারমণ বৈষ্ণব দর্শনের এমন কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থেকে জীবন দর্শনকে এবং মানসগঠনকে প্রবাহিত করেছেন, বিশেষ থেকে সাধারণে, নিত্য থেকে অনিত্যে, সমাজ থেকে প্রকৃতিতে।

২.২ হাসন রাজার মানসগঠন ও জীবনদর্শন

প্রেম, বৈরাগ্য ও বিরহ চেতনার অনবদ্য মরমি সাধক ও স্রষ্টা হাসন রাজা (২১ ডিসেম্বর ১৮৫৪-৬ ডিসেম্বর ১৯২২)। তিনি সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলী রাজা ও মাতা হুরমত জাহান বিবি।

মরমি সাধক হাসন রাজার নাম নিয়ে জনমনে ও গবেষকদের কাছে নানা রকম মতবাদ থাকলেও তাঁর নাম যে হাসন রাজা তা সময়ের কালক্রমে সকল গবেষক অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। বলে রাখা দরকার, কবির জন্মগ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিলো অহিদুর রেজা; তবে অন্য একজন নামকরণ করেন হাসন রাজা। পরবর্তীকালে তিনি দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী নামে পরিচিতি লাভ করেন। আরবি ভাষায় তাঁর নাম 'হাসন-আল-রিদা' যার ফারসিরূপ 'হাসন রেজা'। উল্লিখিত হাসন রেজাই, হাসন রাজা নামেই পরিচিত লাভ করেন। 'বংশানুক্রমিকভাবে তাঁরা কৌড়িয়া পরগণার মোগল সরকার কর্তৃক চৌধুরী (রাজস্ব আদায়কারী) রূপে নিযুক্ত ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ইংরেজ কালেক্টার বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত দেওয়ান-এই উপাধি গ্রহণ করার ফলে এই বংশের লোকেরা নামের আগে দেওয়ান এবং নামের শেষে চৌধুরী লিখে থাকেন।' (চৌধুরী, ২০০০ : ১০) ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে হাসন রাজার পূর্বপুরুষেরা ছিলো অযোধ্যার অধিবাসী। তাঁরা জীবন আর সমাজের সাথে নানারকম বোঝাপড়া করে নিজেদের ভাগ্য বিনির্মাণের নিমিত্তে প্রথমে এলাহাবাদে ও পরে বর্ধমান জেলায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে নানারকম সংকট আর নিজেদের মধ্যে সমঝোতার নানা ঘাটতিতে পড়ে যশোর জেলায় উপস্থিত হয়ে একখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত রাজ্যের রাজার নাম ছিলো বিজয় সিংহ দেব। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রাজা বিজয় সিংহ দেব আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর দিকে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দেওয়ান হাসন রাজা ছিলেন ঊর্ধ্বতন বংশের অষ্টম পুরুষ। এ প্রসঙ্গে আবুল আহসান সম্পাদিত *হাসন রাজা মরমি মৃত্তিকার ফল* গ্রন্থে পাওয়া যায় :

> বিজয় সিংহ দেব ভ্রাতৃবিরোধের ফলে নিজ প্রতিষ্ঠিত খণ্ডরাজ্য পরিত্যাগ করে তাঁর অনুচর বর্গ নিয়ে বিশাল পদ্মা পাড়ি দিয়ে শ্রীহট্ট জেলা সদর মহকুমার অন্তর্গত বিশ্বনাথ থানার এলাকাধীন কুলাউড়া গ্রামে এসে উপস্থিত হন। তখন এখানে কোনো গ্রাম ছিল না, ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি। সেখানে বিজয়সিংহ দেব প্রতিষ্ঠিত দীঘি ও গড় ইত্যাদির ধ্বংস চিহ্নাদি দেখা যায়। এই বংশের অধস্থন পুরুষ বানারসী রাম সিংহ দেব কুলাউড়া পরিত্যাগ করে কাপনা নদীর অপর পারে রাম পাশা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কৌড়িয়া পরগণার শেষ সীমার বানারসী পুর বলে একটা মৌজার তিনি পত্তন করেছিলেন। এখনও সেই মৌজা বর্তমান। বানারসী রামের একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ দেব ওরফে বাবু রায় তৎকালীন রীতি অনুযায়ী আরবী ফারসী ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা করেছিলেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ অনুভব করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বাবু খাঁ বা বাবুখান নামে পরিচিত হন। বাবুখানের দুই পুত্রের নাম যথাক্রমে আনোয়ার খান ও কিশওয়ার খান। আনোয়ার খানের আবার আলম রাজা ও আলী রাজা নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আলী

রাজা সুনামগঞ্জের নিকটবর্তী লক্ষণশ্রী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আলী রাজার দ্বিতীয় পুত্র হচ্ছেন মরমী পল্লীকবি হাসন রাজা। (চৌধুরী, ২০০০ : ৯)

দৈহিক গঠনশৈলীর দিক থেকে হাসন রাজা সুপুরুষ ছিলেন। মিষ্ঠভাষী ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরীর দৈহিক গঠন ছিল লম্বা দেহের লালচে ফরসা পিঙ্গল চোখা। শেষ বয়সের কিছু ছবিতে দেখা যায় রাঙা গোঁফ। এতে করে বোঝা যায় যে পাকা গোঁফে তিনি মেহেদি রাঙিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যায়, হাসন রাজা সাধারণ আরবি, ফারসি, বাংলা এবং নিজস্ব প্রতিভায় উর্দুভাষার শিক্ষা গ্রহণ করেন। কেননা তৎকালীন সময়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ছিলো না। মুসলিম পরিবারের সদস্যরা আরবি, ফারসি শিক্ষা গ্রহণে মনোযোগী ছিলেন। তবে সম্ভ্রান্ত পরিবারের রীতি-নীতি অনুসারে গৃহশিক্ষকের নিকট তিনি কোরান শরিফ ও উর্দু, ফারসি পড়েছিলেন। আরো জানা যায় যে, কবি আরবি ভাষায় লিখিত *কুরআন-উল-করীম* এবং *কায়দায় বোগদাদী* পাঠের তালিম নিয়েছিলেন। হাসন রাজার বংশধর দার্শনিক দেওয়ান মহাম্মদ আজরফ জানাচ্ছেন :

> হাসন রাজা যৌবনে সৈয়দ মাহমুদ আলী নামে পাঞ্জাব থেকে আগত চিশতিয়া তরিকার এক দরবেশের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এই দরবেশ সিলেট শহরের অদূরবর্তী রণকেলী গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। হাসন রাজাকে চিশতি নিয়ামী তালিকাভূক্ত একজন খান্দানী ফকির বলে সনাক্ত করা যেতে পারে। তিনি বে-শরা ফকির ছিলেন না। (চৌধুরী, ২০০০ : ১৪)

তবে তাঁর ইংরেজি ভাষায় স্বাক্ষরজ্ঞান ছিল নিতান্তই প্রাথমিক। মাত্র পনেরো বছর বয়সে বাবার মৃত্যুতে পরিবারের যে গুরু দায়িত্ব পালন করেন তাতে শিক্ষা গ্রহণ করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তবে একথা বলাবহুল্য, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যে সবারই অবশ্যকর্তব্য তা তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেন। ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য 'হাসন মিডিল ইংলিশ স্কুল' নামে একটা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুল পরে তাঁরই সম্মতিক্রমে, ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সুনামগঞ্জ জুবিলী হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়। (চৌধুরী, ২০০০ : ১১)

হাসন রাজার মানসগঠনের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটি বিষয় বলে রাখা দরকার, অনেকেই হাসন রাজাকে পরিপূর্ণ বাউল হিসেবে চিহ্নিত করলেও হাসন রাজা ছিলেন মূলত মরমি সাধক। সাধারণত বাউলেরা বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; তাদের সাধন পদ্ধতি এবং জীবন-প্রণালী সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। অন্যদিকে হাসন রাজার জীবন-প্রণালী এবং সাধন-পদ্ধতি ছিল তাঁর নিজস্ব চিন্তা বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে। কেননা হাসন রাজা ছিলেন সংসারবাদী মানুষ। সংসারে থেকেই তিনি মরমি সাধনায় যুক্ত ছিলেন।

তাইতো তাঁর সাধনা কাব্য প্রতিভা, বংশানুক্রমিকভাবে একলিমুর রাজা পেয়েছিলেন। আবার একলিমুর রাজার পুত্র তয়মুর রাজা অর্থাৎ হাসন রাজার নাতির কাব্য প্রতিভার বিচিত্র প্রমাণ মেলে। এছাড়াও হাসন রাজার বৈমাত্রেয় ভগ্নীর সাহিত্য প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায় :

> হাসন রাজার বৈমাত্রেয় ভগ্নী ছহিফা বানু। যিনি হাজী বিবি নামে পরিচিতা ছিলেন, তিনি বাংলা এবং উর্দু দুই ভাষাতেই গান রচনা করতে পারতেন। তিনি ছিলেন শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান মহিলা কবি। তাঁর রচিত 'ছইফা সঙ্গীত' ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি হাসন রাজা সম্পর্কে এই গানটি রচনা করেছিলেন, যেটি এখনো সিলেটে লোকের মুখে মুখে ফেরে। যেমন :
>
> সুনামগঞ্জের হাসন রাজা
> আলী রাজার নন্দন।
> ঠাকা কড়ি অন্ন বস্ত্র
> সদাই করে বিতরণ।
> আইস ভাইধন বইস তুমি মসলন্দের উপর ॥
>
> হিন্দু মুসলমান দুটি ঐতিহ্যের ধারা হাসন মানসে মিলিত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব বা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের ভাবগুলি তাঁর জীবন দর্শনে ছায়াপাত করেছিল। চতুর্দিকের হিন্দু সমাজ আর নিজ মুসলিম গণ্ডী এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখেননি হাসন রাজা। হিন্দু বনেদি ঐতিহ্যের অন্তর্গত নানা ধ্যান ধারণার মহাভাণ্ডার তাঁর মানসে ক্রিয়াশীল ছিল। আর দৈনন্দিন মুসলিম জগৎ তাঁকে আত্মপ্রকাশের ভাষা যুগিয়েছিল। (চৌধুরী, ২০০০ : ১২)

হাসন রাজা বংশ পরম্পরায় জমিদার হলেও প্রচলিত জমিদারিত্ব মেজাজ তাঁকে আর্কষণ করতে পারেনি। কেননা তিনি ছিলেন মরমি সাধক। তাই প্রজাবৎসলতা ছিলো তার চরিত্রের এক বিশেষ গুণ। তাঁর মৃত্যুর পর বহু জীবনীগ্রন্থে এর প্রমাণ মেলে। এ ভূখণ্ডে হিন্দু মুসলমাদের একত্রে বসবাস সেই সূত্র ধরে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে, হাসন রাজা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। তিনি হিন্দু প্রজাদের প্রতি যেমন সদয় ছিলেন, ঠিক তেমনি ছিলেন মুসলমানদের প্রতি। শুধু তাই নয় কবির জীবনের অন্যতম মৈত্রী সাধনা ছিলো সর্বজীবের প্রতি দয়া। মানুষের পাশাপাশি ইতর প্রাণীর প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ তিনি দেখিয়েছিলেন বাংলা রাজাদের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য নয়। মানুষের জন্যে এই জীব-জন্তুর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে এই পার্থিব জগতে। সে কথা আজ আমরা উপলব্ধি করতে শিখেছি। এই উপলব্ধি কিন্তু হাসন রাজার জীবনে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রাণচঞ্চল

প্রকৃতি বুনো হাতি, কোড়া পাখি বা জল মোরগ পাখি শিকার করতেন (শিকার মানে জীবজন্তু হত্যা নয়)। এসব পশু ধরে এনে পোষ মানাতেন।

হাসন রাজার সংগীত সৃষ্টির প্রাচুর্য্য নিয়ে বর্তমান সময়ে বেশকিছু গ্রন্থ রচনা হলেও তাঁর জীবিত কয়েকটি মাত্র গান নিয়ে *হাসন উদাস* নামে তাঁর একমাত্র সংগীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য উক্ত গ্রন্থটি কবে প্রকাশিত হয়েছিলো তার সঠিকভাবে সময় না জানা গেলেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই গ্রন্থের প্রকাশ সময় বলে ধারণা করা হয়। তবে তাঁর উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তা প্রমাণিত। হাসন রাজার বিচিত্র্য সাধনার মধ্যে সংগীতই ছিলো তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। বৈরাগ্য নয় বরং জগৎ সংসারে থেকে তাঁর সংগীতের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটেছিলো। হাসন রাজা তাঁর গানের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন যে :

> বাউলা কে বানাইলো রে হাসন রাজারে বাউলা কে বানাইলো রে'। উক্ত গানের মধ্যদিয়ে তিনি নিজেকে বাউলা হিসেবে প্রকাশ করেলও তিনি মূলত বাউল ছিলেন না, তিনি ছিলেন সংসার প্রেমি পুরুষ। তবে এ গানের মধ্য দিয়ে তিনি স্রষ্টা প্রেম তত্ত্বের সন্ধ্যান করেছেন। বাউল সাধকরা যেমন 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান করেন, মরমি কবিও তেমনি 'দেওয়ানা' "পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ানা, হাসন রাজা পিরীতি করিয়ে হইয়াছে ফানা" ঠিক এমনইভাবে তিনি স্রষ্টার সন্ধান করেছেন। এখানে তাঁর মরমি তত্ত্বের সাথে সূফি তত্ত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ নিজের মধ্য লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ পায়। উক্ত গানটিতে আবার 'মরমিবাদ বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ, দেহ থেকে দেহাতীতের স্পর্শানুভব, নীরবতার মধ্যে থেকে দেহমনের ক্রিয়াশীলতা, বিরহের মধ্য মিলনের রস উপভোগ, সুদূরকে নিকটতম রূপে পাওয়া, নিকটতমকে সুদূরভ্রুমে ধরার আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তির মধ্যে অপ্রাপ্তির দ্যোতনা, একাকিত্বের মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদন, বিষাদের মধ্যে আনন্দের প্লাবন এবং সর্বোপরি সর্বতোপ্রায়াসী 'প্রেম' এর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব' প্রকাশ পেয়েছে। (সিংহ, ১৯৮০ : ১৯৮)

হাসন রাজার গানের অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে বলে রাখা দরকার সূফীর মতো বৃহত্তর সিলেটের লৌকিক ঐতিহ্যে প্রবাহমান ধারার নাম বৈষ্ণব ধারা। এ বিষয়ে ফোকলোর গবেষক ড. আবদুল ওয়াহাব বলেন :

> সুরের ছন্দ ও ভঙ্গিতে বৈষ্ণব ধারাটি হলো মূলতঃ বিলম্বিত মীড় আশ্রয়ী এবং তা লীলায়িত, অনুগামী বাদ্যযন্ত্র- একতারা যুক্ত লাউয়া বা লাউ। সূফী ধারাটির সুর প্রধানতঃ গতি প্রদান, কাটাকাটা ঝটকা

দেয়া, ত্রিমাত্রিক ছন্দ, অনুগামী যন্ত্র দোতারা ও খমক। বৈষ্ণব ধারার লীলায়িত চলনের মধ্যে সূফী ধারাটি নিয়ে এল এক গতির আবেগ। এই দুটি ধারারই প্রগতিশীল সামাজিক মুখ্য ভূমিকা ছিল হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত ভাবধারা, এক মিলিত সংস্কৃতি গড়ে তোলা। হিন্দুর গুরু, মুসলমানের মুরশিদ, হিন্দুর রাধা-কৃষ্ণ, মুসলমানের আশিক-মাশুক মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। (ওয়াহাব, ২০০৮ : ৩৫১)

হাসন রাজার গানে ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যাপক আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বেশকিছু গানে ইসলাম ধর্মীয় ভাবধারার বা দর্শন প্রকাশ পেয়েছে যেমন :

আল্লা ভব সমদুরে, তরাইয়া লও মোরে।
পড়িয় দরিয়ার পাকে ডাকি হে তোমারে ॥
অথবা
কি হইব মোর হাসরের দিনরে ভাই মমিন।
মমিন হায়রে কি হইবে মোর হাসরের দিন ॥
অথবা
মমিন আরে ভাই! ইমান রাখিও দড়।
ইমান না থাকিলে মমিন কিসের নামাজ পড় ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১৩৭)

আবার তিনি হিন্দু ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েও সংগীত রচনা করেছেন। যেমন :

ওমা কালী! কালী গো! এতনি ভঙ্গিমা জান।
কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর যা ইচ্ছা হয় মন ।।
মাগো স্বামীর বুকে পা দেও মা ক্রোদ্ধ হইলে রণ।
কৃষ্ণরূপে প্রেমভাবে, মামীর বসন টান।।

(রাজা, ২০০৯ : ১৬০)

হাসন রাজার গানে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার যে সম্পর্ক তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তিনি রূপের মাঝেই অরূপের সন্ধান করেছেন। তিনি প্রেমের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলেমিশে একাকার হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। সুফিবাদের কেন্দ্রীয় ধারণায় মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে যে সম্পর্ক নির্মিত হয়েছে তা প্রেমের। বলা যেতে পারে সুফিরা প্রেম উন্মাদ (Drink with love) এই প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে ক্রমেই মানুষের মাঝে আমিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। সুফি সাধনায় এর নামই 'ফানা'। এ পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলে লীন হয়ে যায়;

তখন মানুষ শাস্ত্রীয় ধর্মের ঊর্ধ্বে চলে যায়। তখন জীবাত্মায় পরমাত্মা লীন হয়ে যায়। যার প্রমাণ মেলে হাসন রাজার এই গানে :

বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি
সোনা মানী সোনা মানী গো
আমারে করিলা বদনামী ॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাসন রাজার গানের তত্ত্ব ও দর্শনে অভিভূত হয়ে ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন :

> It is a village poet of East Bengal who in his songs preaches the philosophical doctrine that the universe has its reality in its relation to the person. He sings !
> "The sky and the earth are born of my own eyes
> The hardness and softness, the cold and the heat are the products of mine own body;
> The sweet smell and the bad are of my own nostrils"
> This poet sings of the eternal person within him, coming out and appearing before his eyes just as the Vedic Rishi speaks of the person, who in him, dwelling also in the heart of the sun.
> "I have seen the vision
> The vision of mine own revealing itself,
> coming out from within me."
>
> (উদ্ধৃত : রাজা, ২০০৯ : ৭১)

এই অভিভাষণটি 'বিশ্বভারতী' (ত্রৈমাসিক) এবং 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও, মাঘ ১৩৩২ সংখ্যার *প্রবাসী* এবং *বঙ্গবাণী* মাসিক পত্রিকাতে যে অনুমোদিত বাংলা ভাষান্তর প্রকাশিত হয় তাতে উল্লেখ আছে :

> "পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই-সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্বসত্য। তিনি গাহিলেন :
>
> মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
> কর্ণ হইতে পয়দা হইলো মোহাম্মদী দীন।

শরীরে করিলে পয়দা শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খসবয় বদবয়।

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনইভাবে বলিয়াছেন যে, যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্য মণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

রূপ দেখিলাম রে নয়নে
আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা সাহিত্যের দরকারেই হাসন রাজার দর্শনের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি ১৯৩০ সালে ম্যানচেস্টার কলেজ, অক্সফোর্ড-এ অনুষ্ঠিত হির্বাট লেকচারেও হাসন রাজার দুটি গানের কথা উল্লেখ করেন। এ থেকে পরিষ্কারভাবে ধারণা করা যায়, রবীন্দ্রনাথ হাসন রাজার গানের মর্মবাণীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

হাসন রাজার 'আশিক' ও 'মাশুক', এবং 'রাধা ও কৃষ্ণ' তত্ত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হাসন রাজার গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রাধা-কৃষ্ণ বিষয় বৈচিত্র্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পেলেও তাঁর রচিত গানে রাধা-কৃষ্ণ অনেক সময় লৌকিক মানব মানবীর প্রেমের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। যেমন :

সোনা রাধে, সোনা রাধে গো,
আমার মন কেন তোর কাঙ্গালিনী।
আড় নয়নে কেন, লইয়া যাও মোর প্রাণ।।
চান্দমুখ দেখিয়া তোমার বাঁচিতে না পারি।
আমি তো হইয়াছি তোমার প্রেমের ভিখারী।।

(রাজা, ২০০৯ : ২৭৬)

হাসন রাজার মানসগঠন ও দর্শনের মাঝে যে সকল তত্ত্ব লক্ষণীয় তা হলো : হাসন রাজার ধর্ম সাধনা শাস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি। তিনি বাঙালির দার্শনিক ও মরমিয়াবাদী ধারায় নিজের ভাবনাকে বিন্যস্ত করেছেন। যার ফলে ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত বাঙালি-চিন্তাধারা তাঁর কবিতায় রূপ লাভ করেছে। এই সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদবিরোধী মূলগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি কাট মোল্লাদের ধরতাই বুলির তোয়াক্কা করেননি। যেমন :

হাসন রাজায় বলে আমি না রাখিব জুদা
মুল্লা মুনসীর কথা যত সকলই বেহুদা।
(রাজা, ২০০৯ : ৩০)

হাসন রাজার জীবনে ধর্মের প্রভাব যে অনেক বেশি তা পর্যায়ক্রমে দেখা যায়। হাসন রাজা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর জীবনে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিল না। তিনি সবসময় নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও সাধারণ জনসাধারণের প্রতি সমানচিত্তের স্বাধীনতা দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। হাসন রাজা অত্যন্ত আসক্তিশীল ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি। তার ফলে তিনি হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের মধ্যে একতা অর্জন করেছিলেন। তিনি বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতার মাধ্যমে জগৎ এবং জীবনকে একটি স্বাভাবিক সমতলে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচিত গানে শাস্ত্রের বিরোধিতা, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানবপ্রেম এবং বিভিন্ন ধর্মের সাধনার সমন্বয় প্রকাশ পেয়েছে। হাসন রাজা এটি বিশ্বাস করতেন যে, সকল ধর্মের মানুষের প্রধান হচ্ছে মানবতার প্রেম। এছাড়াও, তিনি ধর্মের মধ্যে বিভেদ নিরাময় করতেন এবং সকল ধর্মের মানুষকে সমান চোখে দেখতেন। তাঁর জীবন-দর্শন উদাসীনতা এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে তিনি বদলে দিয়েছিলেন।

আত্মতত্ত্ব

আত্মতত্ত্ব হলো বাংলার ভাব দর্শনের অন্যতম একটি বিশেষ ধরন। যা মানব চৈতন্যের বিশ্বাস ও বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আত্মতত্ত্ব ধারণাটি বিশ্বাস করে যে প্রতিটি ব্যক্তির অনন্ত ও নৈসর্গিক অস্তিত্ব রয়েছে। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বা বিদ্যা বুদ্ধিমত্তা, মন, হৃদয়ের সম্পর্ক বিধান, আত্মসচেতনতা, আত্মচেতনা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। আত্মতত্ত্বের প্রধান ধারণা হলো, মানুষ একটি নির্দিষ্ট শরীরের বা মানসিক বিশ্লেষণের বিষয় নয়, বরং সচেতন একটি স্বাধীন অস্তিত্বের মাধ্যমে মানসিক এবং শারীরিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত করে। আত্মতত্ত্বের ধারণার সাথে বিভিন্ন সম্পর্কিত জ্ঞান এর আলোচ্য বিষয় হতে পারে, যেমন নন-দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ইত্যাদি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আত্মতত্ত্ব বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্বিচার করা হয় না। কিন্তু ধারণাগুলি মানুষের চিন্তা, সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এটি মানুষের অর্থ, পরিপূর্ণতা, পরমানন্দ, ধর্ম ইত্যাদির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলার ভাব দর্শনের আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা আছে এবং এটি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার বিষয় হয়েছে। ধারণাগুলি দর্শনিক তত্ত্ব দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে, যেমন বুদ্ধিস্ট অদ্বৈতবাদ, হিন্দু উপনিষদগুলির

অদ্বৈতবাদ, জৈন দ্বৈতবাদ ইত্যাদি। এছাড়াও আধুনিক দর্শনতত্ত্বে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান মূলতই চিন্তাভাবনা, আত্মবিশ্লেষণ, সচেতন প্রতীক্ষা, আত্মসম্পর্কের বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করে। গানেও আত্মতত্ত্ব সাধনার স্বরূপ লক্ষ করা যায়। যেমন :

তুমি কে আর আমি বা কে, তাই তো আমি বুঝি না রে ।
এক বিনে দ্বিতীয় আমি, অন্য কিছু দেখি না রে ॥
তুমি হে জগতের কর্তা, আমি শব্দটিই মিথ্যা ।
একা তুমি বিধাতা, তব শরিক অন্য নাই রে ॥
আমি আমি বলে যারা, বুঝে না বুঝে না তারা।
লাগিয়াছে সংসারি বেরা, মূর্খতা ছুটিছে না রে ॥
মিছামিছি বলি আমি সর্বব্যাপী হওরে তুমি ।
সকলই তুই অন্তর্যামী, তুমি ভিন্ন কিছু নয় রে ॥
হাসন রাজা নামটি দিয়ে, রহিয়াছ ছাপাইয়ে ।
সবই কর পরদা দিয়ে, বহিয়াছ ছাপাইয়ে ।
সবই কর পরদা দিয়ে, দোষের ভাগী হওনা রে॥
বুঝিয়ে দেখি তুই বৈ, হাসন রাজা কিছু নই ।
হাসন রাজা যারে কই, সেও দেখি তুমি ঐ রে॥
তুমি কে আর আমি বা কে, তাইতো আমি বুঝি না রে॥

হাসন রাজা তাঁর গানে আত্মাকে জানার চেষ্টা করেছেন। রূপের মাঝে তিনি অরূপের সন্ধান করেছেন। সত্যকে অনুসন্ধান করেছেন তাঁর গানে।

দেহতত্ত্ব

আত্মতত্ত্বের মতো দেহতত্ত্ব হলো একটি দার্শনিক মতবাদ যা মানুষের দেহ ও মানসিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আলোচনা করে। দার্শনিকগণ দেহতত্ত্ব নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন যেন মানুষের মহাজাগতিক সত্তা ও স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে সঠিক ধারণার উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এটি বিশেষত ভৌততাত্ত্বিক এবং নৈসর্গিক ধারণার উপর নির্ভর করে এবং মানুষের দেহের গঠন, কার্যকলাপ এবং মানসিক অবস্থার প্রক্রিয়াগত দিকগুলি

বিশ্লেষণ করে। দেহতত্ত্বের আলোচনা প্রাণ, বিশ্বাস, চিন্তা এবং মানুষের চেতনার উপর। দেহতত্ত্ব আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মানসিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত কারণ মনোদৈহিক অবস্থান থেকে দেহতত্ত্ব চৈতন্যবাদ, অইন্দ্রিয়কতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দেহতত্ত্ব মতবাদটি মানবিক অস্তিত্ব, সচেতনতা, ইচ্ছা, জ্ঞান ইত্যাদির উৎপত্তি এবং তাদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক সম্পর্কে বিবেচনা করে। তাছাড়া দেহতত্ত্বের অন্যতম বিশ্বাস মনুষ্যের শারীরিক অংশগুলির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে, যেমন পানি, মাটি, বায়ু, আগুন, ওজন ইত্যাদি। দেহতত্ত্ব অনুসারে, দেহের এই উপাদানগুলির সমন্বয় ও সংঘটনের কারণেই জীবিত প্রাণী বা মানুষ্য অস্থায়ী আচরণ করতে পারে এবং জীবন প্রক্রিয়ার সাথে সংঘটিত হয়। এছাড়াও দেহতত্ত্ব পরিকল্পনা করে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াগুলির সম্পর্ক নিয়ে।

মরমি কবি হাসন রাজার সমগ্র গান বিশ্লেষণ করলে এই দেহতত্ত্ব ভিত্তিক বেশ কিছু গান পাওয়া যায়, যেখানে তিনি দেহের মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করেছেন যে গানে মানুষের দেহ ও দেহের ভিতরের উপাদানে স্রষ্টা কিরূপে বিরাজ করে তার সন্ধান মেলে।

বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শ্যাম, রাধার ঘরে করে কাম
বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শ্যাম, রাধার ঘরে করে কাম ।
কেহই বলে রাধার কানুন, হাসন রাজায় বলে দিলারাম
আন্ধাইর গুন্ধাইর হুড়হুড় করে কেওরে নাহি সে যে ছাড়ে
প্রেমের উতালা হয়ে, লাগাইছে, ধুমধাম ।
প্রেমের বাতি জ্বালাইয়া দেখ তারে নিরখিয়া ।
হৃদ মন্দিরে বিরাজ করে, হাসন রাজা ধরে নাম ॥

অসাম্প্রদায়িকতা

আমাদের যে-সমস্ত সামাজিক সম্যসা রয়েছে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ তারমধ্যে অন্যতম। এটি একটি সামাজিক পদ্ধতি বা প্রথা যার মাধ্যমে মানুষের বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শ ও মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়। পরিবার, সমাজ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি বা অন্যান্য মৌলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় উপমহাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। এই

সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি বিশেষ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে অন্যান্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করে। সাম্প্রদায়িকতা কী? বিপান চন্দ্রের মতে, ধর্মীয় স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থকে অভিন্ন মনে করা হলে, তাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বলা হয়। এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Communalism is the belief that because a group of people follow a particular religion, they have as a result, common social, political and economic interest. সাধারণত, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ধর্মীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করা। সাম্প্রদায়িকতা হলো এরূপ এক বিশ্বাস যে, একটি নির্দিষ্ট ধর্ম অনুসরণকারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বহন করে। এই দিক থেকে দেশে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ পৃথক পৃথক পরিচিত ও সংগঠিত। ধর্মই হলো মানুষের পরিচয়ের অন্যতম মূল ভিত্তি। হাসন রাজা ছিলেন এই সাম্প্রদায়িকতাবাদের ঊর্ধ্বে। তিনি অন্য ধর্মের প্রতি কখনো বিদ্বেষমূলক মনভাব পোষণ করেননি। তাঁর রচনায় কোনো একটি ধর্ম নয় বরং মানুষ, প্রকৃতি এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রয়েছে। এ সম্পর্কে গবেষক মোস্তাক আহমেদ বলেন:

> হাসন রাজাকে হিন্দুত্ব মুসলমানিত্বের শাস্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে ফেলে বিচার করা হলে তা কোনভাবেই সমীচীন হবে না। তিনি ছিলেন একজন সৃষ্টিশীল মরমী কবি বা মরমীয়া ভাবুক ও মনে-প্রাণে সূফি। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ও ভাবগভীরতার জন্যই তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। বাংলার ভাবসাধনায়, আমরা আগেই বলেছি, বহু মত পথ ও পন্থার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটেছে। সামাজিক শক্তি বিন্যাস, গণমানুষের আত্মিক ও আদর্শিক ঝোঁক প্রবণতা দ্বারাই এর দ্বন্দ্বাত্মক বিকাশ (dialectics of evolution) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এতে হিন্দুত্ব মুসলমানিত্ব বা শাস্ত্রীয় ধর্মের হুবহু অনুসরণ-ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাই বিশদ গবেষণা ও বিবেচনা করে বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারায় হাসন রাজার অবদানকে চিনতে পেরে বলেছেন : 'তিনি হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে একটি অভিনব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন সে কথা অস্বীকার করতে পারিনে।' তিনি বলতে চেয়েছেন সবকিছুর উপরে হাসন রাজা ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি হৃদয়। (আহ্‌মাদ. ২০০০. ৪৫)

হাসন রাজার গান বিশ্লেষণ করলে আমরা অসাম্প্রদায়িক দর্শনের প্রমাণ পাই–তাঁর গানে যেমন মুসলিম ধর্মের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখতে পাই, তেমনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় তাঁর গানের দর্শনে। গবেষক দেওয়ান আজরফ সেজন্য বলেছেন, 'হাসন হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে একটি অভিনব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যেমন একদিকে হাসন লিখেছেন :

ও মন রইলে রে ফিকির।
দম থাকিতে করলে না ইল্লাল্লার জিকির ॥
লাইলাহা ইল্লাল্লা, বির্দ না করিলে ।
কি উপায় হইবে তোমার ছক্রাতের কালে ॥
ইল্লাল্লার জিকির কর, পাইবে নাজাত।
ইল্লাল্লার জিকির করিলে, হবে রে মন পার ॥
পাইবে অবোধ মন, দিদার সফাত॥
হাসন রাজা বলে মন, ইল্লাল্লা কর সার।

তেমনি অন্যদিকে তিনি লিখেছেন :

চিকন কালা চিকন কালা ও চিকন কালা
তুমি বিনে অন্য কেউরে নাই লাগে ভালা
গলেতে পড়িয়া আছবন ফুলের মালা
থরে থরে কর তুমি কতই যে খেলা ॥

সুফিবাদ

'সুফি' ও 'বাদ' এই দুই শব্দের সমন্বয়ে 'সুফিবাদ' শব্দের সৃষ্টি। 'সুফি' হলো পরম সত্তার অনুভূতি এবং চিরন্তন শান্তি প্রাপ্তির জন্য মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধি ও আন্তরিক বিকাশের সাধন; আর 'বাদ' হলো আন্দোলন, যার ইংরেজি শব্দ ism ('Ism is a philosophical thought who is use to a create art')। সুফিদের পথে মূলত সৃষ্টিকর্তার প্রেম অর্জন এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। সুফিদের চরিত্রে পূত ও উজ্জ্বল আদর্শের গুণ অবলম্বন করা হয়। তারা অধিকাংশ সময়ে মসজিদে অবস্থান করে সৃষ্টিকর্তার যিকির-ফিকির এবং মোরাকাবা-মোশাহেদা করে। সুফি সাধকদেরকে 'আসহাবে সুফফা' বলা হয়। সুফি তার সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রেম অর্জন করতে চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্যে সুফি সাধককে সুফি পথের অনুসরণ করতে হয়। সুফি পথে মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে : শরিয়ত, তরিকত, মারেফাত ও হাকিকত। সুফিবাদের মানে হলো মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধি এবং চিরন্তন শান্তি প্রাপ্তির জন্য সুফি তার অন্তরের বিকাশ করেন। এই পথে সুফিরা ঈশ্বরের প্রেমের অর্জন এবং ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা করেন। তারা বিশেষ আদর্শের গুণ অবলম্বন করেন।

সুফিবাদের মূলনীতি বা প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য তাওবা ও তাওয়াক্কুল অন্যতম। তাওবা হলো 'সুফিগণ অন্যায় ও পাপের ওপর আন্তরিক অনুশোচনা করে এবং ভবিষ্যতে ঐ কাজগুলি না করার দৃঢ় শপথ নিয়ে থাকেন ; যা সুফি মতবাদের প্রথম মূলনীতি। আর তাওয়াক্কুল হলো সুফিগণ সর্বদা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করেন। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো আল্লাহর সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতার আশা করা। সুফি আওলিয়াদের মতে, 'স্বল্প আহার, স্বল্প কথন, স্বল্প মেলামেশা, স্বল্প নিদ্রার মধ্যেই মানুষের পূর্ণতা'। এটি অর্থ করে মানুষ অতি কম খাদ্য, কথা বলা, সাংসারিক আচরণ এবং নিদ্রার মধ্যেই সমৃদ্ধ হতে পারে যা পরিবর্জনের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া সবর, আত্মসমর্পণ, ইখলাস, শোকর ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মরমি কবি হাসন রাজার দর্শন সুফিবাদ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিল । তিনি যখন বলেন, 'মম আঁখি হইতে পয়দা হইলো আসমান জমিন'–তখন সুফিবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত সৌমিত্র দেব বলেন :

> মম আঁখি হইতে পয়দা হইলো আসমান জমিন।' সেটা স্মরণ করিয়ে দেয় সূফি দার্শনিকের আইনাল হক।' অর্থাৎ আমিই আল্লাহ। কথিত আছে তিনি চিশতিয়া তরিকার এক আধ্যাত্মিক গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো জীবনযাপনেও প্রভাবিত ছিলেন হাসন। রাধা-কৃষ্ণ নিয়ে বহু গান রচনা করেছেন তিনি। শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি ছিল সিলেটের ঢাকা-দক্ষিণ। সিলেট বিভাগের জল হাওয়ায় এমনিতেই তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী । তার ওপর সারা বাংলার ভাব আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসেবে বিবেচিত হন শ্রীচৈতন্য। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিতা ও গান বাংলা সাহিত্যকে প্রেমধর্মের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। হাসন রাজার প্রেমিক সত্তায়ও কৃষ্ণের অনুভূতি ছিল প্রবল। এছাড়াও তিনি আকৃষ্ট ছিলেন বাংলার বাউল ধারায়। (দেব, ২০১৯ : ১৩)

হাসন রাজার জীবন, সাধনা এবং রচনায় সুফিতত্ত্ব ও দর্শনের ছাপ স্পষ্ট। তিনি সৃষ্টিকর্তার দিদার লাভের আশায় জাগতিক জীবনকে তুচ্ছ করেছেন। সকল পাপের অনুশোচনা এবং পরবর্তীকালে নিজেকে সঠিক পথে পরিচালনা করার বার্তা তাঁর গানে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গানে সুফিবাদ তত্ত্বে তিনি নিজের মাঝে স্রষ্টা খুঁজেছেন। এবং তিনি এটাও বলেছেন, "আমি হতে সকল পয়দা।" তাঁর ভাষায় :

কিবা শোভা ঝলমল করে বাঁকা তার নয়নে রে
কালা না হয় ধলা না হয় নূরেরই চটক রে।
ভৈসালের বৎসরে বন্ধে দরশন দিল রে
দয়া করিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইলো রে।
তুমি আমার, আমি তোমার বন্ধে যে বলিল রে,
আমার দুঃখের কথা শুনিয়া বন্ধের দয়া হইল রে।
নূরের বদন হাসন রাজা দিলের চক্ষে দেখল রে,

আমারে করিয়া ফানা অন্তরে ছাপাইল রে।
এই দেখিলাম, এই নাই, কি করি উপায় রে
প্রেমের মাতাল হইয়া হাসন রাজা গান গায় রে।

(আলী, ২০১৫ : ১২)

মানব ও প্রকৃতিপ্রেমী হাসন রাজা

হাসন রাজার গানে জীবাত্মা পরমাত্মা মিলমিশে একাকার হয়েছে। তাঁর মানসদর্শনে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার যে প্রবল ইচ্ছে তা সহজেই অনুমান করা যায় তাঁর জমিদারি জীবনে প্রজা বাৎসল্যতা দেখে। আমরা জানি পরিবারিকভাবে হাসন রাজা একজন বড় জমিদার ছিলেন। তাঁরা ভূমির মালিকানার অংশ অর্জন করেছিলেন মোগল বাদশাদের কাছ থেকে। এই জমি হাসন রাজার পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। তখনকার আমলে হাসন রাজার পিতা সিলেটের ভূমিকর্তাদের মধ্যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোনো একটি কারণে সেই সমস্ত সম্পত্তি হাসন রাজার কাছে নগদ হয়নি। তবে, তিনি সদ্য কর্মভূমির মালিক হিসাবে পরিচালিত হননি। হাসন রাজার জমির পরিমাণ প্রায় তিন লাখ বিঘা ছিল। এই জমি থেকে তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিলো। সাধারণত বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় জমির খাজনা আদায় করা হতো নির্ধারিত হারে, একই হারে খাজনা আদায় করলে হাসন রাজার বার্ষিক আয় তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর সময়টিতে কমে যায়। তার ফলে সংসার এবং সম্পত্তির দায়িত্ব হাসন রাজার উপর পড়ে। হাসন রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারগণ প্রায়ই মিথ্যা মোকদ্দমায় তাঁকে জড়িত করার চেষ্টা করতেন এবং হাসন রাজাকে নানাভাবে উসকানি দিতেন। তবে নির্ভীক ও সম্মানজনক অবস্থার মধ্যে থেকে হাসন রাজা জমিদারি রক্ষা করেন।

যদিও জমিদারি খুব বড় না, তবে হাসন রাজা যত্নশীলভাবে সম্পত্তির রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি এই সম্পর্কে প্রায় সফলও হয়েছেন। পুরুষানুক্রমে বংশীয় পরিবারের নীতি, ধর্মবোধ, সংযম এবং সম্প্রীতির কারণে তিনি সম্পত্তি সংরক্ষণ করতে পেরেছেন। প্রাণী মানবিকতার গুণাবলিকে তিনি লালন করেন। তাই হাসন রাজা উৎসাহিত হতেন না উড়নচন্ডীর মতো। বিদ্রোহী প্রজাদের কাছে তিনি যমের মতো ছিলেন। বিদ্রোহ নির্মূল করতে না করতেই তিনি মাফ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

হাসন রাজা সঠিক নিয়মে সম্পত্তির রক্ষা করতেন, আর তিনি এই বিষয়ে অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। তিনি রাশভারি, দাম্ভিক বা বদখেয়ালী মেজাজের ছিলেন না। তিনি উদ্ধত এবং অহংকৃত ব্যক্তিত্বের মতো

নবাব না হয়ে বরং মানুষপ্রিয় ছিলেন। নিজেকে জনগণের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন যেভাবে, সবাই সহজেই তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারতো। জনগণের মাঝে নিজেকে তফাত করে রাখতেন না। তাঁর পোশাক, আচার-আচরণ সবসময় একজন সাধারণ মানুষের মতো ছিল। তাঁর জীবনযাপন প্রণালী ছিল গরিবের মতো, তিনি মুক্ত হস্ত খরচ করতেন। হাসন রাজার দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণের উপকার কতটা হয়েছে সেটি শতবর্ষ বই হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে তাঁর জীবনীগ্রন্থে অনেক গল্প পাওয়া যায়। সত্যিকারের কথা হলো, হাসন রাজা ছিলেন দুঃখী, অনাথ এবং নিরাশ্রয় মানুষের কাছে অন্ধের যষ্টি। প্রত্যেকেরই পরের তরে এটি তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

হাসন রাজার ভালোবাসা থেকে ইতর প্রাণী বঞ্চিত হয়নি। তিনি মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর সাথে সাথেই ইতর প্রাণীদের প্রতি করুণা প্রকাশ করতেন এবং তাদের মঙ্গল করার চেষ্টা করতেন। হাসন রাজার তিনি প্রাণচঞ্চল প্রকৃতির, বুনো হাতি শিকার সাড়া দিতেন এবং প্রবল উৎসাহ পেতেন অশ্বারোহণে, কোড়া পাখি বা জল মোরগ পাখি শিকারে। তাঁর জীবনে এইসব ক্ষেত্রে শিকার মানে জীবজন্তুর বধ নয়, বরং জীবন্ত অবস্থায় ধরে আনা এবং পোষ মানানোর অপরিসীম আনন্দ ছিল। একবার তিনি চলার পথে কয়েকটি অসহায় বিড়াল দেখেন, ছানারা কাতর কণ্ঠে ডাকছে। সেই ডাক তাঁর মনে সাড়া জাগিয়ে তোলে। হাসন রাজা উপযুক্ত টাকা খরচ করে সেগুলি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন। এবং একই ভাবধারায় কোড়া পাখির রীতিমতো পরিচর্যার জন্য দাসী নিয়োগ করেন। হাসন রাজার মানসগঠন ছিল আকর্ষণীয় এবং বহুবর্ণিল। তিনি রাজার মতো সমস্ত মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করতেন এবং তাদের দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করতেন। তাঁর বিশ্বাস প্রতিটি জীব বসুধার অংশ এবং তাদের পরিবেশের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধিতে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কঠোর-কমল হৃদয়ের মানুষ। এ প্রসঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী বলেন :

> হাসন রাজার জীবন যেন উপন্যাসের বিন্যাসে রচিত–নাটকীয় বিস্ময়ে পূর্ণ। কখনো সামন্ত-স্বভাবের নিষ্ঠুর মানুষ, আবার কখনো করুণা প্রেমে স্নাত মহৎ হৃদয়ের এক রাজর্ষি। প্রবল ভোগতৃষ্ণায় তাড়িত রিপু-শাসিত এক রমণীমগ্ন পুরুষ কোন এক মরমি ইন্দ্রজালের স্পর্শে মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে যান উদাসী সাধকে। (চৌধুরী, ২০১৯ : ভূমিকা)

তাই আমরা বলতে পারি, হাসন রাজা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, জাতি ভেদহীন, উদার এবং সমন্তরবাদী একজন সাধক কবি। জীবনের সকল সাধনা ছিলো ঈশ্বর আর মানুষের অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে যোগসূত্র বিধানের আশায়। তাই তিনি সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জাতি, শ্রেণি এবং মানবতার জয়গান কামনা করেছেন। তার দয়াময় প্রেম সম্পদকে চিনে সবাইকে এক হতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, জাতে জাত

মিশিয়ে যাবে। আমিত্ব না রহিবে। সকলে একজাত হয়ে যাবে। সারাজীবন তিনি নিজের থেকে অন্যের জন্যই করে গেছেন। পৃথিবীকে ভবের কারখানা হিসেবে ভেবেছেন। সবার ঊর্ধ্বে থেকে মানবতাকেই তিনি বড় করে দেখেছেন এবং সবসময় তিনি মানবতার গান গেয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. আলী, মীর লিয়াকত, (২০১৫), *হাসন রাজার গান*, মুন্নী প্রকাশ, ঢাকা

২. আলী, মুহম্মদ আসাদ্দর, (২০১৫), *মরমী সাহিত্যে জালালাবাদ*, জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, সিলেট

৩. আহ্মাদ, মোস্তাক, (২০০০), *হাসন রাজার মরমী সংগীতে সূফিরহস্য*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা

৪. উল্লাহ, আহমদ, (২০১৫), *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ

৫. ওয়াহাব, আবদুল, (২০০৮), *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৬. কবীর, জাহিদুল, (২০২১), *বাঙালী মরমী সাধনায় হাসন রাজার গান*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

৭. কবীর, জাহিদুল, (২০২২), *রাধারমন দত্ত, লোকদর্শন ও গীতিরূপ বিশ্লষণ*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

৮. খান, মোহাম্মদ আলী, (২০০৬), *মরমি কবি রাধারমণ দত্ত*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা

৯. চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পা.), (২০১৯), *হাসান রাজা মরমি মৃত্তিকার ফসল*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

১০. চৌধুরী, অমিয়শঙ্কর, (২০০০), *প্রসঙ্গ হাসন রাজার সঙ্গীতমালা*, কলকাতা

১১. দেব, সৌমিত্র, (২০১৯), *হাসন রাজার জীবন ও গান*, প্রকাশ বাংলা, ঢাকা

১২. *বাউল কবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ*, (১৯৮৮), সরস্বতী বুক ডিপো, আগরতলা, ঢাকা

১৩. ভট্টাচার্য, শরদিন্দু, (২০০৯), *বাউল বৈষ্ণব সুফী*, রেনেসাঁ প্রকাশনী, ঢাকা

১৪. মাননান, আবদেল, (২০১০), *লালনসমগ্র*, নালন্দা, ভারত

১৫. রহমান, ফজলুর, (১৯৯৪), *সিলেটের একশত একজন*, সিলেট

১৬. রাধারমণ, বাউল কবি, (১৯৯১), *মাসিক সমীকরণ*, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, সিলেট

১৭. শর্মা, নন্দলাল নন্দলাল, (২০১৪), *রাধারমণ গীতিমালা*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

১৮. শর্মা, নন্দলাল নন্দলাল, (২০১৯), *রাধারমণ গীতিমালা*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

১৯. শর্মা, নন্দলাল নন্দলাল, (১৯৯৫), *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন*, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, সিলেট

২০. সিংহ, যোগেশচন্দ্র, (১৯৮০), *ধ্যাণী রবীন্দ্রনাথ*, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, অন্দরকিল্লা, চট্রগ্রাম

২১. সুবাসউদ্দীন, মোহাম্মদ, (২০১৩), *বৈষ্ণব কবি রাধারমণ দত্ত ও তাঁর ধামাইল গান*, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

২২. হোসাইন, আবু আলী সাজ্জাদ, (১৯৯৫), *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা

২৩. Haroonuzzaman, (2011). *Radharomon*, Adom Publication, Dhaka

২৪. Rizvi S.N.H. (1970). *Bangladesh (East Pakistan) District Gezetteers,* Sylhe.

তৃতীয় অধ্যায়

রাধারমণের গানের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য

তৃতীয় অধ্যায়

রাধারমণের গানের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য

৩.১ রাধারমণের গানের বিষয়

উনিশ শতকের অন্যতম লোকদার্শনিক রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্ত (১৮৩৩-১৯১৫)। বাংলার এই লোকদার্শনিক প্রায় তিন হাজার গান রচনা করেছিলেন বলে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তিনি ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় গান গাইতেন এবং শিষ্যকূল তা মুখে মুখে শিখে প্রচার করতেন, তাই তাঁর গানের কোন লিখিত তথ্য ছিল না। তবে অধ্যাত্মচেতনা যে রাধারমণের গানের মূল বিষয় তা সর্বজনবিদিত। মালসী, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দেহতত্ত্ব, সহজিয়া ভাবসম্মিলন, কীর্তন ইত্যাদি ধারা লক্ষ্য করা গেলেও রাধারমণের সংগীত সাধনার মূল প্রেরণা সহজিয়া দর্শন। তাই তাঁর গানে জীবাত্মা আর পরমাত্মা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

রাধারমণের গানের বিষয় অনুসারে বিভাজন করলে প্রায় বিশ ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন। যেমন : ভক্তিমূলক, দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, গৌড়পদ, মনোশিক্ষা, বিচ্ছেদ, মানভজন, জলভড়া ইত্যাদি। তাঁর গানের বিষয় নিয়ে সাধারণত যে-সমস্ত আলোচনা, বই, গবেষণাপত্র, সংকলন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে প্রায় সবগুলোতেই বৈষ্ণব ধারার দিকটিই গুরুত্ব পেয়েছে। যার কারণে রাধারমণের গানের অধিকাংশ আলোচনা প্রেমভারে যা কিছু আছে সেখানে রাধা-কৃষ্ণ উপস্থিতি থাকলেই তার অর্থ পরমার্থগত করেছেন। এই কারণে সংকটটা সেখানেই তৈরি হয়। তবে বাস্তবতা এটাই, সৌন্দর্য বা সত্য যাই হোক, তার মর্মে পৌঁছাতে গেলে বাস্তব রূপক-উপমান-উপমাসহ একযোগে না গেলে সে যাত্রা কখনো পূর্ণতা পায় না, পূর্ণ হয় না। কারণ রূপক বিষয়গুলো ছড়িয়ে থাকে পদকর্তার জীবনাভিজ্ঞতার ভিতরে। কেননা প্রত্যেকটা কবির রচনার একাধিক অর্থ থাকে। প্রথম অর্থ সঞ্চারিত হয় অক্ষর বা শব্দের ভিত্তিতে আর পরের অর্থ নির্ধারিত হয় শব্দের তাৎপর্যানুসারে। সেক্ষেত্রে প্রথমটি যদি হয় অভিধানাত্মক তাহলে দ্বিতীয়টি হবে রূপকাশ্রিত।

বেশিরভাগ গবেষকগণ রাধারমণের গানের বিভাগ অনুসন্ধানে বৈষ্ণব বিষয়ক গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিরহকে বৈষ্ণব রসের মাঝেই সীমাবদ্ধ করেছেন। কিন্তু রাধারমণের গানের রাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণব রসেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কখনো কখনো তা চিরায়ত বাঙালি নর-নারীর প্রেম বিরহের অনুভবকেই ধারণ করে। কেননা রাধারমণের

শৈশব জীবন জড়িয়ে আছে ঐ অঞ্চলের অনেকের জীবনাভিজ্ঞতার বিষয়। রাধারমণ গবেষক নন্দলাল শর্মা তাঁর *রাধারমণ গীতিমালা* গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন :

> কৈশোরের দিনগুলোতে নিজ বাড়িতে প্রতিবেশি ও আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে রাধারমণের গান বিভিন্ন পালা-পর্বনে শুনতাম। তাঁর গানের বাণী ও সুর আমার কিশোর মনকে আন্দোলিত করত। গ্রামের বসন্তরাম মালাকার (প্রয়াত) আমাদের বাড়িতে আসলে আমার ফরমায়েশ মতো রাধারমণ গেয়ে শুনাতেন। ধামাইল নৃত্য সম্মিলিত নারী কণ্ঠের রাধারমণের গান সম্মোহন সৃষ্টি করত। (শর্মা, ২০১৯ : ৫)

রাধারমণের গানে লৌকিক নরনারীর প্রেম বিরহের ভাব মূর্তমান আছে বলেই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা ব্যক্তিগত দুঃখ-বিরহ আর দুর্দশাতাড়িত হয়ে রাধারমণের গান করেন। এর কারণ কী? বৈষ্ণব রসের আড়ালে তাঁর গানে এমন কী আছে যে তারা একাত্মা হয়ে যান? আমাদের সমাজে নারীর অবস্থানের দিকে তাকালেই এর উত্তর মিলবে। রাধারমণের গানে বৈষ্ণব রসের আড়ালে যে লৌকিক নরনারীর জীবনের প্রেম, দুঃখ-বিরহের ছাপ স্পষ্ট সে সম্পর্কে দেশবরেণ্য গবেষক বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর "রাধারমণ জীবনদর্শন ও সঙ্গীত সাধনা" প্রবন্ধে উল্লেখ করেন :

> মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্যের উত্তরসাধক রাধারমণ দত্তের পদে আমরা এক রক্ত মাংসের লৌকিক কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করি। শুধু তাই নয়; প্রেমিক যুবক কৃষ্ণ রাধার বিরহে কাতর আবার রাধার অভিমান দূর করার জন্য তার নানারকম ফন্দি পাঠক শ্রোতার বিস্ময় উদ্রেক করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাধারমণ দত্তের গানে যে কৃষ্ণকে আমরা অবলোকন করি সে কৃষ্ণ আমাদের লোকায়ত সমাজের একজন প্রতিনিধি গ্রামীণ জনপদের বিচরণকারী এক দুরান্ত যুবক—প্রেমিক যুবক। (সেলিম ও রায়, ২০১৬ : ৬০)

প্রসঙ্গত ঐ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন :

> জন্মের মত দিয়া ফাঁড়ি উড়ে গেল রাধাপাখী
> সুবলরে—কলসী লইয়া কাঁখে আড় নয়নে ঘোমটা টেনে
> জল আনতে যায় বিধুমুখী
> আসার আশে আর কত দিন পন্থ পানে চেয়ে থাকি।

রাধার জন্য কৃষ্ণের এই আকুলতায় আমাদের লোকয়ত জীবনই যেন চিত্রিত–কৃষ্ণকে মনে হয় বাঙালি ঘরেরই কোনো প্রেমিক যুবক। (সেলিম ও রায়, ২০১৬ : ৬০)

রাধারমণের একাধিক গানে ফুটে উঠেছে রাধাকৃষ্ণের রূপকের মাঝে লৌকিক কোন রাধার প্রাণের আকুতি বা আমাদের বাস্তব সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান। নারী সম্পর্কে মনুর শ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ করেন "রাধারমণের গানে নারী, তার রূপক ও বাস্তব" প্রবন্ধের লেখক মোস্তাক আহমেদ, "দীন পিতা রক্ষিত কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষিত যৌবনে রক্ষাতি স্থবিরে পুত্রা স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি ॥'

অর্থাৎ নারীকে কুমারী অবস্থায় রক্ষা করবে পিতা, যৌবনে রক্ষা করবে স্বামী, বার্ধক্যে রক্ষা করবে পুত্র। স্ত্রীদের কখনোই স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যাবে না। অন্যত্র এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়: 'পতি সদাচারহীন, পবদাররত বা গুণহীন হলেও সাধ্বী স্ত্রী পতিকে দেবতার মতো পূজা করবে।... স্ত্রীদের স্বামী ছাড়া পৃথক যজ্ঞ নেই, পতির অনুমতি ছাড়া কোনো উপবাস নেই। শুধু স্বামী সেবার সাহায্যেই নারী স্বর্গে যাবে।' (উল্লাহ, ২০১৫ : ৯৮)

রাধারমণের গানে বৈষ্ণব রসের রূপকের আড়ালে লৌকিক নারীর প্রেম-বেদনা পাওয়া না-পাওয়ার আকুতি আছে বলেই তা কালকে অতিক্রম করেছে। যতদিন যাচ্ছে ততবেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে রাধারমণের গান। তাই তো গবেষকগণ বলেন, যেখানে বিদ্যাসাগরের সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের প্রভাব গিয়ে পৌঁছায় না, সেখানে লোকায়ত কবি রাধারমণের দর্শন গানের মাধ্যমে ঠিকই পৌঁছে যায়। তাই রাধারমণের গানে রাধাকে দেখা যায় কখনো বিদ্রোহী, কখনো বিরহী, আবার কখনো অতিশয় সমর্পিত প্রাণ। তাই রাধারমণের গানে পাই :

আমার নারীকুলে জন্ম কেন দিলারে দারুণ বিধি
নারীকুলে জন্ম দিয়া ঘটাইলায় দুর্গতি রে ॥
শিশুকালে পিতার অধীন, যৌবনেতে স্বামীর অধীনরে
ওরে বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন আমারে বানাইলায় রে ॥
যদি আমি পুরুষ হইতাম মোহন বাঁশি বাজাইতাম রে
কত নারীর মন ভুলাইতাম বাজাইয়া মুরলী রে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে নারী জনম যায় বিফলে রে
না লাগিল সাধের জনম বন্ধুয়ার সেবায় রে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৩৭)

এবার আসা যাক রাধারমণের সহস্রাধিক গানের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা নিয়ে। বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়গুলোকে রসের উপর আশ্রয় করে গানের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। শৃঙ্গার, করুণ, বীর, ভয়ানক, হাস্য, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ইত্যাদি রসভিত্তিক বিষয়ের উপর বৈষ্ণবগণ তাদের ভজন মার্গ রচনা

করেছেন। তবে এসকল রচনার মূলভাব প্রেম থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। কেবল প্রেমের আচারকেই মুক্তি ও সুখ প্রাপ্তির অন্য লক্ষ্য হিসেবে সাধনা করেছেন। এ বিষয়ে গবেষক জাহিদুল কবীর তাঁর *রাধারমণ দত্ত লোকদর্শন ও গীতিরূপ বিশ্লেষণ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> সহজ মানুষ হইবার সাধনা দূরূহ। সামান্য মানুষ সর্বত্রই আছে। কিন্তু সহজ মানুষ চৌদ্দ ভুবনের কোথাও নেই, তাহাকে গড়িয়া নিতে হয়। তাহাকে কেবল রাগানুগা ভজনে গড়া যায়। এই ভজনের একটি ক্রম বর্তমান। এই ক্রমের প্রথমটি প্রবর্ত অবস্থা, প্রবর্ত অবস্থায় প্রথমে নামকে আশ্রয় করিয়া সাধনা চলে। তখন গুরুর আজ্ঞা পালন এবং কৃষ্ণপ্রেম সাধুসঙ্গ করে চলতে হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় হলো সাধক, এ সময় আশ্রয়ের উদয় হয়। তৃতীয় অবস্থায় হলো সিদ্ধপ্রাপ্ত হওয়া, এটির থাকে দুটি রূপ, একটি হলো প্রেম অন্যটি হলো রস। প্রবর্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয় সংযম ও শৌচাদি আচরণপূর্বক গুরুর নিকট হইতে নামপ্রাপ্ত হইয়া নাম এবং নামীয় অভেদজ্ঞানপূর্বক তাহা অনুক্ষণ জপ করিতে করিতে অন্তর ও দেহের কলুষ নিবারিত হয় এবং সাত্ত্বিক বিকারাদির উদয় হইয়া থাকে। সাধক অবস্থায় ভাবই হয়ে থাকে প্রধান আশ্রয়, এ অবস্থায় কামজয় একান্ত আবশ্যক। যখন কাম নিজের বশীভূত হয় তখন নিজের ভাব অনুসারে নায়িকা গ্রহণ করিতে হয়, সাধক অবস্থায় নিজেকেই প্রকৃতি মনে করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধ অবস্থায় নিজের প্রকৃতিভাব সম্পন্ন হইয়া যায়, যার ফলে প্রেম সাধনায় অগ্রসর হইবার পথ খুলিয়া যায়। (কবীর, ২০২২ : ৮৮-৮৯)

রাধারমণ দত্তের গানের বিষয়বস্তুর মূলে রয়েছে প্রেম সাধনা। তিনি সুরের সাধনার মাধ্যমে তাঁর গানের আবেদন, দর্শন, সামাজিক বিষয়াবলিকে সহজেই সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। প্রেম সাধনাকে মূলে রেখে রাধারমণ দত্ত যে গান রচনা করেছেন সে গানগুলোকে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বিন্যস্ত করা হলো :

ক) ভক্তিমূলক ভাববাণী
খ) গুরুতত্ত্ব বিষয়ক ভাববাণী
গ) দেহতত্ত্ব বিষয়ক ভাববাণী
ঘ) গৌরপদমূলক ভাববাণী
ঙ) গোষ্ঠ বিষয়ক ভাববাণী
চ) পূর্বরাগ পর্বের ভাববাণী
ছ) অনুরাগ বিষয়ক ভাববাণী
জ) অভিসার বিষয়ক ভাববানী

ঝ) বাসকসজ্জা বিষয়ক ভাববাণী

ঞ) বিরহ-বিচ্ছেদ বিষয়ক ভাববাণী

১. বিচ্ছেদ-শ্যামরূপ

২. বিচ্ছেদ-স্বপন

৩. বিচ্ছেদ-সাক্ষ্য খেদ

৪. বিচ্ছেদ-বিদায়

ট) মান ও মানভঞ্জন বিষয়ক ভাববাণী

ঠ) মিলন বিষয়ক ভাববাণী

ড) মনোশিক্ষা বিষয়ক ভাববাণী

ঢ) বৈষ্ণব সহজিয়া বিষয়ক ভাববাণী

ণ) ধামাইল, ও

থ) জল ভরার গীত

উক্ত বিষয়গুলোর ওপরে বিস্তারিত আলোকপাত করার প্রয়াসে রাধারমণের গানের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

৩.১.১ ভক্তিমূলক ভাববাণী

পরা-অনুরক্তির নাম ভক্তি। আর এই ভক্তির জন্য দুটি বিষয় প্রয়োজন। তা হলো ভক্তির পাত্র এবং ভক্ত। বৈষ্ণব সাধক রাধারমণ ভক্তির পাত্রের কাছে নিজেকে নিঃশর্তে সমর্পণ করেছিলেন। এই সমর্পণের মাধ্যমেই তিনি মোক্ষ লাভ করেছিলেন। বৈষ্ণব সাধনরীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভক্তি। তাই তো রাধারমণের প্রেম পরিণত হয়েছে ভক্তিতে। শ্রীমতি রাধা যেমন জীবন সায়ান্নের শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন, তেমনি ভক্ত অনুসারী হিসেবে রাধারমণও কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত মজুমদার বলেন।

> বৈষ্ণবেরা উপনিষদের রস-ব্রহ্ম বা আনন্দ-ব্রহ্মের উপাষক। আনন্দ হইতেই এই সমুদয় ভূতের জন্ম হইয়াছে। আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবিত রহিয়াছে। তাহারা আনন্দকে জানিতেছে এবং অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে—এই শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা বৈষ্ণবীয় সাধনার মধ্যে নিহিত আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্য প্রবাণ। ভগবান পূর্ণ ঐশ্বর্যময় হইয়াও নরলীলা—রূপ পূর্ণ মাধুর্যের আবরণে নিজেকে মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। (মজুমদার, ১৩৯৮ : ৩)

উপনিষদ মত অনুযায়ী প্রেম ভক্তি আনন্দ থেকেই সকল কিছুর সৃষ্টি। তাই ভক্তবৃন্দ আনন্দের মাঝেই বসবাস করেন এবং আনন্দের মাঝেই জীবনকে অতিবাহিত করেন। প্রেমরসে বিরহের মাঝেও তারা আনন্দ খুঁজে পান। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় :

আনন্দ ধারা বহিছে ভূবনে
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥
পান করি রবে শশী অঞ্জলি ভরিয়া
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥
বসিয়া আছ কেন আপন মনে
স্বার্থনিমগন কী কারণে ?
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥

একইভাবে বৈষ্ণব কবি রাধারমণের গানেও ভক্তির মাঝে আনন্দ ফুটে ওঠে :

হরি গুণাগুণ কৃষ্ণ গুণাগুণ রাধা গুণাগুণ গাওরে
সদায় আনন্দ রাখিও মনে।

(ভট্টাচার্য্য, ২০১৫ : ৩১৭)

ভক্তিরসে সিক্ত হয়ে রাধারমণ এমন ভক্তি বা প্রার্থণামূলক সাধনগীত রচনা করেছিলেন। প্রেম রসে মত্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য তিনি বিরহের মাঝে আনন্দ খুঁজে রাধার রূপে নিজেকে সমর্পণ করেন তার গানে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তার পূজা পর্যায়ের গানে ভক্ত রূপে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পূজা পর্যায়ের গান পর্যালোচনা করলে তাঁর ধর্মবোধ, পথ চলার শক্তি ও মানবজীবনের উত্থানপতনের রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের সাথে মানবমনের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিনিয়ত যোগসূত্র ঘটে তা রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানের মাঝে প্রকাশ পায়। যেমন :

শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে—
চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে।

(ঠাকুর, ২০১৭ : ১১৫)

বৈষ্ণব কবি রাধারমণ তার সাধনরীতির অন্যতম উপাদান ভক্তি ভাবরস দিয়ে জীবনে মোক্ষ লাভের আরাধনা করেছেন। এবং রচনা করেছে শতাধিক ভক্তিবিষয়ক ভাববাণী। নিচে রাধারমণের ভক্তি বিষয়ক গানের উদাহরণ দেওয়া হলো :

১

আমারে করগো উদ্ধার, আমি অধম দুরাচার।
কত পাপের ভরা লইছি মাথে, হইয়াছি দ্বিগুণ ভার ॥
সোনা থইয়ে, দস্তা লইয়ে, করিতেছি রঙ্গের কারবার।
কত হীরামন মানিক্য থৈয়া, রাংচায় মন মজিল আমার ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, আমি ভুলিয়ে রইলাম মায়াজালে।
আমার মতো পাপী বুঝি ত্রিজগতে নাই গো আর ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৪)

২

প্রভু তোমায় ডাকি আমি হরিবল বলে
দয়া করি নেও আমারে তোমার নায়ে তুলে।
দীনজনে পার কর গুরু ঠেকছি ভবের জঞ্জালে
ভবের মায়ায় কাল কাটাইলাম নেও দয়ার ছলে।
ভবের ঘাটে দিছ খেওয়া দয়াগুণে আনা নেওয়া
পার কর দয়াল গুরু দীনহীন কাঙ্গালে।
মনমাঝি হয়ে বেভুল নাশ কইলো বিভব অতুল
এখন আর দেখি না কূল তাই ডাকি দয়াল বলে
দয়া করি নেও মোরে ঠেকিয়াছি ভব সায়রে
শ্রীরাধারমণের আশা ঐ চরণ তলে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৪০)

৩

হরির নাম লওরে মন লও কৃষ্ণ নাম
এই নাম জপিলে পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥
হরির নাম বলরে বদনে বল হরির নাম
হরির নামে পার হব জগৎ, যাব নিত্যধাম ॥

অনিত্য সংসারে আমার ডুবে আছে মন
হরির নামে চালাও বৈঠা চল বৃন্দাবন ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জন্ম যায় বিফলে
আমি অন্তিমকালে লইতে যেন পারি হরির নাম ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৪২)

৪

কৃষ্ণ নাম লওরে মন দুরাচার
কৃষ্ণবিনে সকলি অসার ॥
পানি উঠে ভাঙ্গা নাওয়ে কার ভরসায় বৈঠা বাওরে
নৌকা আস্তে আস্তে তল অইলোরে ॥
যখন নৌকা অইল তল তখন করো কার বলরে
ভাইবন্ধু সবই রইলো চাইয়া রে ॥
সঙ্গে নিলাম মাঝি বেটা সে ফালাইয়া গেল বৈঠা
শুধু নৌকা ফিরে ঘাটে ঘাটেরে।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
জীবন সহিতে অইবায় পার ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৪৩)

৫

জয় গৌরার নামে বাদাম তুলি দেও ডংকায় বাড়ি
বিপদকালে নাম জপ শ্রীগৌর হরি ॥
গৌরা তোর কপিন ধারণ করি হরিণাম বিলাইছে
দয়া করি সঙ্গে নিবায় পারে যাইবার কালে
ও মাঝিরে অকূলে ধইরাছ পাড়ি তুফান উঠ্যাছে
এই নিবেদন রক্ষাকর পারে যাইবার কালে।
ভাইবে রাধারমণ বলে, গৌর তোমার চরণে পড়ি
অন্তিম কালে চরণধূলি দিও দয়া করি ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৪৮)

৬

প্রাণবন্ধু দাসীরে ফিরিয়া চাইও
অবলা রাধারে বন্ধু মনেতে ভাবিও।
নিতি নিতি চুপে আইসা যাওয়া কোন রূপেরে
ওগো ননদীর ডরে বন্ধু আমায় না ছাড়িও।
মই যাইমু যমুনার জলে, ও বন্ধু তুমি যাইও কোন ছলেরে
এগো কদমডালে বসিয়া বন্ধু বাঁশিটি বাজাইও।
তুমি আমার প্রাণপ্রিয় আমায় শান্ত কর দেখা দিয়ারে
আমার বিষাদ সংকটের কালে যুগল চরণ দিয়ো গো।
দীনহীন কাঙ্গাল আমি ঠেকিয়া রইমু মায়াজালে রে
ওগো শ্রীরাধারমণে বলে দুঃখ দিলে দুঃখ সইও ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫১)

৭

ভক্তিসিন্ধু নীরে এবার গৌর বলে সাঁতার দিয়াছি ॥
এখন আমি কূল পাইলে যে বাঁচি ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব হলে আগম নিগম বেদ পুরাণে
মুনি ঋষি মহাজনের তত্ত্বগ্রন্থে তারে জানিয়াছি।
সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
ভক্তি বিনে নাই রে মূল্য গৌরলীলাতে তায় জানিয়াছি।
চৌষষ্ট্যাঙ্গ ভক্তি রসে যাতে কৃষ্ণ কর ধ্যান
শ্রীগুরুর দেশে ভক্তি রসের বীজ বুনিয়াছি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির মূল স্কন্ধ
অদ্বৈত আদি ভক্তবৃন্দের আসার আছে বইয়ে আছি।
কৃষ্ণভক্তি সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গার জল
তাহা ডুবে মরণ ভাল, এবার মনে সাধ করিয়াছি।
প্রভু রঘুনাথ রসের গুরু মনবাঞ্ছার কল্পতরু
রাধারমণ বলে দয়াল গুরুর চারণ কমল সার করিয়াছি ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৪৫-১৪৬)

৩.১.২ গুরুতত্ত্ব বিষয়ক ভাববাণী

মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের বাঁকে বাঁকে শৃঙ্খলার শিকলে বন্দি মানুষের জীবন। অসীম চাওয়ার রাজ্যে ভক্তের পাওয়াগুলো নিতান্তই আপেক্ষিক। চাওয়া-পাওয়ার চোরাবালীতেও মরীচিকায় স্বপ্নে বিভোর মানুষগুলোর আকাঙ্ক্ষার যেন শেষ নেই। এ হিসেব এত বেশি নির্মম ও নিষ্ঠুর যার নির্মমতায় আপন-পর ঠাহর করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। তৈরি হয় অবিশ্বাস, ভেঙে পড়ে সংসার, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে বন্ধন, ভূলুণ্ঠিত হয় মানবতা। অতৃপ্ত আত্মা এতটাই বেসামাল হয়ে পড়ে যে, মিথ্যা তৃপ্তির আস্বাদন লাভে ন্যূনতম সামাজিকতা দেখানোর প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তার ওপরেই নির্ভর করে আত্মার প্রশান্তী। অদৃশ্য এ বন্ধন নির্মাণে তাই প্রয়োজন হয় গুরুর দীক্ষা। লালন সাঁই তাঁর গানে বলেন :

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী।
ইতরপনা কার্য আমার ঘটে অহর্নিশি।।
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে
এসেছিলাম কড়ার দিয়ে।
সে সকল গিয়াছি ভুলে ভবে তে আসি।।
চিনলাম না সে গুরু কি ধন
করলাম না তার সেবা সাধন।
ঘুরতে বুঝি হলো রে মন আবার চুরাশি।।
গুরুরূপ যার বাঁধা হৃদয় শমন বলে তার কিসের ভয়।
লালন বলে মন তুই আমায় করিলি দোষী।।

(মাননান, ২০১০ : ১৭৭)

অদ্বয়তারক উপনিষদ শ্লোকে বলা হয়েছে, অক্ষর 'গু' মানে অন্ধকার, অক্ষর 'রু' যিনি তাদের দূর করেন, অন্ধকার দূর করার শক্তির কারণে, এইভাবে গুরুর নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই গুরু যিনি অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেন। হিন্দুধর্ম মতে গুরু ঐতিহ্যের প্রাচীন ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। বৈষ্ণবরীতি অনুযায়ী গুরু চূড়ান্ত মুক্তি, মোক্ষ লাভের মূল শক্তি। এবং গুরু হলো সত্য ও সুপথের সন্ধানদাতা। আমাদের মনকে কু-পথ থেকে সু-পথে পরিচালনা করার জন্য সৎ গুরুর সঙ্গ প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক সাধন পথের পথপ্রদর্শনকে গুরু বলা হয়। যিনি সাধনার মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করেন তিনি গুরু। চৈতন্য বলেন :

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাহে গুরু চৈত্ত রূপে

শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহন্তস্বরূপে।

অর্থাৎ 'চিত্তে যেখানে আপনিই আলো জ্বলে উঠে সেখানে গুরু আলেখ্য—বা চৈত্ত্য মহান্তরূপে কৃষ্ণই শিক্ষা দেন।' এখানে চৈতন্য বলতে চায়, কৃষ্ণই গুরু, মানুষরূপে হোক বা মনের উদ্ভাসে হোক। চৈতন্যের নির্দেশে সনাতন ও রূপ ভক্তি শাস্ত্র রচনা করেন, তাতে গুরুর প্রাধান্য সুস্পষ্ট। চৈতন্যের ধর্মে শুধু ভক্ত ও ভগবান। মাঝখানে কেহ বা কিছু নেই। এ সাধনায় ভক্তের স্থান নিলেন রাধা। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম পর্যায়ে গুরুতত্ত্বের গুরুত্ব কম থাকলেও শেষার্ধে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পর গুরুতত্ত্ব বৈষ্ণব মতের একটি বিশেষ অঙ্গে পরিণত হয়। সাধক রাধামরণ দত্ত পিতার কাছে প্রাপ্ত বৈষ্ণবীয় রীতিতে প্রভাবিত হয়ে গুরুতত্ত্ব বিষয়ক শতাধিক সাধনগীত রচনা করেন। কেননা বৈষ্ণব গানে গুরুর কৃপা ছাড়া সাধনার কোন স্তরেই পৌঁছানো সম্ভব নয়। অপ্রেমিক প্রেমহীন হৃদয়ের ভক্তের জন্য গুরু শান্তির আশ্রয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ থেকে গুরু দেয় মুক্তি। হাজার বছর ধরে বাংলা লোকসংস্কৃতিতে গুরুর কাছে শিষ্যের ভাবের আদান-প্রদান হয়ে আসছে। বৈষ্ণব সাধক রাধারমণ গুরুর প্রেমে মত্ত হয়ে রচনা করেছেন শতাধিক গান :

১

গুরু আমার উপায় বল না, জন্মাবধি কর্মপোড়া আমি একজনা।

(আমার) দুঃখে দুঃখে জনম গেল, সুখ বুঝি আর দিলায় না ॥

শিশুকালে মৈরে গেল মা, গর্ভেথইয়া পিতা মৈল চক্ষে দেখলাম না।

গুরু কে করিবে লালন পালন কে করিবে তুলনা ॥

গিয়াছিলাম ভবের বাজারে ছয় চুরায় যুক্তি কৈরে বান্‌ল আমারে

চোরায় চুরি করে খালাস পাইল, আমায় দিল জেলখানা।

ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবনে যায় বিফলে

গুরুর চরণ পাব প্রাণ জুড়াব এই আশা মোর পূরল না।

(শর্মা, ২০১৯ : ৭১)

২

গুরুভক্তি নাই যার অন্তরে

মহাপাপী দুরাচার সে নরাধম পশুর সমান রে।

মানুষ হইলে কি হয় মানুষের কাজ যদি না করে

আহার নিদ্রা মৈথুনাদি পশুরে দিয়াছেন বিধি

তারা সব নিরবধি বিধানে সব কার্য করে।

শুধু জ্ঞানের জন্য মানুষ জন্ম নিলাম সংসারে।

ভাইবে রাধারমণ কয় শাস্ত্র বিদ্যা জ্ঞানের বিষয়

যদি জ্ঞান না হয় মনে সেই জ্ঞানের ফল কিছু নাইরে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৭৬)

৩

পতিত পাবন নাম শুনিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি কূলে।

দয়াল গুরু পার কর দীন হীন কাঙালে।

আমার নাই পয়সা না জানি সাতার,

আমারে নেও নায়ে তুলে ॥

ভবের ঘাটে দিচ্ছ খেওয়া, আপন হাতে ধরছ বৈঠা,

পার কর দয়াল গুরু দিন গেল হেলে।

আমার মন মাঝি হইয়াছে বেভুল ডুবাইতে চায় নীলমণিরে ॥

দেখিয়া ভবের তরঙ্গ প্রাণ ত হইয়াছে ভঙ্গ,

ধর অঙ্গ শীতল কর সাধ রাখি মনে;

গোসাই শ্রীরাধারমণের আশা ঐ রাঙ্গা চরণ তলে।

(শর্মা, ২০১৯ : ৭৯)

৪

সজনীগো গুরু কী ধন চিনলাম না

অমূল্য ধন গুরুর চরণ ভজন হইল না ॥

বেচলাম জিনিস নগদ বাকি, লইয়া গেল দিয়া ফাঁকি

আর কত দিন বসে থাকি আসল উসল হৈল না ॥

আমার মনেতে মন পাগল, বনে পাগল ময়না

হৃদয় পিঞ্জিরার পাখি সয়ালে বেড়ায় না।

কামনদীতে তিনধারা চিনতে পারলাম না

সেই নদী চিনতে পারলে তন্ত্রমন্ত্র লাগে না ॥

শ্রীরাধারমণ বলে আমার ঘাটে যাওয়া হইল না

বেভুলেতে দিন গয়াইলাম গুরুর চরণ ভজলাম না ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৮২)

৫

বৃথা জনম গেলোরে ভাই বৃথা জনম গেলো

হারিয়া বন্ধের নাম পড়িলাম জঞ্জালে ॥ ধু ॥

শিখিয়া আসিলাম নাম বন্ধুয়ার নিকটে

ভুলি গেলাম শ্যাম নাম জগতের দাপটে।

শ্রীগুরুর নিকটে গেলে সেই নাম মিলে

রাধারমণ যাইতে না পারে রাধার জঞ্জালে।

(শর্মা, ২০১৯ : ৮০)

৬

মুর্শিদ বলি নৌকা ছাড়ো তুফান দেখি ভয় করিও না

মুর্শিদ নামে ভাসলে তরী অকুলে ডুবিবে না।

নদীর নাম কামিনী সাগর লাফে লাফে উঠছে লহর

কত ধনীর ভরা খাইছে মারা পড়িয়া নদীর বিষম বানে।

মণিপুরে মাঝি চাইরজনা নাওয়ের মাঝি আর ছয়জনা

আসিছে কামের তুফান সাবধান হাইল ছাড়িও না।

ভাইবে রাধারমণ বলে অজ্ঞান মন তুই রইলে ভুলে

যেই মুর্শিদ কাণ্ডারী সে তরী কখনো ডুবে না ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১০৪)

৬

মোরে কাঙ্গাল জানিয়া পার করো দয়াল গুরুজী

মোরে কাঙ্গাল জানিয়া পার করো ॥

বানাইয়া রংমহল ঘর অঙ্গে অঙ্গে জোড়া

নব কোঠায় জ্বলছে বাত্তি ষোল্লজন পারা

লাভ করিতে আইলাম ভবে লইয়া সাউদের ধন

পড়িয়া কামিনীর ফেরে হারাইলাম রতন।

কত কত সাধুজনা গাঙ্গে বাইয়া যায়

রঙের নিশান পাল টানাইয়া প্রেমের বৈঠা বায়।

সর্প হইয়া দংশো গুরু উঝা হইয়া ঝাড়ো

মরিলে জিয়াইতায় পারো যদি দয়া ধরো।

কহে হীন রাধারমণ অঙ্গ ঝর ঝর

ভবার্ণব তরিয়া যাইতে কিঞ্চিত দয়া ধরো ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১০৪)

৭

গুরু কও মোরে সার শিক্ষা দেও মন্ত্র মোরে

যে মন্ত্রে ভব পার।

এই সেই বলি মোরে ঘুরাইও না আর

দীক্ষা নিছি শিক্ষা দেও যেই মন্ত্র সার।

দক্ষ গুরু জানিয়াই ধরিয়াছি পদ সার

অপার ভব পারাবার।

ভাবিয়া রাধারমণ বলে গুরু পরম সার

কৃপা করি পুরাও গুরু বাসনা আমার।

(বাগচী, ২০১৩ : ৮৬)

৩.১.৩ দেহতত্ত্ব বিষয়ক ভাববাণী

দেহতত্ত্ব হলো দেহ বা মানব শরীরে অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরমাত্মার সন্ধান করা। দেহতত্ত্বের Physiology বা Bodilism মানে দেহই সকল রহস্যের মূল। দেহকে দেখার অর্থই হলো দেহকে পাঠ করা বা আত্মদর্শন করা। দেহতত্ত্ব বিষয়ে সিদ্ধাচার্য লুইপাদ চর্যাগীতিকায় বলেছেন :

কাআ তরূবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ॥ [ধ্রু] ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ ॥ধ্রু॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখে দুখেতে নিচিত মরিঅই ॥ ধ্রু॥
এড়িঅউ ছান্দ বান্ধ করণ কপটের আস।
সূনু পথে ভিড়ি লাহূ রে পাস ॥ ধ্রু॥
ভণই লুই আম্হে ঝাণে দীঠা।
ধমণ চবণ বেণি পিণ্ডী বইঠা ॥ ধ্রু॥

অন্তর্নিহিত ভাব

শরীরের পাঁচ ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের নিত্য জানাশোনার পালা চলেছে– জানাশোনা যতোই বাড়ে ততই বেশি করে প্রীতির সঞ্চার হয় এবং বস্তুজগৎকেই চরম ও পরম জ্ঞান করে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বস্তুজগতের মায়ামোহ-বন্ধন মানুষের জন্য ধ্বংসের পথ। বাঁচার পথ দেখাতে পারেন গুরু। সেই গুরুর নির্দেশে ইন্দ্রিয়ের পথ পরিহার করে যোগ-সাধনার পথ বেছে নিতে হবে। সিদ্ধাচার্য লুইপাদ সে কথা বুঝেছেন, এবং তাই যোগ সাধনায় উপবিষ্ট হয়েছেন। (হাই ও পাশা, ২০১৯ : ৬৩-৬৪)

নিজেকে জানাই মাধ্যমেই পরম সত্তার অস্তিত্ব জানা যায়। লালন সাঁই জী আপন অস্তিত্বের মাঝেই পরমাত্মাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি তাঁর গানে বলেছেন :

আপন ঘরের খবর নে না।
অনা'সে দেখতে পাবি
কোনখানে সাঁইর বারামখানা।।
(মাননান, ২০১০ : ১৯৮)

তাই অস্তিত্বের রহস্য গভীরভাবে ও একনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান করলে, পাঠ করলে ও আত্মদর্শন করলে অচেনার সাথে সংযোগ ঘটানো সম্ভব। মহাসত্যকে জানা ও পাওয়ার মাঝে একমাত্র দেহকেই অবলম্বন করে সাধনা করতে হবে। কেননা সাধকগণ বিশ্বাস করেন, যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহে ভাণ্ডে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের দেহের মাঝে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু দিয়েছেন। তাই ভজন সাধন সব দেহের মাঝেই। অর্থাৎ শারীরিকতা দিয়ে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে সংযুক্ত হওয়া সম্ভব। ধ্যান বা ভজনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সাথে যুক্ত হওয়া যায়। মিলনের মাধ্যমে জগতের সকল বিশ্বয়কে বোঝা যায়। শারীরিক সম্পর্ক (Sex) দেহতত্ত্বর বড় অংশ। এজন্যই বলা হয় সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দেহতত্ত্ব একই সূত্রে বাঁধা। তাই দেহ না বুঝলে সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝা সম্ভব না। এই জন্য সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> যে পদ্ধতিক্রমে নরনারীর সংযোগে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারে উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষের প্রভাবে নূতন জীবে অস্তিত্বের বোধ ফুটিয়া উঠে। দেহের মধ্যে যাহা কতকটা স্থিতিবাচক, তাহারই সৃষ্টি হয়, আর নারীর প্রভাবে দেহের নাম ও রূপ যাহা কিছু পরিবর্তনশীল তাহারই সৃষ্টি হয়। তাই তন্ত্র অনুমান করে যে মেদ, মজ্জা, অস্থি, নখ প্রভৃতি পিতৃবীর্যে সৃষ্টি হয়; মাতৃরজে শোণিত, মাংস, চর্ম, কেশ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। তেমনি বিশ্ব সংসারে পুরুষপ্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির বিকাশ হয়। (বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, ১৩৫৮ : ২৯৪)

দেহতত্ত্ব বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মানবদেহের বৃহত্তর সংস্করণ হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন। কেননা পৃথিবী গঠিত যেমন আলো, বাতাস, পানি দিয়ে। মানবদেহও একই রূপে গঠিত। এই মানবদেহের পিছনে রয়েছে ছয়টি শত্রু, যাকে বলা হয় ষড় রিপু—দেহতত্ত্বে এদের চোর হিসেবে বিবরণ দেওয়া হয়। এই ষড় রিপু হলো-

১. কাম—যৌন সঙ্গ কামনা, রিরংসা, যৌনক্ষুধা (Sex urge)
২. ক্রোধ—রাগ, উত্তেজনার বশীভূত হওয়া (Anger)
৩. লোভ—লালসা (Cupidity)
৪. মদ—অহংকার, আত্মগৌরব (Arrogance)
৫. মাৎসর্য—পরশ্রীকাতরতা, অন্যের ভালো না দেখতে পারা (Envy)

এরই পাশাপাশি রয়েছে মানবদেহে আট কুঠুরি নয় দরজার তত্ত্ব। এই আট কুঠুরি হলো শরীরের আটটা গ্রন্থি। পিটুইটারি, থাইমাস, থাইরয়েড, প্যারা থাইরয়েড, প্যারোটারি, প্যাংক্রিয়াস, এলড্রিনাল ও ওভারিস।

মানবদেহ বেঁচে থাকে এই আটটি গ্রন্থির মধ্য দিয়ে হরমোন সিক্রিয়েশনের জন্য। আর এই আটটি গ্রন্থির সঙ্গে শরীরের নয়টি দ্বার যুক্ত। যাকে সাধকগণ নয় দরজা বলে থাকে। যথা : দুই কান, দুই চোখ, নাকের দুই ফুটো, মুখ, জননাঙ্গ ও পায়ু। মহাত্মা লালন সাঁই জী তাঁর গানে এ সম্পর্কে বলেছেন :

আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা, মধ্যে মধ্যে ঝড়কা কাঁটা
তার উপরে সদর কোঠা, আয়না মহল তায় ॥

(মাননান, ২০১০ : ৯৩)

পরমাত্মাকে জানার আগে নিজেকে জানার চেষ্টা করেছেন রাধারমণ। তিনি দেহের মাঝেই দেহাতীতের সন্ধান করেছে। তার রচিত গানের মাধ্যমে দেহতত্ত্বের সন্ধান দিয়ে গেছেন। যেমন :

১

আমার দেহতরী কি দিয়া গড়িলায় গুরুধন।
আমি ভূতের বেগার খাইটে মইলাম পাইলাম না শ্রীগুরুর চরণ ॥
নায়ের আছে ষোল গুড়া মধ্যে মধ্যে আছে জোড়া ওবা গুরুধন।
নায়ের হাইল মানে না গুণ বলে না মন মাঝি ভাই পাই না দর্শন ॥
পার হৈতাম গেলাম ধাইয়া সে পারে পাষাণের মাইয়া ওবা গুরুধন।
মাইয়ায় পার করে না, কুলে বৈসা ভাবতে আছে রাধারমণ ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ২৯৯)

২

আমার দেহতরী কে করলো গঠন
মেস্তরি কে চিননি রে মন ॥
ঐযে নায়ের গুড়া আছে ছোটবড় সব দিয়াছে
কে কৈলো গঠন গো নায়ের কে কৈলো গঠন
লুআ ছাড়া তক্তার জোড়া বেশ করিয়াছ পাঁতন।
ঐ যে নায়ের গরা আছে গরায় গরায় মাল আছে
কে কৈলো ওজন গো নায়ের কে কৈলো ওজন
ছয় জনাতে চালায় তরী কে হইয়াছে মহাজন ?
ভাইবে রাধারমণ ভনে মিছা ভবে আইলাম কেনে
না কৈলাম সাধন গো আমি না কৈলাম সাধন
হেলায় হেলায় দিন গয়াইলাম কুন কাজেতে দিয়া মন ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ২৯৯-৩০০)

৩

প্রাণবন্ধু দাসীরে ফিরিয়া চাইও
অবলা রাধারে বন্ধু মনেতে ভাবিও।
নিতি নিতি চুপে আইসা যাওয়া কোন রূপেরে
ওগো ননদীর ডরে বন্ধু আমায় না ছাড়িও।
মুই যাইমু যমুনার জলে, ও বন্ধু তুমি যাইও কোন ছলেরে
এগো কদমডালে বসিয়া বন্ধু বাঁশিটি বাজাইও।
তুমি আমার প্রাণপ্রিয় আমায় শান্ত কর দেখা দিয়ারে
আমার বিষাদ সংকটের কালে যুগল চরণ দিয়ো গো।
দীনহীন কাঙ্গাল আমি ঠেকিয়া রইমু মায়াজালে রে
ওগো শ্রীরাধারমণে বলে দুঃখ দিলে দুঃখ সইও ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫১)

৪

কে তোরে শিখাইল রাধার নামটিরে শ্যামের বাঁশি
রাধা রাধা বলে মন করলায় উদাসীরে ॥
যখন শ্যামে বাজায় বাঁশি যমুনাতে কাঙ্কে কলসীরে
জল ভরা তো হইল না মোর ভেসে যায় কলসীরে ॥
তাঁর বাঁশিতে মধু ভরা মন প্রাণ করিল সারারে
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম ঘরের বাহির হইয়ারে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলেরে
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম চিরদাসী হইয়ারে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫০)

৫

জলে যাইও না গো রাই
আইজ রাধার জলে যাওয়ার জাতের বিচার নাই
মায়ে পিন্দইন যেমন তেমন ভইনে পিন্দইন শাড়ি
শ্রীমতি রাধিকায় পিন্দইন কৃষ্ণানীলাম্বরী।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোনগো ধনী রাই
কালার লাগি হইছন পাগল, কমলিনী রাই ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫১)

৩.১.৪ গৌরপদমূলক ভাববাণী

বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল ধর্ম সাধনাকে কেন্দ্র করে। এই ধর্মকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বৈষ্ণব পদাবলি। আধুনিক কালের কবিরাও এই বৈষ্ণব পদাবলির প্রভাবমুক্ত নয়। তবে এই বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলে যে মহাপুরুষের আগমন তিনি গৌরচন্দ্র। গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরিপদ প্রবর্তন সম্পর্কে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন–

> চৈতন্য উত্তর যুগে পদাবলি সাহিত্যে গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরপদ (গৌরঙ্গ বিষয়ক পদ) প্রবর্তিত হয়। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব প্রেমলীলাকে পরিণতির নানাস্তরে বিভক্ত একটি মানবিক প্রেমকাহিনীরূপে অভিসার, বিরহ, মানুর-বিরহ, ভাব সম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে বিন্যস্ত করে একে একটি সুনির্দিষ্ট রস পরিণতি দান করেছেন। এসকল পালা সম্পর্কে বিভিন্ন কবির রচিত পদাবলিকে অর্থাৎ সমরসের পদাবলি যথাক্রমে সাজিয়ে যে লীলা গান করা হয় তাকে পালাবদ্ধ কীর্তন বলা হয়। ঐ পালাবদ্ধ লীলাকীর্তনের সময়ে যে বিষয়ের, যে রসের কৃষ্ণলীলা গীত হবে, তার ভূমিকা হিসেবে সেই পালার রসদ্যোতক যে গৌরপদ গীত হয়, তাই বিশিষ্টার্থে প্রকৃত গৌরচন্দ্রিকা। (ভট্টাচার্য, ১৯৬৮: ৮১-৮২)

গৌরচন্দ্রিকা প্রবর্তন করেছিলেন শ্রী নরোত্তম ঠাকুর। এই গৌরবঙ্গ বিষয়ক পদ রচয়িতাদের মধ্যে যারা শ্রীগৌরপদকে সরাসরি দেখেননি তাদের ভাবদৃষ্টিতে গৌরসুন্দরের রূপ ও লীলা উদ্ভাসিত হয়েছে। তাদের রচনায় কোন কোন পদে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ ভাবে প্রকাশিত আবার কোন কোন পদে রাধা ভাবে প্রকাশিত। পদকর্তাদের দর্শনে অন্তরঙ্গে যিনি কৃষ্ণ এবং বহিরঙ্গে তিনি রাধা। তাই উভয় ভাবেই গৌরপদ রচনা করেছে তারা।

বৈষ্ণব কবি রাধারমণ বিশ শতকের শুরুর দিকে প্রায় দুই শতাধিক গৌরপদ রচনা করেছেন। তিনি তাঁর একাধিক পদে গৌরতত্ত্বের মাহাত্মের উল্লেখ করেছেন। তিনি জাতের বিচার না করে ঘরে ঘরে প্রেম বিতরণের কথা বলেছেন। কৃষ্ণবিরহের রাধার আর্তি রাধারমণ গৌরবিরহের আর্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর পদে তাই তিনি যে দিকে তাকিয়েছেন সেদিকেই গৌরিমা দেখেছেন। তার স্পষ্ট ছাপ তাঁর পদ রচনার মধ্যে। শ্রীচৈতন্যদেবের রাধাভাবে আবেশে কেদে কেদে গড়াগড়ি দিতেন। তখন 'রাধা' নাম উচ্চারণ করতে পারতেন না শুধু 'রা রা' বলতেন। কিন্তু রাধারমণ রাধানাম উল্লেখ করেছেন তাঁর গৌরপদে। যেমন :

১

তোরা দেখে যা গো নাগরী গৌর প্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে

রসের সরতি গৌর নাইদায় আসিয়াছে

নাগরী গো মুখে বলে রা—রা—রা

দুই নয়নে বহে ধারা গো

এগো সুরধুনীর ধারা যেনো ধারায় ধারায় ভাইসাছে ॥

নাগরী গো—যেদিকে গৌর হেলিয়া পড়ে

সেইদিকে নিতাইরে ধরে গো—

এগো—ভাইবে রাধারমণ বলে আর কি গোরার বাকি আছে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১২৬)

রাধারমণের গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গৌরতত্ত্ব হলো শ্রীগৌরাঙ্গ; বহিরঙ্গে রাধা, এবং অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ অর্থাৎ তিনি রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত সত্তা। গৌরাঙ্গ রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ ভজনা করতেন বিধায় বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধাভাবের প্রাধান্য বেশি। নিচে রাধারমণের গৌরবাণী বিষয়ক পদ দেওয়া হলো :

২

গৌর প্রেমের এত জ্বালা সখি জানি নাগো আগে জানি না

সুরধুনীর তীরে গৌর নারীবধের ফান পাতিয়াছে

ঘাটে নামলে পরে পড়বে ফেরে আসতে পারবে না।

তুষের অনল ঘইয়া জ্বলে মনের অনল দ্বিগুণে জ্বলে

আমার হিয়ার মধ্যে জ্বলছে অনল সইতে পারি না।

ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেম করিও না তোমরা সবেগো

আমি একজন মরছি প্রেমে তোরা মইরো না ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১১৮)

৩

গৌর আমার কাচা সুনা

ও রূপে যাইগো মরি বলিহারী

কী দিয়ে করি প্রাণ সান্ত্বনা ॥

গিয়াছিলাম সুরধুনী

হেরিয়াছি শ্যামগুণমণি

আর নয়নে দেয় গো দেখা

আঁখির ঠারে প্রাণ বাঁচে না ॥

সুনার বরণ আভা নাসিকায় তিলকশোভা

ধন্য ধন্য রূপলাবণ্য কী দিয়ে করল যাদুটোনা ॥

ভাবিয়ে রাধারমণ বলে প্রাণ সঁপিলাম শ্রীচরণে

অধৈর্য হইয়াছে প্রাণ, বুঝাইলে প্রাণ বুঝ মানে না ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১১১)

৪

চলো চলো রাই গৌরচান্দের রূপ হেরিতে

গৌররূপ হেরে পারি না গো এ দেহে প্রাণ রাখিতে ॥ ধু ॥

কী করিবে কুলমান মইলে কি প্রাণ সঙ্গে যাবে

আমি এ কূল রাখি সে কূল ভাসাই জলেতে।

ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুনগো তোরা সকলে

ভুবন ভুলাইলো গো আমার প্রাণ গৌরার রূপেতে।

(শর্মা, ২০১৯ : ১২৩)

৫

পূর্ণিমা ফাল্গুনো মাসে জন্মিলা গৌরাঙ্গ

জন্মিলা গৌরাঙ্গ আমার জন্মিলা গৌরাঙ্গ ॥

শচীর গর্ভে জন্ম নিলেন গৌর গুণমণি

কী শোভা কী নয়ন বাঁকা কতই ভঙ্গি করে গো ॥

দশমাস দশদিন পরে গৌরাঙ্গ ভূমিতে পড়িল

নারীগণে সবে মিলি নাড়ি ছেদ করিল ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া

নন্দরাণীর আশা পূর্ণ কর গৌরহরি আসিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৩৫)

৬

রসময় করে প্রেমসিন্ধু মথন

সজল উজ্জ্বল রসের মিলন

মদনমোহন হলেন গৌরাঙ্গ ॥

রূপেতে স্বরূপ মিশাইয়ে

দুই অঙ্গে হইয়ে ত্রিভঙ্গ ॥

অষ্টবিংশ চতুবর্গে

রাধার প্রেম অনুরাগে

জীবের ভাগ্যে ব্রজলীলা সাঙ্গ।

রাইরূপে শ্যামঅঙ্গ

চাই যে সদা রাধা প্রেম প্রসঙ্গ ॥

রাধাপ্রেমে মতোয়ারা

দুই নয়নে জলধারা

ভাবের নাটরা করে কত রঙ্গ।

হরিহরি রাধা বৈলে ধুলায় লুটে সোনার অঙ্গ ॥

ভক্তগণ সনে মহাপ্রভু রাত্র দিনে

রাধা প্রেমরসের তরঙ্গ

শ্রীরাধারমণের আশ

পাইতে গোরাচান্দের সঙ্গ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৪১)

৭

রাধাপ্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে ॥

নদীয়াপুরি ডুবু ডুবু শান্তিপুর ভাসিয়াছে ॥

গৌরাঙ্গ প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাবের বন্যা লাগিয়াছে।

শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ গৌরপ্রেমে মাতিয়াছে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমসলিলে রূপ সনাতন ডুবেছে।

তীরে বৈসে হরিদাস প্রেমের লহর গণতেছে।
শ্রীরাধারমণ বলে যেজন প্রেমে মইজেছে।
জন্মমৃত্যু কৈরে বারণ ব্রজধামে চইলেছে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৪২)

৮

হৃদয় মন্দিরে গুরু গৌরাঙ্গ রূপ হেরো যতনে
উহারি সঙ্গে সুপ্রসঙ্গে দুঃখ আপনি পালাবে।
মনের প্রসঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে রেখ
তোমার কামের দুর্মতি বিনাশিবে রে ॥
অলি কমলে যেন পিরিতি জাগে রে
যেমতি তোমার পিরিতি রাখিবে।
ওরে চরণ সরোজ প্রাণ মধুকর মকরন্দ পানে রবে রে ॥
তন্ত্রে মন্ত্রে হবার কিছু নয়
প্রাণের পিপাসা যদি না থাকয়
অন্তিমকালে যন্ত্রণা বাড়িবে
রমণের গতি কী হবে রে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৫৫)

৯

শুধু গৌরার প্রেমে মজে গো কুল কলঙ্কের ভয় রাখি না;
গৌরার প্রেমের এত জ্বালা গৃহে যাইতে মন চলে না ॥
কলঙ্ক অলঙ্কার কইলাম মনের কথা বলব গো না,
শ্যাম কলঙ্কিনী নামটি আমার জগতে রহি ঘোষণা ॥
পিপাসী চাতকীর মতো পিপাসায় প্রাণ বাঁচে না,
কী করিলে কী হইবে কী উপায় বল না।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গুরু ভজন হইল না,
কামরসে মন মগ্ন সদায় প্রেমরসে মন মজল না ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৪৯)

১০

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ নদীয়ায় উদয়
পরম দয়ালু সবল হৃদয় ॥
পূর্ব অনুরাগে ভাবের উদয়
রাধা প্রেমধারা দুনয়নে বয় ॥
হরি হরি বলে ধরণী লুটায়
আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায় ॥
প্রেমের মহিমা সীমা নাহি হয়
দণ্ড কমণ্ডলু কৌপীন পৈরয় ॥
নাহি নামে রুচি গুরু পদাশ্রয়
শ্রীরাধারমণ বড় দুরাশয় ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৫০)

১১

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ব্রজেন্দ্র নন্দন
পাপীতাপী নিস্তারিতে অবনীতে নৈদে আগমন।
নিজ পুরাণের মর্ম কলিযুগ ধর্ম হরিনাম সংকীর্তন
আচরিয়া ভাবে বিলাইতে জীবে অনর্পিত প্রেমধন।
অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য জীবেন ভাগ্যে শ্রীশচীনন্দন
গৌরা প্রেমধনী দাতা শিরোমণি প্রেমরস নিমগন।
ভক্তি জ্যোৎস্না বেশে পাপ তম নাশে পতিতপাষণ্ডীমোচন
ধন্য কলিযুগ ধন্য যার উদয় গুরু পতিতপাবন
হইয়ে সদয় দেও পদাশ্রয় না জান সাধনভজন
তুমি দয়াময় আমি দুরাশয় কর কৃপা বিতরণ
শ্রীরাধারমণে কাঙ্গাল জানিয়ে দেহ শ্রীচরণ ॥

(বাগচী ২০১৩ : ১৫০)

১২

আমারে কী কর দয়া অধম জানিয়া বা গৌর, প্রাণনাথ কালিয়া ॥
আগে বল আপনারি পাছে প্রাণটি নেও হরি,
এখন কেন প্রাণে মার তোমার মনে ঐ কি ছিল ?

পিরীত ত্যজিয়া গেলায় কি দোষ পাইয়া, বা গৌর।
আগে যদি জান্‌তাম বা গৌর যাইবায় ছাড়িয়া,
মাথার কেশ দুভাগ কইরে চরণে চন্দনা দিয়ে,
চান্দমুখ নিরখিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া বা গৌর।
গোসাঁই রমণচান্দে বলে মনেতে ভাবিয়া,
আমার সনে মাতিও না সই আমার মন হইয়াছে দেওয়ানা ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১১৭)

১৩

ভজ ওরে মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ রায়
অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর দাস
শ্রীনিবাস রসময় ॥
মহাপ্রভু মনে যেই রাত্রদিনে
সাজাতে প্রেম বাদল
অনর্পিত ধন করে বিতরণ
জীবে বলয়ে গরল ॥
মানুষ রতন হয় যেই জন
কৃষ্ণপ্রেমে ভেসে যায়
ছাড়ি কর্মজ্ঞান করে গুরুধ্যান
মন বলিয়ে তোমায় ॥
আত্মসুখ ছাড়ি বল হরি হরি
শ্রীরাধারমণে গায় ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৪৬)

১৪

আমি গৌর প্রেমে মজে গো কুলকলঙ্কের ভয় রাখি না
গৌর প্রেমের এতই জ্বালা গৃহে যাইতে মন চলে না ॥
কলঙ্ক অলঙ্কার কইলাম মনের কথা বলবে গো না
শ্যাম কলঙ্কী নামটি আমার জগতে রইল ঘোষণা

পিপাসী চাতকের মত পিপাসায় প্রাণ বাঁচে না
কী করিলে কী হইবে উপায় কিরে বল না
কেন্দে রাধারমণ বলে গুরু ভজন হইল না
কামরসে মগ্ন সদায় প্রেমরসে মন মজে না ।

(বাগচী, ২০১৩ : ১১৭)

৩.১.৫ গোষ্ঠ বিষয়ক ভাববাণী

বাউল ও বৈষ্ণব সাধনায় গোষ্ঠ গান গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাধকেরা গোষ্ঠ গান দিয়েই দিন শুরু করে থাকে। সূর্য উদিত হওয়ার আগে সুবেহ সাদিকের সময়কে বলা হয় গোষ্ঠ বেলা। তখন সাধুরা সফেদ পোষাক পরিধান করে গোষ্ঠ গান করে। সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণের কর্মের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত রাখতেই এই গীত রচনা করে থাকেন। তাই বৈষ্ণব সাধকগণ কৃষ্ণের সমগ্র জীবনকে সাধনার অনুসঙ্গ হিসেবে ধারণ করেন এবং তারা কৃষ্ণের এই গো চারণকে বলে গোষ্ঠকর্ম। দাদা বলাইয়ের সাথে গোকুলে গরুচরাতেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। গোকুলে গোষ্ঠ যিনি রক্ষা করেন তিনি গোপাল। এ জন্য রাখাল বালকেরা চায় স্বয়ং কৃষ্ণ তাদের সঙ্গে থাকুক; তাতে করে কোন বিপদ হলে তারা নিরাপদ থাকবে।

গোষ্ঠ গানের মাধ্যমে সাধক ও সাধনার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। গোপলি যশোদা যে কিনা ঈশ্বর-জীবের মধ্যে পাল্য-পালক সম্বন্ধ তৈরি করে। গোষ্ঠ গানে গোপালের বিশেষ পর্বে বাৎসল্য রস আর সখ্যরস মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। বৈষ্ণব দর্শনের পঞ্চরসের দুইটি রস যথাক্রমে শান্ত এবং দাস্য এগুলো অতিক্রান্ত হয়ে ভক্ত সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য এই তিনটি রসের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে ঈশ্বরের আরো নিকটবর্তী হয়ে থাকে। যার ফলে ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে সখারূপে, মাতৃরূপে, প্রেমিক রূপে উপলব্ধি করতে পারে। স্বয়ং ঈশ্বর ভক্তকে আরো কাছে পাওয়ার নেশায় মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপে ধরা দেয়। গোষ্ঠগান বিষয়ে গবেষক জাহিদুল কবির শরবিন্দু ভট্টাচার্যের কথা উল্লেখ করেন এভাবে :

> এটি গ্রামীণ কৃষক সমাজের অতি অন্তরঙ্গ উৎসবগুলোর একটি। এ উৎসব সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে এবং সর্বক্ষণই পরিবেশিত হতে থাকে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য ও গীত। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বন্দনা অংশ। একে 'উদয় বন্দনা' বলা হয়ে থাকে। এ অংশ মূলে গায়েন প্রথমে দু-এক টি সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করেন এবং পরে বাংলায় কৃষ্ণ রাধা, গৌরাঙ্গ, নিত্যনন্দ বন্দনা করা হয়। ঐ সময়ে টুং টাং করে বেহালা ও সারিন্দা বাদক সুর ....করেন এবং খোল ও এসরাজ বাদন সেই সুরে স্কেল ধরতে মনোযোগ দেন। যন্ত্রের সুর পরিবেশনের উপযোগী হয়ে উঠলে মূল গায়েন বন্দনা শেষ করে একটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক

সংগীত পরিবেশন করেন। বাওলা ও ধামাইল গানের মিশ্রণজাত সুরে এই সংগীত পরিবেশনের পরপরই শুরু হয়ে যায় মূল অনুষ্ঠান। সংগীত এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এ পর্যায়ে কৃষ্ণের গো-চরণ বিষয়ে গীতিনাট্যের সূত্রপাত ঘটে। অবশ্য এর আগে গৌরচন্দ্রিকা এবং কৃষ্ণের ননি চুরির কাহিনিও কোন কোন পালাকার উপস্থাপনা করে থাকেন। (কবীর, ২০২২ : ৯৪-৯৫)

বৈষ্ণব গানে এবং বাউল গানের গোষ্ঠলীলা কিছুটা ভিন্ন। এবং এটির অঞ্চলভেদে পরিবেশন রীতি, বাদ্যযন্ত্রেরও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাউলের গোষ্ঠ গানে তিনটি বিভাগ থাকে।

১. পূর্ব গোষ্ঠ

২. মধ্য গোষ্ঠ ও

৩. উত্তর গোষ্ঠ

বাউলেরা সাধারণত ভোর পার হওয়ার পরে আর গোষ্ঠ গান করে না। ভোরের আলো ভেদ করে সূর্যের আলো যখন পৃথিবীকে আলোকিত করে তখন বাউলেরা আর গোষ্ঠ গান করেন না। ভোরের প্রথম যে গোষ্ঠ গান করে তাকে বলা হয় পূর্বগোষ্ঠ। এই পূর্বগোষ্ঠে থাকে আহ্বানসূচক গান। দ্বিতীয় ভাগে মধ্যগোষ্ঠে থাকে কৃষ্ণের অন্তর্ধানরহস্যের গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ক গান। এবং সর্বশেষ উত্তর গোষ্ঠ গানে থাকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নিখোঁজ হওয়ার পর আক্ষেপসূচক গান।

পূর্বগোষ্ঠ গানের উদাহরণ :

ওমা যশোদে দে তোর গোপালকে গোষ্ঠে লয়ে যাই
সব রাখাল মা বনে গেছে বাকি কেবল বলাই কানাই ॥
ওরে ভাই নন্দের কানু বাথানেতে বাঁধা ধেনু
গগনে উদিত ভানু আর তো নিশি নাই
কেন মায়ের কোলে রইলি ঘুমে
এখনো কি তোর ঘুম ভাঙ্গে নাই ॥
গোচারণে গোষ্ঠের পথে, কষ্ট নাই মা গোষ্ঠে যেতে
আমরা সবাই কাঁধে করে গোপালকে লয়ে যাই।
তোর গোপাল ক্ষুধা পেলে দণ্ডে দণ্ডে ননী খাওয়াই ॥
আমরা যত রাখাল গণে ঘুরি সবে বনে বনে
সারা দিনে জনে জনে যত ফল পাই

লালন কয় রাখালে ফল খেয়ে মিঠে হলে

গোপালকে খাওয়ায় ॥

(মাননান, ২০০৭ : ৭৪-৭৫)

মধ্যগোষ্ঠ গানের উদাহরণ :

বনে এসে হারালাম কানাই

কী বলবে মা যশোদায় ॥

খেললাম সবে লুকোলুকি

আবার হলো দেখা দেখি

কানাই গেলো কোন মুল্লুকি

খুঁজে নাহি পাই ॥

ছিলাম বলে নেবো খুঁজি

লুকাবে কোন বন মাঝে

বলাই দাদা বলি বুঝে

দেখা দে না ভাই ॥

সুবল বলে প' লো মনে

বলেছিল মা একদিনে

কানাই যাবে গুপ্ত বৃন্দাবনে

গেলো বুঝি তাই ॥

খুঁজে খুঁজে হলাম সারা

কোথায় গেলি মনোচোরা

আর বুঝি দিবি না ধরা

লালন বলে কী হাল হায় ॥

(মাননান, ২০০৭ : ৭৫)

উত্তরগোষ্ঠ গানের উদাহরণ :

সকালে যাই ধেনু লয়ে

এ বনে ভয় আছে ভাই

মা আমায় দিয়েছেন কয়ে ॥

আজকে খেলা এই অবধি
ফিরাবে ভাই ধেনু আদি
প্রাণে বেঁচে থাকি যদি
কাল আবার খেলবো আসিয়ে
বলেছিলো মা যশোদে
কানাইকে দিলাম বলাইয়'র হাতে
তাতে ভালো মন্দ হলে
লালন বলে কী বলব মাকে যেয়ে ॥

(মাননান, ২০০৭ : ৭৫-৭৬)

বৈষ্ণব কবি রাধারমণের রচনা গোষ্ঠ গানের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। রাধারমণের গান মূল গোষ্ঠ গান পদাবলির ন্যায় দ্যায্যরস উপকরণে পরিবেশিত না হলেও এর বিষয়বস্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল বিষয় থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়। গোষ্ঠগানের সাংগীতিক গুণাবলির দিক থেকে বিচার করলে রাধারমণের গোষ্ঠ গানের সাংগীতিক মূল্যের কোন কমতি নেই। নিম্নে রাধারমণ রচিত গোষ্ঠ গান দেওয়া হলো :

১

পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে গো যতনে রাখিও তারে
পিরিতি পিঞ্জিরার পাখি ছুটলে কি আর মিলে,
ফুল চন্দন তুলসী দিয়া রাখিও যতনে।
রমণচান্দে বলে সখা কি ভাবছ মনেতে,
কর্মদোষে মজল্না মন শ্যামবন্ধের পিরিতে।

(শর্মা, ২০১৯ : ১৬৯)

২

প্রেম বিলাতে যাবে যদি মন, রাধারাণীর কল গাড়িতে।
তূরিতে কর আরোহণ।
শমরনর ভয় রবে নারে পাবে নিত্যধন ॥
উত্তম বসন পরে চৌষট্টি অলঙ্কারে, আনন্দ দূরবীন
শিরে সাজিয়ে করবে গমন।
মন তুই কাম গঞ্জের প্রেম দুয়ারে পাবিরে স্টেশন।

রূপ কেরানি বসে তাতে, দিচ্ছে টিকেট লোকের হাতে।
কাটা কামানির ওজন
মন তুই পাকা একমন না হইলে যাইতে নিবারণ।
ভেবে রাধারমণ বলে, মদন সিং কনস্টবলে
গ্রেপ্তার করতে চায় এখন।
প্রভু রঘুনাথ হাকিম না হলে, কে করবে বারণ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৭০)

৩

বিদায় হইলাম গো রাই কমলিনী তোমার চরণে
আমি শুইলে স্বপনে দেখি গো রাধে দেখি না তুমি বিনে ॥
রাধে গো
গোষ্ঠ আচরণে যাই, রাই বইলে বাঁশরী বাজাই
বাঁশির স্বরে ডাকিগো তোমারে
বাইর হও বাইর হও রাধে দেখি তোমায় পরাণ ভরে।
রাধি গো
ছাড়িয়া যাই জনমের মত দিয়া যাই দানপত্র গো
চূড়া বাঁশি দিয়া যাই তোমারে রাধে
ঐ রাঙ্গা চরণে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৬৫-৬৬)

৪

কই গো মাধবীলতা বল গো ললিতে
বন্ধু কোন বনে চড়াইয়াছে ধেনুগণ গো ললিতে ॥
কদমতলে করছে আলাপ পদের পরে পদ থইয়া।
কদম্বে হেলান দিয়া বন্দে বাজায় বাঁশি
রাধারে বিনাইয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে ভাবিয়া যাইও আপন মনে গো
বন্ধু আসিবা পরে জলের লাগিয়া গো ললিতে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৭১)

৫

চল রে সুবল রাই দরশনে।
ব্রজের রাখাল সনে ধেনু চরাও বনে বনে
আপন কাটরায় মজে যাও রাই গোচারণে ॥
যে দুঃখ দিয়াছ সুবল আয়ন ঘোষের স্থানে
বিন্দাবনে যে যন্ত্রণা শ্রীরাধার কারণে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে চিন্তি মনে মনে
কেমনে বাঁচে প্রাণবন্ধুয়া বিহনে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ২৬৯)

৬

আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একা
রে সুবল সখা—
আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একা ॥
সুবলরে—গহিন বনে গোচারণে কেতকী ফুল দর্শনেরে
এরূপ সেরূপ আমার হয়েছে উজ্জ্বল রে।
সুবলরে—রাধা তন্ত্র রাধা যন্ত্র রাধা আমার মূল মন্ত্র
রাধা আমার সাধন গুরুরে।
সুবলরে ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলেরে
আমার মনের আগুন জলে দিলে নিবে না রে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪২৫)

৩.১.৬ পূর্বরাগ বিষয়ক ভাববাণী

বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণপদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মহাত্ম্যের গুণ বর্ণনা করেন। পূর্বরাগ হলো রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়। পূর্বরাগে প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ের মনেই জাগ্রত হয়। তবে বৈষ্ণব সাধন গীতে শ্রীমতি রাধার পূর্বরাগের কথাই বেশি গুরুত্ব পায়। তাই পূর্বরাগে রাধা যে গুরুত্ব পায় সেই অনুপাতে শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব পায়নি। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ অবলম্বনে অনেক বেশি পদ রচিত হয়। কৃষ্ণ নাম শ্রবণে ও শ্রীকৃষ্ণ রূপদর্শনে রাধার পূর্বরাগ জাগ্রত হয়। পূর্বরাগের ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার

দর্শন সাক্ষাতে, ছবির মাধ্যমে বা স্বপনের মধ্যে ঘটতে পারে। এছাড়াও তারা সখি, দূত বা অন্য কারো মাধ্যমে জানতে পারে। আবার নাম শুনে, বংশিধ্বনির প্রভাবে বা অন্যকোন গুণের কারণেও অনুরক্তি জন্মাতে পারে। যার ফলে নায়ক-নায়িকারা পরস্পরকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। প্রেমের এই ক্যামেস্ট্রির জন্য নায়ক ও নায়িকার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার নানা অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ করা যায়। যে প্রেম কল্পনায় দর্শনে নয়, যে প্রেমে নাম শুনলে বা প্রিয় পাত্রের লক্ষণ কারো মাঝে প্রকাশ পেলে প্রেমে পাগল হয়ে ওঠে সে প্রেমই পূর্বরাগ। এই পূর্বরাগের সময় নায়ক ও নায়িকার মাঝে দশটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য, তানব, জড়িমা, বৈরাগ্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

বৈষ্ণব কবিরা অনুরাগ পর্বের চেয়ে পূর্বরাগ পর্যায়ের পদ রচনায় আগ্রহ বেশি দেখিয়েছেন। প্রাক চৈতন্য যুগ এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বেশিরভাগ কবি পূর্বরাগ বিষয়ক পদ রচনা করলে এই সময়ের কবিদের মধ্যে পূর্বরাগ পদ রচনায় বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস এবং জ্ঞানদাস। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্বরাগ পদ রচয়িতা চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদ

চণ্ডীদাস ছিলেন প্রাকচৈতন্যযুগের কবি। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলিতে যে ভাব মহিমা আরোপিত হয়েছিল তার পূর্বেই তিনি তাঁর পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক বাস্তব নরনারীর সম্পর্কের মতোই বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী, কৃষ্ণের প্রেম রাধারাণীকে ঘরে থাকতে দেয় না। কৃষ্ণের প্রতি রাধার আকর্ষণ এতো বেশি তীব্র যে রাধা প্রকৃতি জগতের মধ্যেও রাধা কৃষ্ণের সন্ধান করে।

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকরে একলে
না শুনে কাহারও কথা একলে
সদাই বৈয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন তারা ॥

(চণ্ডীদাস)

জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদ

প্রাকচৈতন্য যুগের কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসের রাধা ভাবে গভীরতা সবদিক থেকে অনন্য। বিদ্যাপতির রাধা মানবীয় বৈশিষ্ট্যে অনেক বেশি উজ্জ্বল। অর্থাৎ বিদ্যাপতির পূর্বরাগ পদে রাধার গুণাবলিতে মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর জ্ঞানদাসের পূর্বরাগ পদে রাধা রূপ চেতনায় বিভোর। কৃষ্ণের অসামান্য রূপ সৌন্দর্য দেখে রাধার অন্তরে পূর্বরাগের যে সূচনা তা জ্ঞানদাসের কাব্যে বিচিত্র। কেবল রূপের প্রতি অনুরাগ নয় সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের আকর্ষণও তীব্র। কৃষ্ণের রূপ এবং হাসিতে যে মধু ঝরে তার মধ্যেই রাধা অমৃতের সন্ধান পায়।

রূপ দেখি হিয়ার আরতি না টুটে
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে ॥
(জ্ঞানদাস)

বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদ

বিদ্যাপতির পূর্বরাগ পদ মানবীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। এখানে কৃষ্ণ ও রাধা পরস্পর একাত্ম হতে চেয়েছেন। বিদ্যাপতির রাধার কাছে কৃষ্ণ এতো বেশি প্রিয় যে, রাধার সকল প্রিয় বস্তুর মধ্যেই কৃষ্ণ বিদ্যমান। এখানে কৃষ্ণ রাধার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন এবং মুখের তাম্বুল। তবে বিদ্যাপতির পূর্বরাগ পদে রাধার চাতুর্যের প্রকাশ পেয়েছে। গুরুজনের উপস্থিতি থাকার কারণে যখন কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারছে না তখন গুরুজনদের পশ্চাতে রাধা অগ্রসর হয়ে গেছে।

সখি হে, অপরূপ চাতুরী গৌরী
সবজনে তেজি আগুসরি সঞ্চরী
আর বদনে তাঁহি কেরি ॥
(বিদ্যাপতি)

গোবিন্দদাসের পূর্বরাগের পদ

চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাসের মতো গোবিন্দদাসও রাধার পূর্বরাগ পদ রচনায় কৃষ্ণের রূপজ আকর্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। গোবিন্দদাস রাধার পূর্বরাগ বিষয়ক পদের পাশাপাশি কৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ে পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক পদ :

যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি
তাহা তাহা নিকষয়ে চকময় হোতি ॥
(গোবিন্দদাস)

গোবিন্দদাসের অন্য একটি পদে চিত্রদর্শনজনিত পূর্বরাগ রয়েছে। সখি বিশাখা কৃষ্ণের যা বর্ণনা দিচ্ছিল তা রাধারই পূর্বরাগ :

কানড় কুসুম জিনি দলিত অজ্জন গো
নব জলধর জিনি ছটা
কাটিতে কিঙ্গিনী পীতা ম্বর পরিধান গো
ডালে শোভে চন্দনের ফোঁটা ॥
(গোবিন্দদাস)

লোককবি বৈষ্ণব সাধন রাধারমণ দত্তের গানেও উৎকৃষ্টমানে পূর্বরাগ পদের আধিক্য রয়েছে। যেখানে আত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের বিষয় ফুটে উঠেছে। রাধারমণ নিজেকে রাধারূপে কল্পনা করে সাধনায় অতি উচ্চমার্গে পৌঁছেছেন। গোবিন্দদাসের মতো রাধারমণ সাধন ভজনে রাধা রূপের প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও কৃষ্ণ মনের নানা প্রশ্নও তার মনে জাগ্রত হয়েছে। রাধারূপে রাধারমণ যতটা কেঁদেছেন কৃষ্ণ রূপের জন্যও তার আক্ষেপ ছিল প্রবল। রাধারমণের পূর্বরাগ পদের গান বিশ্লেষণ করলেই তার প্রমাণ মিলবে।

১

অবলার কুলমান সইগো কেমনে রাখি ॥
সময় না জানিয়া বাঁশি বাজায় কালশশী।
এগো নামকুল সবই দিলাম আর কি আছে বাকি ॥
যখন শ্যাম বাজায় বাঁশি তখন আমি রহি বসি
শাশুড়ি ননদি ঘরে বাইর হইতে না পারি ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
বিধি যদি পাখা দিত উইড়ে যাইতাম আমি ॥
(শর্মা, ২০১৯ : ১৮৯)

২

অবলার মনেরি আনল গো সখী
নিবাইলে নিবে নারে ॥

প্রেমশেল পশিলে গো বুক বাইরে আসে না
যতই টানি ততই বিন্ধে কাটা খসাইলে খসে নারে ॥
শাশুড়ি ননদি গো বৈরি সদায় দেয় গঞ্জনা
যারে দেখবার সাধ ছিল গো সখী
তারে দেখতে মানা রে।
গুসাই রাধারমণ গো বলেন পিরিতের নিশান ॥
যার লাগি দুষি হইলাম আমি তারে তো পাইলাম না ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৮৯)

৩

আমায় আকুল করিল, আমায় পাগল করিল
শ্যাম বাঁকা নয়নে।
নয়ন বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা আর যে অলকারেখা
আর বাঁকা সুরিয়াছে কুন্তল, শ্রবণে কি হেরিলাম
কালশশী কী সন্ধানে বাজার বাঁশি
আমারে করিল পাগল বাঁশির গানে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, কেন আইলে জলে গো
সাধে সাধে হইলে পাগল শ্যামদরশনে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৯১)

৪

আমি উন্মাদিনী হইলাম যার লাগিয়া গো রূপ দেখিয়া
সে জনারে একবার আবার দেখাও গো আনিয়া ॥
নয়নে রাখিয়া নয়ন কলসিতে জল ভরি তখন
আমার কাঙ্খের কলসি গিয়াছে ভাসি প্রেমের ঢেউ লাগিয়া ॥
হেন কালে শ্যাম নগরে বাঁশি বাজায় কদমতলে
এগো মধুর স্বরে বাজায় বাঁশি হাসিয়া হাসিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আনিয়া দেও মোর প্রাণের কলসি জলে ঝাম্প দিয়া।

(শর্মা, ২০১৯ : ১৯৫)

৫

আমি কী করি উপায় গো সখী শ্যামরায় ॥ ধু ॥
বাঁশির সাথে প্রাণনাথে প্রাণ লইয়া যায় ॥ চি ॥
যাক যাক প্রাণসখী কেমনে বন্ধুরে দেখি গো
মনে লয় উড়িয়া যাই পাখা নাহি পাই গো ॥ ১ ॥
যে বনে বন্ধুয়া আছে চল সব যাই তার কাছে
মন গিয়াছে সেই পথে গৃহে থাকা হইল দায় ॥ ২ ॥
যেই সার সেই তার যুগে যুগে অবতার গো
শ্যামের সনে হবে দেখা রাধারমণ গায় গো ॥ ৩ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৯৬)

৬

আয়গো সখী কে কে যাবে কদম্ব তলায়
ডালে বৈসে চিকনকালা মুররি বাজায় ॥ ধু ॥
যে শুনে বাঁশির গান থাকে না তার কুলমান
নাম শুনে বাঁশির দৌড়ে চলে গাছের তলায়।
বন্ধের গলে দিয়ে মালা পড়ে থাক চরণতলা
কত রঙ্গে করে খেলা দেখলে বুঝা যায়।
উপরে গাছের মূল শিকড়ে ধরিয়াছে ফুল
সেই গাছে বন্ধের বাসা আদম পুরায়।
রাধারমণ প্রেমে মরা ধরাধরি নেওগে তোরা
ধরি তোরা ফেলে আসো শ্যামবন্ধের রাঙা পায় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৯৯)

৭

আর জ্বালা দিও না বাঁশি আর জ্বালা দিও না আমারে
জনম দুক্ষিণী রাধা জানি কি জানো না রে ?
কাঁচা বাঁশের বাঁশিরে বাঁশি করুল রসের আগা
কেমনে জানিয়াছ বাঁশি আমর নামটি রাধা।
বসনে বদন ঢাকা কতই দুঃখ মনে

শিংরা ফলের কাটার মতো বিন্দিল পরানে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গো মনেতে ভাবিয়া
এগো সারা জনম গেল আমার কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২০১)

৮

ও কোন বনে গো কেন বনে মুররী ধ্বনি শোনা যায়
কোন বনে বাজে বাঁশি ত্বরা করে জেনে আয়।
দুতী যেয়ে করগো মানা অসময়ে সে যেন বাঁশি বাজায় না
তার বাঁশির সুরে বিন্দাবনে কুলবধূর কুল যে যায়।
কোন গুণের গুণী আইল ধরতে গেলে ধরা না যায়
ধরতে পারলে সাপটি ধরি ভাস্‌বে প্রেম যমুনায়।
সব সখী চলে আয় দরশনের সময় যে যায়
কদমডালে বাজায় বাঁশি গোসাই রাধারমণ গায়।

(শর্মা, ২০১৯ : ২০৩)

৯

ওগো শ্যারূপ নয়নে হেরিয়া
রূপে মন ভুলিয়া রইল গো আমার জলে রূপ দেখিয়া ।
কুখনে জল ভরতে গেলাম কাখে কলস লইয়া।
যমুনার স্রোতে নিল গো আমার কলসি ভাসাইয়া—
হস্ত বাঁকা পদ বাঁকা বাঁকা মুখের হাসি
তা অনে অধিক বাঁকা হস্তের মোহন বাঁশি
কলসি ভরিয়া রাধা থইল কদমতলে
কদম ফুল ঝরিয়া পড়ে কলসি মাঝারে
কদম ফুল বাঁধিয়া রাধা নিরখিয়া চায়
ঠাকুর কৃষ্ণের শ্রীচরণ জলে দেখা যায়
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
কুল গেল কলঙ্ক রইল জগৎ জুড়িয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২০৬)

১০

এগো সই কী দেখিলাম চাইয়া—
ও মন চলে না গৃহে যাইতে প্রাণবন্ধুরে থইয়া।
সুরধুনী তীরে গেলাম কাঙ্খে কলসি লইয়া—
রূপ পানে চাইতে চাইতে কলসি গেল ভাইসা।
সোনার বান্ধা মোহনবাঁশি প্রেমে বান্ধা হিয়া—
নাম ধরে বাজায় বাঁশি তমাল ডালে বইয়া।
ভাইবে রাধারমণ মনেতে ভাবিয়া—
নিভাইল মনের অনল কে দিল জ্বালাইয়া।

(শর্মা, ২০১৯ : ২০৭)

১১

এমন সুন্দর শ্যামল বনবিহারি।
তারে হৃদয় রাখিয়ে সদায় গো হেরি ॥
সকল সখীর সঙ্গে আইলাম জল ভরি
আঁখির ঠারে আমায় বলে মালা দেও প্যারী ॥
কদম ডালে বইসে কালায় বাজায় বাঁশরী
কত যুবত নারীরা মনপ্রাণ নিল গো হরি ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন সহচারী
কালার প্রেমের এত জ্বালা আগে তো না জানি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২০৭)

১২

কারো রমণী জলে যায় প্রাণের সুবল
শ্রীরাধিকাজলে যায় সোনার নূপুর রাঙা পায়
ও তার রুনুঝুনু শব্দ শোনা যায়
শ্রীরাধিকার লম্বাচুল গায়ের উপর নানা ফুল গো
ও তার খোঁপার উপর ভ্রমরায় লুটায়
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
ও তার নীলাম্বরী বাতাসে উড়ায়। (অসমাপ্ত)

(শর্মা, ২০১৯ : ২১৮-২১৯)

১৩

কালায় প্রাণটি নিল বাঁশিটি বাজাইয়া
আমার যে থৈয়া গেল উদাসী বানাইয়া ॥
কে বাজাইয়া যাও রে বাঁশি রাজপথ দিয়া
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম কুলমান ছেদিয়া ॥
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি মধ্যে ছেদা
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশি কলঙ্কিনী রাধা ॥
বাঁশিটি বাজাইয়া বন্ধে থৈল কদমতলে
লিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
নিভিয়াছিল মনের আগুন কে দিল জ্বালাইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২২০)

১৪

কালার পিরিতে সই গো সকল অঙ্গ জ্বলে
শীতল হয় না জলচন্দন দিলে।
হস্তে ঝরি কাখে কলসি লও গো তরা শীঘ্র করি।
প্রাণবন্ধু দেখিবার ছলে কলসি ভাসাইয়া জলে ॥
প্রাণবন্ধু লও গো কুলে প্রাণবন্ধুরে ছাড়মুনা প্রাণ গেলে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে, প্রেম করিও না সখীর সনে
পাড়ার লোকে মোরে মন্দ বলে।

(শর্মা, ২০১৯ : ২২১)

১৫

কী রূপ দেখছনি সজনী সই জলে ॥
এগো নন্দের সুন্দর চিকন কালা থাতে তরুমূলে ॥
সজনী হাতে বাঁশি মাথে চূড়া ময়ূরপুচ্ছ হিলে
যেন মালতীর মালা শ্যাম অঙ্গে দোলে ॥
সজনী কুক্ষেণে জল ভরিতে গেলাম যমুনার কিনারে
এত হাসি হাসি কয় গো কথা মন ভুলাইবার ছলে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো সকলে
আমার সব দুঃখ পাশরিমু শ্যামদরশনে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২২৩)

১৬

কে বাজাইয়া যায় গো সখী, কে বাজাইয়া যায়।
এগো, ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করো—
কি ধন নিত চায় গো ॥
আর কাঞ্চা বাঁশের বাঁশিগুলি, তলোয়ার বাঁশের আগা।
এগো নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশিয়ে, কলঙ্কিনী রাধা গো ॥
আর যেই না ঝাঁড়ের বাঁশিগুলি, ও তোর ঝাঁড়ের লাগাল পাই—
এগো জড়ে-পেড়ে, উগাড়িয়া, সাগরে ভাসাই গো ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে—
বাঁশি কে বাজায়, এগো বাঁশির রব শুনি
বাজায় চিকন কালায় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২২৯)

১৭

কোন বনে বাজে গো বাঁশি আন তারে দেখি।
বনে থাকে ধেনু রাখে রাখলিয়ার মতি ॥
এমন লুকি দিল গো কালায় স্বপনে না দেখি।
যখন কালায় বাজায় বাঁশি তখন আমি রান্ধি বসি ॥
ভিজা কাঠ চুলায় বসে কান্দি মরি।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পিরিতি করিয়া গেল, অন্তরে যে ঝুরি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২৩৪)

১৮

জল আনিতে দেইখে আইলাম গো সখী গৌরবরণ বাঁকা।
এগো কি কুক্ষণে শ্যামের সনে হইল আমার দেখা ॥
হস্তে শ্যামের মোহন বাঁশি গো শিরি মোহনচোরা

এগো কাঁচাসোনা ঝিলমিল ঝিলমিল

তনুখানি মাখা ॥

মনপ্রাণ নিল শ্যাম গো শুধু দেহামাত্র একা

এগো মনভোলানো রূপটি আমার হৃদয় মাঝে আঁকা ॥

উপায় বল ও সজনী গৃহে দায় হইয়াছে থাকা

এগো পাখির মতোন উইড়া যাইতাম থাকত যদি পাখা ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে তরা শুনরে প্রাণের সখা

এগো নিশাকালে শ্যামের সনে হইব তোমার দেখা ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২৩৬)

১৯

তরুমূলে শ্যামরূপ হেরিলাম তরুমূলে।

নবীন মেঘেতে যেন সৌদামিনী জ্বলে ॥

শিরে চূড়া শিখিপাখা কী আচানক যায় গো দেখা

দাঁড়াইল ত্রিভঙ্গ বাঁকা বনমালা গলে ॥

শ্যামরূপের কি মাধুরী ভুবনমোহন হেরি

শ্যামরূপের নাই তুলনা ভুবনমণ্ডলে ॥

শ্যামরূপে নিল আঁখি মন হইয়াছে চাতক পাখি

আমার প্রাণকান্দে থাকি থাকি রাধারমণ বলে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২৪৩)

২০

নবীন নীরদ শ্যাম লাগল নয়নে গো

নিরুপম রূপমাধুরী পীত বসনে।

মনোহর নটবর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে

শিরে শিখিপাখা শোভে বংশীবদনে ॥

নয়নে লাগল রূপ হানল পরানে

পাসরা না যায় রূপ শয়নে স্বপনে।

নয়নে নয়নে দেখা হইল যেদিনে

সে অবধি প্রেমাঙ্কুর শ্রীরাধারমণে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ২৪৯)

৩.১.৭ অনুরাগ বিষয়ক ভাববাণী

ভক্ত এবং আবাধ্যের সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর তাদের হৃদয়ে গভীর প্রেমের সঞ্চার ঘটলে তাকে অনুরাগ বলে। 'অনু' অর্থ পরে আর 'রাগ' অর্থ আকর্ষণ অর্থাৎ অনুরাগ হলো সাক্ষাৎ পরবর্তী প্রেমের তীব্র আকর্ষণ। *উজ্জ্বল নীলমনি* গ্রন্থে অনুরাগ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়—'নায়ক-নায়িকার মাধুর্য বা মধুরিমা মুহুর্মুহু অনুভূত হলে যে মধুরিমাকে আবার অনুভূত করার তীব্র তৃষ্ণাকে অনুরাগ বলে। পূর্বরাগ এবং অনুরাগের মূল পার্থক্য হলো অবস্থাগণ। পূর্বরাগ হলো প্রথম প্রেমাকর্ষণ নায়ক-নায়িকার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পূর্বের অনুরক্তি, আর অনুরাগ হলো তাদের সাক্ষ্য ও পরিচয়ের পরবর্তী সময়ের প্রেম।

অনুরাগ পর্বের পদে ভক্ত আরাধ্যকে প্রতিনিয়ত নতুন রূপে দেখে। নতুন করে ভালোবাসে, নতুনত্ব খোঁজে, যার ফলে নায়ক-নায়িকার হৃদয় আসনে এমন শুভ্রভাবে আসন পেতে বসতে পারে। একই নদী একই পাহাড় বা সমুদ্র দেখে আমাদের যেমন ক্লান্তি আসে না, প্রতিদিনই নব-নব রূপে আমাদের মাঝে ধরা দেয়। ঠিক ঈশ্বরও তেমনই ভক্তের হৃদয়ে প্রতিদিনই নবরূপে দেখা দেয়। অনুরাগ আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যেকার দূরত্বকে কমিয়ে এনে যুগল মিলনে সহায়তা করে। অনুরাগের সীমা পরিসীমা থাকে না, এর পরিধি প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। জাহিদুল কবির তাঁর 'রাধারমণ দত্ত' গ্রন্থে অনুরাগের কয়েকটি লক্ষণ বা চিহ্নের উল্লেখ করেছেন, যেমন :

ক. পরস্পরবশী ভাব,

খ. প্রেম বৈচিত্র্য,

গ. অপ্রাণী বা জড় পদার্থের জন্মলাভের বাসনা,

ঘ. বিরহেও কৃষ্ণ অনুভব বা দুঃখের মধ্যে আনন্দ ভাব। (কবীর, ২০২২ : ১৬৪)

রাধারমণের গানে অনুরাগ পর্বের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কেননা রাধারমণের গানের মধ্যে অনুরাগের বাসনা দিনে দিনে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈষ্ণব সাধনায় ঈশ্বরের নবরূপ সাধককে বার বার পাগল করে তুলেছে। এ অনুরাগের নেই কোন সীমা-পরিসীমা। রাধারমণ তাঁর গানে আরাধ্য স্রষ্টাকে নবরূপে খুঁজে ফিরেছেন জীবনভর।

১

আমার চিত্ত বেয়াকুল গো শ্যামরূপে নিল জাতিকুল
ও আমি এমন রূপ আর দেখছি না সই আমার বন্ধের সমতুল গো ॥
ও সখী স্বপনে দেইখাছি যারে হয় না তাহা ভুল

আমার সোনাবন্ধের মুখের হাসি যেমন ফুটলো গোলাপ ফুল গো ॥
ও সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলে সব হইয়াছে ভুল
আমি খেয়েছি প্রেমের আছাড়, সখী ধইরা আমায় তোল গো ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩১৫)

২

আমার মন করে আকুল, আমার প্রাণ করে আকুল
রূপে আমার নিল জাতিকুল।
আমি গৃহে যাইতে আর পারি না মাথে ধরে তুল ॥
আঁখি ঠারে কয়গো কথা মন করে আকুল
আম ত্রিজগতে আর দেখি না বন্ধের সমতুল।
আমার প্রাণবন্ধুর মুখের হাসি যেমন গোলাপ ফুল
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার হইল ভুল
আমি অন্ধের হাতে মানিক থইয়া
পাইলাম না তার কুল ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩১৫)

৩

আমি পাগলিনী হইলাম যার লাগিয়া গো রূপ দেখিয়া
এগো সে জনারে একেবারে এনে দেখাও না আনিয়া ॥
নয়নে দেখিলাম চাইয়া জলের ঘাটে শ্যাম কালিয়া
সে যে স্থিরে বসি বাজায় বাঁশি হাসিয়া হাসিয়া
হেন কালে শ্যামনাগরে বাঁশি থইয়া আমার ধারে গো
এগো কলসিখানি ভেসে গেল প্রেমের ঢেউ লাগিয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনের আশা রইল মনে গো
রূপ দেখিয়া প্রেমের লাগি কাঁদে আমার হিয়া।

(শর্মা, ২০১৯ : ৩১৭)

৪

আমি শ্যামের প্রেমে দগ্ধ হইয়াছি
আমি শ্যাম চরণের রুনুঝুনু শব্দ শুইনাছি।
অষ্টসখী লইয়া সঙ্গে, জল আনিতে গেলাম রঙ্গে
আমি জল লইয়া গৃহে আইসাছি ॥
শাশুড়ি ননদি জাল, কাল ননদি বেড়াজাল
আমি ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলতাছি ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, শুনগো তোমরা সকলে
আমি নূপুরেরও শব্দ শুইনাছি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩১৭)

৫

আমার মন মজিল গো সই কাল চরণে
আর নীলাম্বরী পীতধড়া হাতে বাঁশি মাথে চূড়া
এগো চূড়ার উপর ময়ূর পাখা ঝলকে ॥
আমি থাকি রূপবাণে সে থাকে তার অন্য ভানে
ও নিষেধ মানে না মানে গো আমার পরানে
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো রাধা বিনোদিনী
এগো আসবে কালা দিবে জ্বালা আমায় এখনি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩১৬)

৬

আমার বন্ধু দয়াময়, তোমারে দেখিবার মনে লয়
আরে তোমারে না দেখলে রাধার জীবন কেমনে রয় ॥
কদম ডালে বইসারে বন্ধু রঙ্গে ঢঙ্গে আগা
শিশুকালে প্রেম শিখাইয়া যৌবনকালে দাগা ॥
তমাল ডালে বইসারে বন্ধু বাজাও রঙ্গের বাঁশি
সুর শুনিয়া রাধার মন হইল উদাসী
ভাইবে রাধারমণ বলে মনের কথা কয়
কৃষ্ণ প্রেমে রাধার মন প্রেমানলে দয় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩১৬)

৭

আমার শ্যাম জানি কই রইলো গো শ্যামরূপে মনপ্রাণ নিল
আমর মন নিল প্রাণ নিল বন্দে নিল কোন সন্ধানে
রূপ পানে চাইতে চাইতে রূপ নেহারিল
এগো রূপ সাগরের মধ্যে বন্দে আমায় ডুবাই মারল।
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনল জ্বলিয়া উঠিল
এগো শ্যাম জল আইনা নিভাও অনল
আমার প্রাণ গেল প্রাণ গেল।
ভাইবে রাধারমণ বলে কী হইল কী হইল
বিজলি চটকের মতো ঐ রূপে নয়ন নিল ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩১৬)

৮

তোমরা দেখছনি সজনী সই জলে
নন্দের সুন্দর চিকন কালা শ্যাম তরুমূলে ॥
সজনী হাতে বাঁশি মাথে চূড়া ময়ূর পাখা হিলে
লবঙ্গ ফুলেরই মালা শ্যামের গলে ঝুলে ॥
সজনী আঁখি ধারে শ্যামনগরে বসিয়া নিরলে
হাসি হাসি কয় কথা মন ভুলাবার ছলে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো সকলে
সকল দুঃখ যাইবে দূরে বন্ধুরে দেখিলে।

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২২)

৯

ডাকিও নারে শ্যামের বাঁশি জয় রাধা বলিয়া
অয়রে শ্যামচান্দের বাঁশি কই বিনয় করিয়া ॥
পুরুষ ভ্রমরা জাতি কঠিন তারও হিয়া

নারী তো সরল গো জাতি উঠে রইয়া রইয়া।
একঘেরে শুইয়া থাকি নিশি গত হইয়া
শুইলে স্বপন গো দেখি হৃদয় বন্ধুয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
গোপনে করছিলাম পিরিত দিলায় প্রকাশিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২২)

১০

দেইখে আইলাম শ্যামকালা গো সজনী
জলের ঘাটে কদমতলে মধুর রূপখানি
শ্যামের মাথায় মোহন চূড়া গলায় বনমালা
মোহন বাঁশি হস্তে লইয়া দাঁড়ায় কদমতলা ॥
শ্যামের পরণে শোভিয়াছে নীলাম্বরী শাড়ি
শ্যামের পদেতে শোভিয়াছে পঞ্চ কাঠিখাড়ি ॥
ঝুনুর ঝুনুর বাজে খাড়ি মধুর ধ্বনি শুনি
গোসাই রমণচান্দে বলে জলে যাও গো ধনি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২৩)

১১

প্রথম যৌবন কালে কে বা না পিরিতি গো করে
সেই পিরিতি নিত্যি গঙ্গার জল গো প্রাণ সই।
যখন আমি ডাকি বন্ধু বন্ধু পার কইরা দাও ভবসিন্ধু
বন্ধের মনে ডুবাইবার বাসনা ॥
এখন কলসি বান্দিয়া গলে ঝাঁপ দিব যমুনার জলে
কলসি ভাসাইয়া নিব স্রোতে ॥
যদি বন্ধু আপন হইত স্রোতের কলসি আনিয়া দিত
পরান বন্ধে রইসা রঙ্গ চায় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২৫)

১২

প্রাণবন্ধু দাসীরে ফিরিয়া চাইও
অবলা রাধারে বন্ধু মনেতে ভাবিও।
নিতি নিত চুপে আইসা যাওয়া কোন রূপেরে
ওগো ননদির ডরে বন্ধু আমায় না ছাড়িও।
মুই যাইমু যমুনার জলে, ও বন্ধু তুমি যাইও কোন ছলেরে
এগো কদমডালে বসিয়া বন্ধু বাঁশিটি বাজাইও ।
তুমি আমার প্রাণপ্রিয় আমায় শান্ত কর দেখা দিয়ারে
আমার বিষাদ সংকটের কালে যুগল চরণ দিয়ো গো।
দীনহীন কাঙাল আমি ঠেকিয়া রইমু মায়াজালে রে
ওগো শ্রীরাধারমণে বলে দুঃখ দিলে দুঃখ সইও ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২৫)

১৩

পিরিতি বিষম জ্বালা সয়না আমার গায়
কূল নিল গো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায় ॥
ঘরে বাইরে থাকে বন্ধু ঐ পিরিতের দায়
কালা তো সামান্য নয় রাধার মন ভুলায়
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ললিতায়
কূল নিলগো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২৪)

১৪

নাগর জিজ্ঞাসি তোমারে
কহ তোমার মনের কথা ভালোবাসো কারে।
মনে বড় বাঞ্ছা হয় তাহা শুনিবারে
না জানি কী ধন দিয়া ভুলাইয়া তোমারে ॥
প্রাণপ্রেয়সী রাখি তুমি আইলাম কেমন করে

তোমারে না দেখিয়া যদি সেই রমণী মরে।
ধর্মের দোহাই দিয়া তোমায় বলি বারে বারে
আমার মতো প্রেমানলে পুড়িও না তারে ॥
সারা নিশি গত করি আসিয়াছে ভোরে
রমণ বলে নিভাইল আগুন জ্বালাইও নারে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২৪)

১৫

বিশখে গো শোন শ্রবণে
ও নিশাতে বন্ধুয়ারে বাঁশিয়ে আমায় ডাকে কেনে।
প্রতি অঙ্গ জরজর মুরলীর টানে
শুনিয়া মুরলীর ধ্বনি মন টানে যাই বলে
ঘরে বাইরে হইলাম দোষী বাঁশির কারণে ॥
কুপিত সাপিনী যেমন গরুড় উৎকারে
রাধারমণ বলে ধনী কিভাবে হইল মনে
শীঘ্র চল ও বিশখে প্রাণবন্ধু দর্শনে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২৭)

১৬

বন্ধু শ্যামরায় মাথে দিয়া বল বল শুনি
বন্ধুরে জন্মে জন্মে দাসী করি রাখবায়নি আমারে ॥
কপালের তিলক তুমিরে বন্ধু বয়নের অঞ্জন
পরানের পরান তুমি ভুবনমোহন বন্ধুরে ॥
অগতির গতি তুমি রে বন্ধু চাঁদমুখে শুনি
অগতি করিল মোরে নীলকান্তমণি বন্ধুরে ॥
আমার বলতে আর কেহ নারে বন্ধু গৌরচান্দে বলে
দয়াময়, শ্রীরাধারমণরে রাইখ ও চরণতলে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২৬)

১৭

রূপে পাগল করল গো শ্যামকালিয়া

রূপে আমায় পাগল করল গো ॥

আর কুক্ষেণে জল ভরতে গো গেলাম

বিজলির চটকে ঐ রূপ নয়নে হেরলাম

ও আমি কলসি ভাসাইয়া জলে চাইয়া রইলাম গো ॥

আর বিধি যদি দিত গো পাখা

উইড়া গিয়া সদয় ঐ রূপ করতাম গো দেখা

ও আমার পাখ না-দি দারুন বিধি বাদী হইল গো

আর ভাইবে রাধারমণ গো বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে গো

ও আমায় অঙ্গুলি হিলাইয়া বন্ধে কী বলিল গো ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩২৯)

১৮

হায়রে বন্ধু নিদারুণ কানাই—

তোমার লাগিয়া আমি যমুনাতে যাই ॥ ধু ॥

দুক্ষের উপরে দুক্ষ দুক্ষের সীমা নাই

কার ঠাঁই কহিতাম দুক্ষ কইবার জাগা নাই ॥

ধন দিলাম মান দিলাম আর তো কিছু নাই—

কী ধন আছে কী ধন দিমু কলঙ্কিনী রাই ॥

আমি তোমার তুমি আমার আর কিছু না চাই—

জনমের মতো যেন দাঁড়াইবার জাগা পাই ॥

ভাবিয়া রাধারমণ বলে বন্ধু এইটি চাই—

জিতে না হইলে দেখা মইলে যেন চরণ পাই ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৩১)

১৯

শ্যাম তোমারে করি মানা মোহন বাঁশি বাজাইও না
সন্ধ্যাকালে বাজিয়ে বাঁশি নারীর মন করলাম উদাসী
তুমি পুরুষ কুলে জন্ম নিয়া নারীর বেদন বুঝ না ॥
রাত্র নিশি দিবাকালে বাঁশি বাজায় রাধা বইলে
আমি ঘুমের ঘোরে চমকি উঠি কান্দি ভিজাই ফুল বিছানা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে রাধা বলে বাঁশি বাজে
আমি পুরুষ হয়ে যেতে পারি নারী হয়ে দেয় যন্ত্রণা ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৩০)

২০

সজনী জলে গিয়াছিলাম একেলা
রাখছে না গো শ্যাম কালা
একাকিনী পাইয়া বন্ধে গো
করিয়াছে রসের খেলা ॥
জল ভরিতে গিয়াছিলাম আমি এক অবলা
এগো পরানে বন্ধু রঙ্গে রসে গো
বন্ধু মনচোরা করে উতলা
রাখেছে নাগো শ্যাম কালা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো অবলা
এগো তোরে নিষেধ করি ও নাগরী
যাইছ না জলে একেলা ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৩১)

৩.১.৮ অভিসার বিষয়ক ভাববাণী

বৈষ্ণব পদাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা মাহাত্ম্য সূচক পদের সমষ্টি। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিষয়কে কতগুলি পর্যায়ে বিভক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে—পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান প্রেমবৈচিত্র্য, আক্ষেপানুরাগ, কলহান্তরিতা প্রভৃতি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ক্রমবিকাশে

এতোগুলো ধারার মধ্যে বৈষ্ণবকবিগণের নিকট সর্বাধিক প্রিয় হলো অভিসার। যেখানে নায়ক এবং নায়িকার মিলনের জন্য পূর্বে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ থাকে এবং যে অভিমুখে যে যাত্রা তাকে বলা হয় অভিসার। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ত্রয়োদশ প্রকার নায়ক-নায়িকার কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমটি হলো অভিসারিকা। বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধার অভিসার বিষয়ক পদ সংখ্যাই বেশি পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অভিসারের স্থান বা জায়গা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অভিসারের পূর্বেই পূর্বরাগ এবং অনুরাগের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সুদৃঢ় ভীত রচিত হয়েছে। যার ফলে অভিসারে এসে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গভীরতা অনেকটাই পাকাপোক্ত। এজন্য এ পর্যায়ে রাধা সর্বাবস্থায় কৃষ্ণের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত রাখে নিজেকে। কারণ রাধা জানে না কখন কোন অবস্থায় মিলনের জন্য কৃষ্ণ ডাকবে। বৈষ্ণব পদাবলিতে নানাপ্রকার অভিসারের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন : জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার ইত্যাদি।

বৈষ্ণবপদ রচয়িতাগণ অভিসারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা এখানে রাধা কৃষ্ণের অভিসারের মাধ্যমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে। তাই অভিসার হলো বৈষ্ণব ভক্তের কাছে পরমাত্মা অন্বেষণ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিসারকে বলেছে 'Devine call of Spritual guest'. এ পর্যায়ে বৈষ্ণবকবিগণ জগৎ অন্বেষণে আপ্লুত হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে অভিসার বিষয়ে পদরচনা করেছেন। বৈষ্ণব কবিদের মাঝে অভিসার বিষয়ক পদ রচনায় প্রেমতত্ত্বের প্রমাণ দিয়েছেন গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাসের পদে রাধার অভিসারে যে চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে তা ইতিহাসে বিরল। গোবিন্দদাসের রচনায় প্রেমের জন্য কোমল, সরল গৃহবধূর মধ্যে সাহসিকতার রূপের প্রকাশ ঘটেছিলো। গোবিন্দদাসের পদে রাধা কৃষ্ণের অভিসারে যাবার জন্য নানারূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। তা গোবিন্দদাসের পদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
সঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতোহি অঙুলি চাপি ॥
(গোবিন্দদাস)

অর্থাৎ রাধাকে কণ্টকাকীর্ণ পথ চলতে যেন কোন কষ্ট পেতে না হয়, পাশাপাশি কর্দমাক্ত পথেও যেন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে তারই প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই পদ থেকে আরো জানা যায় রাধা দুই হাতে চোখ ঢেকে পথ চলার অভ্যাস করেছিল– যেনো অন্ধকারে পথ চলতে কষ্ট না হয়। গোবিন্দদাসের অভিসার বিষয়ক পদে এমন অসাধ্য অসাধারণ চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন। যেখানে রাধার

অভিসারকে প্রবল বৃষ্টি, বজ্রপাত, জগতের কোন ভয়ংকর পরিস্থিতিই আটকাতে পারেনি। সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমাকর্ষণ এবং কৃষ্ণ দর্শনের আশায় সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে অনায়াসে সহ্য করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলির রাধা কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভিসারের মূল্য অপরিসীম। অভিসারের পরিচয়কে অবলম্বন করে রাধা কৃষ্ণের প্রেম পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছে। অন্যদিকে, ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এটি জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের অভিসার। বৈষ্ণব কবি রাধারমণ দত্ত এ পদ রচনায় পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে রাধার আকুতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণভাবে। তাই গোবিন্দদাস পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ অভিসার পদ রচয়িতা রাধারমণ তা বললে অত্যুক্তি হয় না। নিম্নে রাধারমণের অভিসার বিষয়ক ভাববাণী দেওয়া হলো :

১

আমার প্রাণ নিল গো মুরলী বাজাইয়া
শ্যামের বাঁশি ডাকে জয়রাধা বলিয়া ॥
বাঁশিতে ভরিয়া মধু আকুল কৈলায় কুলবধূ
ঘরে জ্বালা ননদিনী বাইরে জ্বালা বাঁশির ধ্বনি
প্রাণ কান্দে সই শ্যামচান্দের লাগিয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
শ্যামে বাজায় বাঁশি নিগুঢ়ে বসিয়া ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৬০)

২

কে যাবে শ্যাম দর্শনেতে অ সজনী ॥
মোহনমধুর স্বরে হইয়াছি গো উন্মাদিনী ॥
ললিতা বিশাখা চল সকল সঙ্গিনী
না গেলে না হবে জলে নইলে যাব একাকিনী ॥
কিবা যাদু জানে বণাশি কি মন্ত্র মোহিনী
মনপ্রাণ সহিতে টানে করিয়াছে উন্মাদিনী ॥
বংশী বটে বংশীধ্বনি মনে অনুমানি
শ্রীরাধারমণের আশা হেরিতে শ্যাম চিন্তামণি ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৮১)

৩

চল গো সব সহচরী জল আনিতে যাই
শীতল গহিন যমুনায় ॥
শীতল কালিন্দী তীরে মোহন মধুর স্বরে
বাজায় বাঁশি শ্যামনগরে তারে হেরে জুড়াইব কায় ॥
বিশাখা পটেতে লেখি নিল মনপ্রাণ আঁখি
দেহমাত্র ছিল বাকি তারে রাখা হইল বিষম দায় ॥
ডলে বৈসে বাজায় বেণু তারে দেখলে শীতল তনু
তারে না দেখিলে প্রাণ যায় ॥
কাখে কুম্ভ হস্তে ঝারি চলিলা ব্রজনাগরী
শ্যাম অনুরাগ ধরি রাধারমণ গায় ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১৮৩)

৩.১.৯ বাসকসজ্জা বিষয়ক ভাববাণী

বাসকসজ্জা অর্থ নায়কের অপেক্ষায় সাজিয়ে রাখা সুসজ্জিত বাসর ঘর। এ পর্যায়ের পদে শ্রীকৃষ্ণের আগমন পরিপূর্ণভাবে না পেয়ে রাধা প্রতিদিনই তার আগমনকে কল্পনায় এঁকে বাসর রচনা করে এবং অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করে। বৈষ্ণব কবি রাধারমণের গানেও রাধাকে এমন বাসর রচনা করে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। কৃষ্ণ না আসার বিরহ-যাতনা কিছুই আটকাতে পারে না রাধাকে। এ পর্যায়ের গানে ভক্ত জনে হয়তো তার আরাধ্য দেবতা আসবে না। কিন্তু এরপরেও তার জন্য অপেক্ষা এবং চলে বাসর সাজানোর নানা আয়োজন। কেবল প্রকৃত প্রেমানুরাগীই পারে এমন অনিশ্চিত মিলন বাসর সাজিয়ে প্রাণনাথের জন্য অপেক্ষা করতে। রাধারমণের গানেও তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়-

১

আইল না শ্যাম প্রাণবন্ধু কালিয়া
বৃথা গেল জীবন আমার নিকুঞ্জ সাজাইয়া ॥
আসবে বলে বংশীধারী আশান্বিত হইয়া
রাখিলাম চুয়াচন্দন কটরায় ভরিয়া ॥
শোন গো তোরা সব সখী এখন উপায় করি কি

কার কুঞ্জে রইল বন্ধু আমায় পাশারিয়া ॥
লবঙ্গ মালতীয় মালা সাজাইলাম গো শ্যাম কালা
এগো দেওনি মালা জলেতে ভাসাইয়া ॥
অমঙ্গলের চিহ্ন যত, ঝরিতেছে অবিরত
শ্রীরাধার নয়ন জলে বসন যায় ভাসিয়া ॥
সইগো তোমরা উপায় বল, সুখের নিশি গত হইল
রাধার বন্ধু রৈল পাশরিয়া ।
ভাইবে রাধারমণ বলে দুক্ষেতে অন্তর জ্বলে
আনল নিবাও গো সখী প্রাণবন্ধু আনিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৭০)

২

আইলায় নারে শ্যাম রসময় রসের বিনোদিয়া
ওরে দুঃখিনী রাই বইসা রইলাম পন্থপানে চাইয়া ॥
গাছের ফল রইয়াছে পাইক্কা খাইলায়না আসিয়া
কাকে নাহি খায়রে ফল ভ্রমরার লাগিয়া ॥
সারা নিশি পুহাইলাম নিজ মন্দিরে বইয়া
আইতায় যদি প্রাণের বন্ধু কইতাম দুঃখের কথা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, মনেতে ভাবিয়া
আইলায় না আইলায় না বন্ধু কী দোষ জানিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৭০-৩৭১)

৩

আসবে শ্যাম কালিয়া, কুঞ্জ সাজাও গিয়া
এগো কেনগো রাই কানতে আছ পাগলিনী হইয়া ॥
জাতি যুথি ফুলমালতী আন গো তুলিয়া
এগো মনোসাধে সাজাও কুঞ্জ সব সখী মিলিয়া ॥
আতর গোলাপ চুয়াচন্দন কটরায় ভরিয়া
এগো আমার বন্ধু আইলে দিও ছিটাইয়া ছিটাইয়া ॥

লং এলাচি জায়ফল জাতি বাটাতে সাজাইয়া
আমার বন্ধু আইলে দিও খিলি মুখেতে তুলিয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
এগো আসবে তোমার প্রাণবন্ধু বাঁশিটি বাজাইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৭২-৩৭৩)

৪

কুঞ্জ সাজাও গিয়া, আসবে শ্যাম কালিয়া
মনোরঙ্গে সাজাও কুঞ্জ সব সখী মিলিয়া।
জবাকুসুম সন্ধ্যামালী আনরে তুলিয়া
মনোসুখে গাঁথো মালা কৃষ্ণ নাম লৈয়া ॥
সব সখী সাজাই কুঞ্জ থাকরে বসিয়া
সুখের নিশি গত হয় আসে না বিনোদিয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে সখী না কান্দ বসিয়া
নিশিভোরে আসবে শ্যাম বাঁশরি বাজাইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৭৪)

৫

প্রাণসইগো আমি রইলাম কার আশায়।
পাষাণে বান্ধিয়াছে হিয়া নিদারুণ কালায় ॥
মনপবন বহে যায় সুখের নিশি পুষাইয়া যায়
কৃষ্ণচূড়া ফুলের মালা বাসি হইয়া যায়।
প্রহরে প্রহরে নিশি পোষাইয়া যায়
কুহু কুহু রবে কোকিলায় গায়
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
ধৈর্য ধর কমলিনী আসবে শ্যাম কালিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৭৭)

৬

নিশি ভোর হইয়া যায়, শ্যামরায় আইলো না কুঞ্জেতে
মনের দুঃখ রইল মনে প্রাণ ললিতে ॥

আর সাজাই সজ্জা পাইলাম লজ্জা বসিয়া রইলাম একা
এগো রজনী প্রভাত হইলে আর নি অইব দেখা ॥
রাধে বলে বৃন্দাদূতী করি কী উপায়
ফুলের মালা দ্বিগুণ জ্বালা ভাসাও যমুনায় ॥
আসব না আর বসব না বন্ধে দিয়াছে ফাঁকি
রমণ বলে আসবার হলে সময় আছে বাকি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৭৭)

৭

প্রাণসখী গো কুঞ্জে কেন রসরাজ আইল না
আইন নাগো চিকন কালা সে বিনে প্রাণ বাঁচে না ॥
আসলে বলে রসরাজ, নিকুঞ্জ কইরাছি সাজ
আমার এ বাসরসজ্জা হইল বাসি সেই জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না ॥
লবঙ্গ ফুলের কলি বিনা সুতে মালা গাঁথি
আমার সেই মালা হইল বাসি শ্যান বিনে দিই কার গলায় ॥
চুয়া চন্দন পিষি কটরায় ভরিয়া রাখি
আমার সেই চন্দন হইল বাসি ছিটাইয়া দিই কার অঙ্গে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
আমার মনে লয় গো প্রাণ ত্যজিতাম বন্ধু আইল না।

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৭৮-৩৭৯)

৮

প্রাণবন্ধু কালিয়া
আইল না গো প্রাণনাথ কী দোষ জানিয়া।
বৃথা গেল আমার স্বপ্ন নিকুঞ্জ সাজাইয়া ॥
আসবে বলে বংশীধারী কত আশা করি
রাখিলাম চুয়াচন্দন কটরায় ভরি ॥
শুন গো ললিতা সখী, ঐ পিরিতি মনে রাখি
প্রাণবন্ধু কোথায় গেল আমায় পাশরিয়া ॥

লবঙ্গ মালতীর মালা, মালা হৈল বড় জ্বালা
ঐ মালা দেও জলেতে ভাসাইয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
রাধারাণীর নয়ন জলে বক্ষ যায় ভাসিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৭৮)

৯

সখা রাত্র হইল ভোর
আইলা মোর প্রাণপ্রিয় নিদয়া-নিষ্ঠুর ॥ ধু ॥
ঘরে ঘরে পরে পরে পদ করিলাম খুর
পন্থপানে চাইতে চাইতে আক্ষি কইলাম ঘোর
এক সখীর হস্তে ধরি আর সখী বলে
ঘোর অন্ধকার রাত্রি পদ নাহি চলে।
গাঁথিয়া মালতীর মালা আহ্লাদে প্রতুল
আইল না প্রাণবন্ধু নিদয়া নিষ্ঠুর।
সর চিনি মাখন ছানা আতর মধুর
কার লাগি আনিলাম করিয়া প্রচুর।
কার লাগি আনিলাম সই গো অইয়া ঘরের চোর
ভাইবে রাধারমণ বলে বন্ধু রৈছেন ব্রজপুর ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৮৩-৩৮৪)

১০

ললিতে কার লাগিয়া আসিলাম আমি কুঞ্জেতে
গাঁথিয়া বনফুলের মালা, মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা ॥
ধর নেও গো মালাখানি ভাসাও নিয়া জলেতে
আমি নারী অভাগিনী, কেউর কাছে না কইতে পারি
এগো আমারে যে কলঙ্কিনী করিল প্রাণনাথে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো তোমরা সকলে
বন্ধু নামের সকল কিছু ভাসাওনি গো জলেতে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৮২)

১১

সুখের নিশি প্রভাত হইয়া যায় গো, আইল না গো বন্ধু শ্যামরায়
আমি মরি মরি বিচ্ছেদের জ্বালায় গো ॥
আসবে বলে রসরাজ নিকুঞ্জ সাজাইলাম গো
আমার সেই শয্যা বাসি হইয়া যায় গো ॥
আসবে বলে চিকন কালা, নানান ফুলে গাঁথি মালা গো
আমার সেই মালা মলিন হইয়া যায় গো ॥
আসবে বলে বনমালী নানান জাতে বান্ধি বেণী গো
আমার সেই বেণী ত্রিভুবন বেড়ায় গো ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে গো
আমি প্রেম করিয়া ঠেকলাম বিষম দায় গো ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৩৮৪-৩৮৫)

৩.১.১০ বিরহ-বিচ্ছেদ বিষয়ক ভাববাণী

বন্ধুহারা পোড়া দেশে যায় না বসত করা
যাগো সখী সখি চলে যা মথুরা ॥

(দাস)

বাংলা লোকগানের সাথে বিরহ ও বিচ্ছেদের এক নিবিড় সম্পর্ক। লোকগানে এ বিরহ প্রচলিত রয়েছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। তবে কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধার বিরহে ভক্তগানের যে শোক প্রকাশ পেয়েছে তা অন্য কোন বিরহের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়নি। বহু যুগ ধরে লোককবিগণ রাধার বিরহে কেঁদেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাওয়ার পর রাধার বিরহ-বিচ্ছেদ-যাতনার শুরু। কৃষ্ণকে মারার কোন কৌশল কাজে না দেওয়ায় দূত হিসেবে বিশ্বস্ত অক্রুর না পাঠিয়ে রাজা কংসের কোন উপায় ছিল না। কারণ কংশ তখন চেয়েছিল যেনতেন প্রকারে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলতে। অত্যাচারী কংশের নির্দেশে মথুরা থেকে রথ সাজিয়ে বৃন্দাবন এলেন অক্রুর। তার আসার আগেই কংশের আমন্ত্রণ পৌঁছে যায় কৃষ্ণের কাছে। এদিকে কৃষ্ণ মনে মনে এ দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। কৃষ্ণ উদগ্রীব হলেও বেঁকে বসে তার সহচর সহচরীরা। খেলার সাথিকে কিছুতেই ছাড়তে নারাজ তারা। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাবে– এ খবর বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পরে বৃন্দাবনে। গোটা বৃন্দাবন মেঘে ছেয়ে যায়, মুহূর্তেই কৃষ্ণের পথ আগলাতে শুধু

রাতের ঘুম নয়, নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছে সবাই। বৃন্দাবন ছেড়ে যাওয়ার আগে কৃষ্ণ চলে যায় রাধার কাছে। নিভৃতে কেটে যায় কয়েকটি মুহূর্ত। কারো মুখে কোন কথা নেই। বুকের ভিতরে ভীষণ তোলপাড় হলেও, রাধার মুখে তার অভিব্যক্তি নেই। নিজের মনকে হয়তোবা শান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন রাধা আপ্রাণভাবে। অন্যদিকে ততটাই শান্ত কৃষ্ণ, মাঝ সমুদ্রের মতো ধীর, স্থির। সেখান থেকে কৃষ্ণ চলে আসার আগে বিরহী রাধা একটা কথাই শুধু কৃষ্ণকে বলেছিলো, তোমাকে কেউ কোন দিন আমার থেকে আলাদা করতে পারবে না। রাধার এই বিচ্ছেদ রাধারমণের গানে ধরা দিয়েছে বহুভাবে। যেমন :

১. বিচ্ছেদ শ্যামরূপ

২. বিচ্ছেদ স্বপন

৩. বিচ্ছেদ সাক্ষাৎকার

৪. বিচ্ছেদ বিদায়

বৈষ্ণব কবি রাধারমণ এই বিরহের মালা গেঁথেছেন আপন মনে। ভক্তির কাছে শ্রীমতি রাধার বিরহ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ বেদনা হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের বেদনা। এ বিরহ-বিচ্ছেদ রাধা কৃষ্ণ থেকে লৌকিক রাধাকৃষ্ণ বা লৌকিক প্রেমিকযুগলকে স্পষ্ট করেছে রাধারমণের গানে।

১

আমার কৃষ্ণ কোথায় পাই গো বল সখী কোন দেশেতে যাই।
কৃষ্ণপ্রেম কাঙালি অইয়া আমি নগরে বেড়াই ॥
আর আপনা জানি প্রাণবন্ধুরে ইদ্‌রে দিলাম ঠাই
এগো ভাঙ্গল আশা দিল দাগা আর প্রেমের কার্য নাই
আর সুচিত্র পালঙ্কের মাঝে শুইয়া নিদ্রা যাই
এগো ঘুমাইলে স্বপন দেখি শ্যাম লইয়া বেড়াই ॥
আর ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধনী রাই
এগো এই আদরের গুণমণি কোথায় গেলে পাই ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪১৮)

২

আমার বন্ধু আনি দেও গো তোরা
আমার কালা আনি দেও গো তোরা—
কই ও শ্যাম-মনোহরা ॥
পোড়া অঙ্গ জুড়াইতে আলাম গো

তোদেরি পাড়া।

ওরে, মারিয়ো না, মারিয়ো না দূতী,

আমি তোদেরি পিরিতের মারা ॥

ভাবিয়ে রাধারমণ বলে,

ভাবিয়া তনু হইল গো সারা।

ওরে, মারিয়ো না, মারিয়ো না বন্ধু

শ্যাম আছে গোপনের ফাড়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪২০)

৩

বৃন্দে গো, শ্যাম দে আনিয়া।

আমি মনপ্রাণ আঁখি জুড়াই কার মুখ দেখিয়া ॥

ও বৃন্দে গো, আসবে বলে গেল বন্ধু আমায় ফাঁকি দিয়া।

এগো কোন নিষ্ঠুরে রাখছে তারে আমায় পাশরিয়া ॥

ও বৃন্দে গো, সাজাইয়া বাসরশয্যা কান্দি আমি ফুলের মালা লইয়া।

এগো চিন্তার বাজার বইছে আমার হৃদয়টা জুড়িয়া ॥

ও বৃন্দে গো, রাধারমণ কয় কাতরে মনেতে ভাবিয়া।

এগো আসবে তোমার মদনমোহন শান্ত করো হিয়া।

(চৌধুরী, ২০২১ : ৫৬)

৪

আমি কারে বা দেখাব মনের দুঃখ গো হৃদয় চিরিয়া।

আমার সোনার অঙ্গ মলিন হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥

পুরুষ জাতি সুখের সাথী নিদয়া নির্মায়া।

তারা জানে না মনের বেদন কঠিন তাদের হিয়া ॥

আমি সাদে সাদে প্রেম করিলাম সরল জানিয়া।

আমারে ছাড়িয়া গেল প্রাণনাথে কী দোষ পাইয়া ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।

আমার জগতে কলঙ্ক রইল পিরিতি করিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪২৩)

৫

আমারে ছাড়িয়া তুমি কেমন সুখে আছ
রে শ্যাম-শুকপাখি—
আর হৃদ্‌পিঞ্জরা শূন্য করি
দিয়া গেলা ফাঁকি ॥
এগো, জনম ভরি পায়ে ধরি—
না করিলায় সঙ্গী;
আর ধন দিলাম প্রাণ দিলাম
কুল দিলাম তোর লাগি।
এগো, তবু বন্ধের মন পাইলাম না
হইলাম সর্বনাশী ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪২২)

৬

আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একারে সুবল সখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা ॥
রাধার কথা মনে পড়লে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম কিন্তু নাইরে পাখা।
রাধা ছাড়া গোচারণে কেমনে থাকি একা
রাধা আমার প্রেমের গুরু মনবাঞ্ছা কল্পতরু
রাধা আমার হস্তের বাঁশি বলে রাধা রাধা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
রাধা ছাড়া গোচারণে ঘুরি একা একা ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪২৫-৪২৬)

৭

আর তো সময় নাই গো সখী আর তো সময় নাই
যেদিন বন্ধু ছাড়া চক্ষে নিদ্রা নাই ॥
সখী গো—মনের মতো দুক্ষ সুখ কইগো তোমার ঠাই
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইও ঈশ্বরের দোহাই।

সখী গো একা কুঞ্জে বইয়া থাকি রজনী পোয়াই—
আইজ আস্‌ব কাইল আস্‌ব বলে মনরে বুঝাই।
সখী গো—অতি সাধের ফুলের মালা জলেতে ভাসাই
অতি সাধের চুয়া-চন্দন কার অঙ্গে লাগাই।
সখী গো—কণ্ঠগত হইল প্রাণ করো ঘরের বার
মইলে নিও তুলসীতলে আমি যেন গঙ্গা পাই।
সখী গো—ভাইবে রাধারমণ বলে কমলিনী রাই
অতি সাধের যুগল মিলন মুই অধমে দেখতে চাই ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪২৬)

৮

ও শ্যামে বিচ্ছেদ লাগাইল
এগো একা কুঞ্জে রাধা থইয়া মধুপুরে গেল ॥
মধুপুরে গিয়া শ্যামে কীনা মধু পাইল
অবলা পাইয়া শ্যামে অনাথ করিল ॥
এসো কংসের দাসী কুব্জারে বামেতে পাইল
জটা হইল মাথার কেশ মলিন রাধার বেশ
হায় কৃষ্ণ হায় কৃষ্ণ বলে পাঞ্জর হইল শেষ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৩২)

৯

ও বিশখা সই গো,
কই গো আমার মন-মোহন কালিয়া।
ও আমায় শান্ত করো—
প্রাণনাথ আনিয়া ॥
আর বাসরশয্যা ত্যাজ্য করি
আমরা বসেছিলাম সব নারী।
আমায় শান্ত করো জলধারা দিয়া ॥
আর চুয়া-চন্দন ফুলের মালা,
রাখিয়াছিলাম যত্ন কইরা ॥

ওয়রে, নতুন যৈবন দিতাম—
আমার সুস্বামী ডাকিয়া ॥
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
আমি ঠেকছি রে কালিয়ার প্রেমে ;
আমায় গেল অনাথ করিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৩২)

১০

কারে দেখাব মনের দুঃখগো আমি বুক চিরিয়া
অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে গইয়া গইয়া ॥
কাল ফলন্ত গাছ উগারিলাম, পুত্রশোকে গালি দিলাম গো
না জানি কোন অভিশাপে এমন গেল হইয়া ॥
ঘর বাঁধলাম প্রাণ বন্ধের সনে কত কথা ছিল মনে গো
ভাঙ্গিল আদরের জোড়া কোন জন বাদী হইয়া
কথা ছিল সঙ্গে নিবো সঙ্গে আমায় নাহি নিলো গো
রাধারমণ ভবে রইল জিতে মরা হইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৩৭)

১১

কোথায় রহিলা বন্ধু শ্যাম চিকন কালা
তোমার লাগিয়া আমার হৃদয়েতে জ্বালা ॥ ধু ॥
নির্দয় নিষ্ঠুর বন্ধু দয়া নাই অন্তরে
তবুও অবলা পাইয়া ভাসাইলায় সায়রে রে।
জনম দুঃখিনী হইয়া মরিয়া ঝুরিয়া
সব দুঃখ পাশরিতাম চান্দ মুখ দেখিয়া রে।
কুলের বৈরী কৈলায়রে বন্ধু কৈলায় কলঙ্কিনী
প্রেম শিখাইয়া প্রাণের বন্ধু বধিলায় পরাণি রে।
হৃদয়ে রইলো রে বন্ধু অপার বেদনা
আমি তোমায় ডাকি বন্ধু তুমি ত ডাক শুনো নারে।

দেশ খেশ সব বাদী সব হইল পর

তোর পিছি ঘুরি ঘুরি জনম গেল মোর রে।

ভাইবে রাধারমণ বলে বন্ধু নয় আপনা

নআলে এমন দুক্ষ কেনে সোনাবন্ধে বুঝে না রে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৪৩)

১২

চলরে সুবল রাই দরশনে।

ব্রজের রাখাল সনে ধেনু চরাও বনে বনে

আপন কটরায় মজে যাও রাই গোচারণে

যে দুক্ষ দিয়াছ সুবল আয়ন ঘোষের স্থানে

বিন্দাবনে যে যন্ত্রণা শ্রীরাধার কারণে।

ভাইবে রাধারমণ বলে চিন্তি মনে মনে

কেমনে বাঁচে প্রাণ বন্ধুয়া বিহনে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৪৩-৪৪৪)

১৩

জীবনে বাসনা ছিল কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিতে

পাইলাম না দেখাই তার জীবন থাকিতে

বন্ধু ও-বন্ধুরে পাইলাম না দেখা তার জীবন থাকিতে

দেখার পিরিতি এতেক জ্বালা মইলে না ফুরায়

যদি তারে পাইতাম বন্ধু আমার জীবন কালে

তবে আমি থাকতাম বসি জীবন সাগর কূলে

ভেইবে রাধারমণ বলে না পাই বসতি

স্বরূপে প্রকাশ দাও দেখাও মূরতি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৪৫)

১৪

চাতক রইলো মেঘের আশে তেমনি মতো রইলাম গো আমি

শ্যামচান্দের আশে গো সই আমি মনের দুক্ষ কার ঠাই কই ॥ ধু ॥

তমাল ডালে বাজাও হে বেণু তমাল ডালে লাগছে গো
রাধার শ্যামপদ রেণু;
তমাল ডালে আমার গলে একত্রে বাঁধিয়া থই।
ভাইবে রাধারমণ বলে পড়িয়া রইলাম শ্যামের যুগল চরণতলে
শ্যামের দেখা পাব বলে আশায় পথ চাইয়া রই ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৪৪)

৩.১.১১ মান ও মানভঞ্জন বিষয়ক ভাববাণী

মান করিয়া রাধা বসেছে বিরলে
ধরা চূড়া বান্ধি কৃষ্ণ গেলা হেন কালে ॥
সমুখে দাঁড়াল কৃষ্ণ পূরিয়া মুরলী
আড় নয়নে গৌরী শ্যাম অশ নেহরি ॥

(নরোত্তম দাস)

রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাবমূলক পদের সমাহার রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলিতে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছে। এই পর্যায়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পর্যায় হলো মান ও মানভঞ্জন। এর মধ্যে মান পর্যায়ে সুতীব্র কৃষ্ণবিরহে কাতর রাধা আক্ষেপোক্তির মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ঝরে পড়েছে। মান পর্যায়ের পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অনুযোগ, অভিযোগ। কৃষ্ণকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে রাধা, কৃষ্ণের জন্য ঘর ছেড়েছে, মাথায় নিয়েছে কলঙ্কের ডালি, অথচ সেই কৃষ্ণকে যেভাবে পেতে চেয়েছিলো রাধা, সেভাবে যখন পায় না তখন রাধার মনে দুঃখের কোন সীমা থাকে না। এই দুঃখই রাধার মান হয়ে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলিতে যে সকল পদে রাধার আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে সেই পদগুলোই মান পর্যায়ের পদ। রাধার এই আক্ষেপ বা মান কৃষ্ণের প্রতি, নিজের প্রতি, কখনো-বা সখি, দূতি মুরলীর প্রতি।

মানভঞ্জন হলো প্রেমের অভিনব এক রসাস্বাদন পদ্ধতি। এরমধ্যে একই সঙ্গে থাকে মিলন ও বিরহের আনন্দ। এ বিষয়ে রূপ গোস্বামী তাঁর *উজ্জ্বল নীলমনি* গ্রন্থে বলেছেন :

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষ্যাধিয়াতিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মিষ্যতে

অর্থাৎ প্রিয়ের কাছে প্রেমের স্বভাবে থাকতে হয়, প্রেমবৈচিত্র্য হেতুভাবে বিরহের আবেশ সৃষ্টি করতে হয়। সুতরাং বোঝা যায় মানভঞ্জন হচ্ছে নায়ক-নায়িকার মিলনে সময় বিচ্ছেদের আশঙ্কা। রাধার দীর্ঘ বিরহ-

যাতনা, কষ্ট ভোগ করার পর মান ভাঙার পরে মিলিত হওয়ার পর আবার কৃষ্ণের চলে যাবার যে বিচ্ছেদ ভাবনার উদয় হয় যে পদে তা হলো মানভঞ্জন। তাই মান ও মানভঞ্জন দুটি পর্যায়ের ক্ষেত্রেই বিরহ প্রসঙ্গ রয়েছে। এজন্য অনেক গবেষকগণ মান ও মানভঞ্জনকে একই সুতোয় গাঁথা মালা হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু এরমধ্যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। মান হলো কৃষ্ণের মিলিত না হতে পারা এবং কৃষ্ণকে নিজের মতো করে না পাওয়ার যে কষ্ট সেই আক্ষেপ। অন্যদিকে মানভঞ্জন হলো মান ভাঙার শেষে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হওয়ার পর আবার যে বিচ্ছিন্ন হতে হবে এই শঙ্কাজনিত আক্ষেপ। সুতরাং গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মান এবং মানভঞ্জন দুটি আলাদা বিষয়। মান ও মানভঞ্জন নিয়ে অনেক বৈষ্ণব কবি পদ রচনা করেছেন। কবি জয়দেব তাঁর *গীতগোবিন্দ* গ্রন্থে মানভঞ্জন বিষয়ে বলেন :

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥ ৫ ॥

অর্থাৎ তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার-সাগরের রত্নস্বরূপ। হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ এই যে, তুমি যেন আমার প্রতি চির-অনুকূল থাকিও। (মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩ : ২৪৪)

বাংলা লোকসাহিত্যে রাধারমণ দত্ত উৎকৃষ্টমানের মানভঞ্জন বিষয়ক পদ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচিত মান এবং মানভঞ্জন পদে রাধার হৃদয়ের নানা বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। অধিকাংশ গানে প্রেমের বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি রয়েছে আক্ষেপের বৈচিত্র্য। যেমন :

১

আমারে আসিবার কথা কইয়া
মান করে রাই কেন রইলায় শুইয়া ॥
ও রাধেগো ডাকিতে না কর রাও, কেন মায়া নিদ্রা যাও
আশা দিয়া আনিলায় আমারে
আমি আশার আশে রহিলাম বসে গো রাধে, বাহিরে দাঁড়াইয়া ॥
আমার মনে দিয়া দুঃখ, পাইতেছ কত সুখ
জীবনভরা মরিবায় ঝুরিয়া।
আমায় বড় কষ্ট দিলায় গো রাধে তোমার দ্বারেতে আসিয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে; কেন শ্যামকে কাঁদাইলে

শ্যাম যদি যায়গো চলে, ঐ যে মথুরায়
আমার মান ভাঙিব, মিলন গাইব গো রাধে, শ্যামচানকে লইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪০৭)

২

ইতা কিতা করেগো বন্ধে পায়ে কেনে ধরে
শুনছনি সই পুরুষ হইয়া নারীর পায়ে ধরে ॥
যার কুঞ্জে গেছলায় বন্ধু তার কুঞ্জেতে যাও
আমার বিছানায় তুমি না তুলিও পাও ॥
হায় বন্ধু হায় বন্ধু বলে বালিশ লইলাম কোলে
দারুণ শিমুলের তোলা বুলাইলে না বুলে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
নিজগুণে প্রাণবন্ধু দিলায় আইয়া ধরা ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪০৭)

৩

কৃষ্ণ আমার আঙিনাতে আইতে মানা করি।
মান ছাড় কিশোরী ॥
যাও যাও রসরাজ এইখানে নাহি কাজ
যাও গি তোমার চন্দ্রাবলীর বাড়ি ॥
চন্দ্রাবলীর বাসরেতে সারা রাইত পোহাইলায় রঙ্গে
এখন বুঝি আইছ আমার মন রাখিবারে ॥
ভাবিয়া রাধারমণ বলে দয়ানি করিবায় মোরে
কেওড় খোলে রাধিকা সুন্দরী ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪০৯)

৪

চন্দ্রার কুঞ্জে বিদায় লইয়া ব্যস্ত হইয়া শ্যামরায়
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে যায়।
ওগো হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নিশি জাগরণে যায় ॥
কুঞ্জের দ্বারে গিয়ারে শ্যাম আগে পিছে ফিরিয়া চায়

ললিতা বিশখা সখী কুঞ্জে দাঁড়াইছে দেখা যায় ॥
ললিতায় বলে শ্যামরে, কাইল নিশিতে ছিলায় কোথায়
কঙ্কনের চিহ্ন ভিন্ন অঙ্গে রতির চিহ্ন দেখা যায় ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে ব্যথায় জনম গইয়া যায়
ভাবে বুঝি কমলিনী মান ভাঙ্গিলে ধরবে পায় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪০৯)

৫

তোরে কে শিখাইলো গো নিদারুণ মান
বারে বারে শ্যামকে ধনি কইলে অপমান ॥
শ্যাম যদি কান্দিয়া যায় গো হইয়া অপমান
চরণ ধরি বিণয় করি তারে গিয়া আন্ ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে যারে দেয় সম্মান
তার মানে মানিনী হইয়া তোমার এত মান।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে মান করগো দান
যোগীর বেশে দাঁড়াইয়াছে শ্যাম কালাচান ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪০৯)

৬

মান ছাড় গো কমলিনী রাই, মান ছাড় তুমি
আর তো চন্দ্রার কুঞ্জে যারাম না তো আমি ॥
এক দিবসে গিয়াছিলাম রঙ্গে আর ঢঙ্গে
হাসি খুসি কইছলাম কথা চন্দ্রাবলীর সঙ্গে ॥
এক দিবসে খাইয়াছিলাম ছিড়া পানের বিড়া
আর যদি যাই চন্দ্রার কুঞ্জে দেও গো মাথার কিরা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো সকলে
কালাচান্দের রাই কিশোরী তুইলা লইলাম কোলে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪১১)

৭

নাগর প্রবেশিও না রাধার মন্দিরে নাগর প্রবেশিও না ॥
সারা নিশি জাগরণ করি মান করি ঘুমাইছে প্যারী
রাধারে জাগাইতে নাগর আর বলিও না।
আমরা হইলাম পাড়ার নারী আমরা দুয়ার রক্ষাকারী
শ্রীরাধিকার হুকুম বিনে কপাঁ খুলিও না।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শ্যাম আসিয়াছে কুঞ্জের ধারে
শ্রীরাধিকা বিনে শ্যামের প্রাণ বাঁচে না ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪১০)

৮

রাই, কীসের তোমার অভিমান গো—
শ্যাম আইল না কুঞ্জবনে ॥
আর আইস বন্ধু বইসে কাছে—
খাওরে বাটার পান।
ওরে, হাসি-মুখে কওরে কথা
জুড়াউক পরান গো ॥
আর নতুন ফুলের মালা—
নতুন গাঁথুনি।
সেই মালা পইরাইত
আমার রাধা-বিনোদিনী গো ॥
আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো তুলসী-মালা পইরাই দেও
বন্ধের গলে নিয়া গো ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪১২)

৯

কত আদরে আদরে
শ্যামসুয়াগী রসিক নাগর মিলিল দুইজনে।
কত ভঙ্গি করি দাঁড়াইয়াছে একই আসনে ॥
শ্যামকুলে রাই রাইকুলে শ্যাম, শ্যাম রাইর কুলেতে
কী আনন্দ হইল আজি নিকুঞ্জ বনে ॥

মেঘের কোলে সৌদামিনী উদয় গগনে

কত পুষ্পচন্দন ছিটাইয়াছে সব সখীগণে

ভাইবে রাধারমণ বলে, আমায় রাখিও কমল-চরণে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৬)

১০

কুঞ্জে মিলিল মিলিল মিলিল রে.

আইজ রাধার শুভদিন মিলিল কানাইয়া রে ॥

জাতি যুথি ফুল মালতী মালাটি গাঁথিয়া

পরাইয়া দেও রাই শ্যামের গলে মালারে ॥

চুয়ারে চন্দন ঘষি কটরায় ভরিয়া

শ্যাম অঙ্গে দেও চন্দন ছিটাইয়া ছিটাইয়া রে ॥

ভাইবে রাধারমণ কয় রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়

মধুর বৃন্দাবন আজ প্রেমরসে ভাসিল রে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৭)

১১

এক সনে রাইখানু প্রেমে ভাসিয়া যায়

একজনে গায়ের বসন আরেক জনের গায়

কে রাধা কে কৃষ্ণ চিনন না যায় ॥

শ্যামের বামে রাইকিশোরী বইছইন দুইজনে

পুষ্পবৃষ্টি করে তারা সব সখীগণে।

দু বাহু তুলিয়া শ্যাম ধরেন রাইর গলায়

চন্দ্রগ্রহণ লাগিয়াছে ভাবে বোঝা যায় ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে দেখো সখীগণে

যুগলমিলন হইল আজি রস বৃন্দাবনে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৬)

১২

কী অপরূপ লীলা দেখবি যদি আয়
শ্যাম অঙ্গে রাইর অঙ্গ দিয়া রাইধনী ঝুলায় ।
শ্যামের মাথায় মোহনচূড়া বাতাসে হিলায়
রাইয়ের মাথায় মোহনবেণী ভুজঙ্গ খেলায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে সময় গইয়া যায়
এমন সুযোগ সখী আর কি পাওয়া যায় ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৭)

১৩

বহুদিনের পরে দেখা দিলায়রে নয়নমণি
ও কেবল কুশলে নি আছ বন্ধু বল সত্য করি ॥
কাইল আসিবার কথা কইয়া, যখন তুমি যাও বলিয়া
তোমার আসার আশায় বাসর শয্যা সাজাই বিরহিনী ॥
বল বন্ধু আর কতদিন, হয়নি তোমার জলছাড়া হীন
কেবল কান্দিয়া কান্দিয়া আমি পুষাইলাম রজনী ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, মানব জনম যায় বিফলে
তোমার আসার আশায় আর কতদিন থাকবে অভাগিনী ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৯)

১৪

ছাড়িয়া না দিব বন্ধুরে ছাড়িয়া না দিব
তুমি যদি ছাড় বন্ধুরে আমি না ছাড়িব
ওরে সুনারো পুতুলের মতো হৃদয়ে রাখিব ॥
তুমি হইবায় কল্পতরুরে বন্ধু আমি হইব লতা
ওরে দুই চরণে বান্ধিয়া রাখিমু ছাড়িয়া যাইবায় কোথা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে রে বন্ধু মনেতে ভাবিয়া
অভাগীর সঙ্গে নেও নিজ দাসী জানিয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৮)

১৫

মিলিল মিলিল মিলিল রে
আজ কুঞ্জে রাধা কানাই মিলিল রে।
শ্রীরাধিকার প্রেমরসে বিচিত্র পালঙ্ক ভিজে
কানাইর মাথায় চূঁড়া হালিল রে।
শ্যামকুঞ্জের জল অতীব সুশীতল
মকর কুঞ্জে কানাই শোভিল রে
ভাইবে রাধারমণ কয় রাধা কানাইর মিলন হয়
মধুর বৃন্দাবন আজ প্রেমরসে ভাসিল রে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৯১)

১৬

মধু বৃন্দাবনের রাই মিলিল গিরিধারী
উচ্চ পুচ্চ তুলে নাচে ময়ূরা ময়ূরী
আমরা যেন নিতই নিতই শ্যামরূপ হেরি
তরুয়া কদম্ব ডালে ডাকে শুকশারি।
প্রেমানন্দে সখীবৃন্দে দেয় রে করতালি।
রাধাশ্যাম মিলন হইল বলে হরিহরি।
ভাইবে রাধারমণ বলে সদায় চিন্তিয়া মরি—
জন্মবধি কইলাম চিন্তা পাইলাম গো শ্রীহরি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৯০)

৩.১.১২ মিলন বিষয়ক ভাববানী

আজু কি বা শোভারে মধুর বৃন্দাবনে
রাই কানু বসিল রতন সিংহাসনে
রতনের নির্ম্মিত বেদী মানিকের গাঁথণী
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী

(নরোত্তম দাস)

রাধা ও কৃষ্ণ–এই দুটি নাম যেন একে অপরের সাথে এমনভাবে জড়িত যে, আলাদাভাবে তাদের ভাবাই যায় না। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের প্রতীক, যেখানে প্রেম কেবল শারীরিক বা মানসিক নয়, বরং এক চেতনাত্মক মিলন। এই মিলন অস্থায়ী নয়, তা চিরন্তন, শাশ্বত এবং সর্বজনীন।

রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক কোনো সামাজিক বা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ নয়, বরং এ এক আধ্যাত্মিক সংযোগ, যা সকল আবেগ, ধর্মীয় রীতি কিংবা সামাজিক কাঠামোর ঊর্ধ্বে। রাধা হচ্ছেন ভক্তির প্রতীক, আর কৃষ্ণ সেই চিরন্তন পুরুষ, যিনি সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্র। রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ যেমন গোপন, তেমনি রাধার জন্য কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনমূলক। এই প্রেমে নেই কোনো চাহিদা, নেই কোনো প্রতিদান। এটি ঐশ্বরিক প্রেম।

রাধাকৃষ্ণের মিলন বিষয়ক আলোচনা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন আমরা তাদের দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতা ও বিরহের ব্যথা উপলব্ধি করি। এই বিরহ কেবলই দুঃখজনক নয়, বরং তা প্রেমকে পূর্ণতার দিকে ধাবিত করে। বিরহের আগুনে পোড়াতে পোড়াতে যে প্রেম নিজেকে নিখুঁত রূপে প্রকাশ করে, সেই প্রেমই শেষ পর্যন্ত মিলনে পরিণত হয়।

রাধা ও কৃষ্ণের মিলন ঘটে এক গভীর অন্তর্মুখী উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা গিয়েছিলেন রাজকীয় দায়িত্ব পালনে, কিন্তু রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণ রয়ে গেছেন চিরকাল। আর কৃষ্ণের স্মৃতিতে প্রতিটি মুহূর্তে রাধা ছিলেন জাগ্রত, কারণ কৃষ্ণ জানতেন–রাধাই তাঁর চেতনার অর্ধেক। তাদের পুনর্মিলন তাই কেবল দুই শরীরের নয়, বরং দুই আত্মার মিলন, যাদের একে অপর ছাড়া সম্পূর্ণতা নেই।

এই মিলনের গভীরতা বোঝা যায় যখন দেখা যায়, রাধা ও কৃষ্ণ মুখোমুখি হলেও ভাষাহীন; তাঁদের চোখে চোখেই প্রকাশ পায় গভীর প্রেমের ভাষা। এখানে কোনো শব্দ নেই, শুধু অনুভব, স্পর্শ ও সত্তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রেম। এই প্রেম কোনোও যুক্তির মধ্যে বন্দি নয়, এটি সর্বশক্তিমানের সাথেও সমানভাবে মিলিত হতে চায়, বিনিময়ে কিছু না চেয়ে শুধু নিজেকে সমর্পণ করে দেয়।

রাধার প্রেম ছিল নিঃস্বার্থ, বিনিময়হীন, একান্ত আত্মনিবেদনের। কৃষ্ণ, যিনি অসংখ্য নারী ও গোপিনীর মন জয় করেছেন, তিনিও রাধার কাছে পরাজিত, কারণ রাধার প্রেমে ছিল শুধুই নিবেদন–নেই কোনো দম্ভ, কোনো আকাঙ্ক্ষা। এই প্রেমই কৃষ্ণের হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে জয় করেছিল। রাধাকৃষ্ণের মিলন আমাদের শেখায়, প্রেম কেবল ভোগের বিষয় নয়, তা ত্যাগেরও অপর নাম। প্রেম তখনই সর্বোচ্চ রূপ ধারণ করে, যখন তা আত্মত্যাগে রূপ নেয়। মিলন তখনই পবিত্র হয়, যখন তা চেতনার স্তরে পৌঁছে যায়।

রাধাকৃষ্ণের এই মিলন আমাদের জীবনের গভীরতম সত্যগুলি বুঝতে সাহায্য করে–যেমন আত্মার আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের নিবেদন এবং চেতনার পূর্ণতা। এই মিলনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, প্রেমের সত্য রূপ সময়, স্থান কিংবা সামাজিক অনুমতির সীমায় আবদ্ধ নয়– এটি সর্বত্র, চিরন্তন এবং সর্বজনীন। শেষমেশ, রাধা ও কৃষ্ণের মিলন কেবল একটি পৌরাণিক প্রেমগাথা নয়, এটি সেই শাশ্বত বোধের প্রতীক যা মানুষকে তার অস্তিত্বের গভীরে পৌঁছাতে সাহায্য করে। তাদের মিলন প্রেমের সেই আদর্শ স্থাপন করে, যেখানে আত্মা আর পরমাত্মার কোনো ভেদ থাকে না–শুধু থাকে এক অভিন্ন, অনন্ত ভালোবাসার অনুরণন।

রাধারমণের গানগুলোতে আমরা দেখি, মিলনের মুহূর্তে আবেগের সঞ্চার যেমন তীব্র, তেমনি তার মধ্যে রয়েছে আত্মসমর্পণের সৌন্দর্য। ভক্ত যখন তাঁর ঈশ্বরকে ফিরে পান, তখন সেই মিলনে কোনো দাবিদাওয়া থাকে না। থাকে শুধু কৃতজ্ঞতা, বিস্ময় ও পরম শান্তির প্রতিচ্ছবি। এই অনুভবগুলো তাঁর গানকে করে তোলে আরও গভীর, প্রাণবন্ত ও সার্বজনীন।

তাঁর গানে সখী, দোহাই, রসের নামগুলো ব্যবহার করে মিলনের দৃশ্যের আবেগকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই গানগুলোয় 'সখী'র মাধ্যমে ভক্তি ও প্রেমের বার্তা আরও আন্তরিকভাবে প্রকাশ পায়। সখী যেমন রাধার দুঃখ-কষ্ট, অভিমান বোঝে, তেমনি ঈশ্বরের প্রতীক্ষার আনন্দও ভাগ করে নেয়। এই উপস্থাপন মিলনের আবেগকে করে তোলে একেবারে মানবিক ও সার্বিক।

রাধারমণের গানের ভাষা সহজ, সুর আবেগময়, আর ভাব গভীর। তাই তাঁর মিলন বিষয়ক গানগুলো কেবল ভক্তিমূলক নয়, বরং মনুষ্য জীবনের গভীর মানসিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি। মিলন এখানে ঈশ্বরের সঙ্গে একান্ত আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি রূপক, যেখানে ভক্ত নিজেকে ক্ষুদ্র করে ঈশ্বরকে গ্রহণ করেন হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে।

তাই বলা যায়, রাধারমণের গানে মিলনের বিষয়টি কেবল একটি প্রেমকাহিনি নয়; এটি মানুষের অন্তর্গত আত্মার চিরন্তন অনুসন্ধান, ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং চেতনার সেই সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর প্রতীক, যেখানে প্রেম, ভক্তি এবং ঈশ্বর একই সত্তায় মিশে যায়। তাঁর এই গানের ধারা আমাদের শেখায়, মিলন শুধু একটি ঘটনা নয়–এটি এক চিরন্তন অভিজ্ঞতা, যা অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে, আত্মা দিয়ে। নিচে রাধারমণের মিলন বিষয়ক গান তুলে ধরা হলো :

১

কুঞ্জে মিলিল মিলিল মিলিল রে

আইজ রাধার শুভদিন মিলিল কানাইয়া রে ॥

জাতি যুথি ফুল মালতী মালাটি গাঁথিয়া
পরাইয়া দেও রাই শ্যামের গলে মালারে ॥
চুয়ারে চন্দন ঘষি কটরায় ভরিয়া
শ্যাম অঙ্গে দেও চন্দন ছিটাইয়া ছিটাইয়া রে ॥
ভাইবে রাধারমণ কয় রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়
মধুর বৃন্দবন আজ প্রেমরসে ভাসিল রে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৭)

২

বহুদিনের পরে দেখা দিলায়রে নয়নমণি
ও কেবল কুশলে নি আছ বন্ধু বল সত্য করি ॥
কাইল আসিবার কথা কইয়া, যখন তুমি যাও বলিয়া
তোমার আসার আশায় বাসর শয্যা সাজাই বিরহিনী ॥
বল বন্ধু আর কতদিন, হয়নি তোমার জলছাড়া হীন
কেবল কান্দিয়া কান্দিয়া আমি পুষাইলাম রজনী ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, মানব জনম যায় বিফলে
তোমার আসার আশায় আর কতদিন থাকবে অভাগিনী ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৯)

৩

বৃন্দাবনেরে রাই মিলিল গিরিধারী
উচ্চ পুচ্চ তুলে নাচে ময়ূরা ময়ূরী
আমরা যেন নিতই নিতই শ্যামরূপ হেরি
তরুয়া কদম্ব ডালে ডাকে শুকশারি।
প্রেমানন্দে সখীবৃন্দে দেয় রে করতালি।
রাধাশ্যাম মিলন হইল বলে হরিহরি।
ভাইবে রাধারমণ বলে সদায় চিন্তিয়া মরি-
জন্মবধি কইলাম চিন্তা পাইলাম গো শ্রীহরি ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৯০)

৪

মধুর মধুর অতি সুমধুর মোহন মুরলী বাজে
দেয় করতালি, ব্রজের নাগরী মঙ্গল অরতি মাঝে। ধু ॥
শঙ্খ ঝঞ্জরী পাখেয়াজ খঞ্জরী কেহ কেহ বীণ বাজে।
তা ধৃক তা ধৃক তা-তা তা থৈয়া মধুর মৃদংগ বাজে।
ধূপে দীপ লইয়া মধুর আনন্দে ললিতা বিশাখা সাজে
ময়ূরী ময়ূরী নাচে ঘুরি ঘুরি রাই কানু থইয়া মাঝে।
কহে প্রেমানন্দে মনের আনন্দে আর কি এমন হবে
শ্রীরাধারমণ যুগল চরণ কবে সে দেখিতে পাবে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৯১)

৫

শ্যামকালা পাশা খেলবি আজ নিশি।
আমি যদি হারি খেলা শুনছে চিকন কালা
শ্রীচরণে হইয়া থাকব দাসী ॥
তুমি যদি হারো খেলা, গলে দিব বনমালা
চিরতরে রাখবে প্রেমে বাঁধি।
খেলাও আরম্ভ হইল, হাতের গুটি হাতে রৈল
জিনিল কিনিল রাই রূপসী ॥
শ্রীরাধারমণ কয়, ভাবছ কী রে রসময়
আজি কাড়িয়া রাখিব মোহনবাঁশি।

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৯৪)

৬

এক সনে রাইখানু প্রেমে ভাসিয়া যায়
একজনে গায়ের বসন আরেক জনের গায়
কে রাধা কে কৃষ্ণ চিনন না যায় ॥
শ্যামের বামে রাইকিশোরী বইছইন দুইজনে

পুষ্পবৃষ্টি করে তারা সব সখীগণে।
দু বাহু তুলিয়া শ্যাম ধরেন রাইর গলায়
চন্দ্রগ্রহণ লাগিয়াছে ভাবে বোঝা যায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে দেখো সখীগণে
যুগলমিলন হইল আজি রস বৃন্দাবনে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৪৮৬)

৩.১.১৩ মনোশিক্ষা বিষয়ক গীতি

মনোশিক্ষা দর্শনের মূলকথা মানুষের আত্মিক শক্তি ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর উচ্চ মর্যাদা আরোপ করা এবং তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে সত্যিকার অমৃতরূপের উন্মোচন করা। মনোশিক্ষায় মানুষ নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য পথ চলে। সাধকেরা মানুষকে বিশুদ্ধ করে তোলার জন্য মনোশিক্ষামূলক পদ রচনা করেন। শিক্ষার লক্ষ্যকে তারা নির্ধারণ করেন পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটানোর উপযুক্ত হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,"কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভেঙে পড়ার আগে শিখবার সময়, বেড়ে উঠার সময় প্রকৃতির সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন। অগ্নি, জলবায়ু, স্থলকে মনের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেখতে শেখাই প্রকৃত শেখা।" কর্মমুখি শিক্ষায় অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলেও সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবিক সমাজ গঠনে তা খুব বেশি স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারে না। মানবিক সমাজ গঠনে মনোশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ও মনোশিক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন শাখার এম এড প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরেছেন অধ্যাপক ড. জাহিদুল কবীর :

> শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়। সমাজের অন্তর্গত মানুষের মধ্যে শিক্ষাই গড়ে তোলে সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক। আবার সুষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণেই সমাজের বৃহত্তের স্বার্থ ও নাগরিকদের অধিকার বজায় থাকে। সমাজজীবনে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সমাজে সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন হলে সেই শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মানুষ শিক্ষিত, যুক্তিবাদী ও বিচারবোধ সম্পন্ন হয় এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে, সকল সমস্যার সঠিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মানুষ সচেতন, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠে। এ জন্য যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে

> উঠে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত থাকতে পারে। শিক্ষিত মানুষ সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে বা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। সমাজের সঠিক শিক্ষা ওই সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে কুসংস্কার মুক্ত রাখে। শিক্ষা হলো সমাজের উচ্চতর সোপানগুলোতে উন্নীত হওয়ার জন্য সাহায্যকারী ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষার দ্বারা সমাজের মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবে সমাজে শিক্ষা একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা অর্জনের মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তি মার্জিত পরিমার্জিত, রুচিবোধ সম্পন্ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত, আত্মনিয়ন্ত্রিত সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠেন। সমাজই তার সদস্যদেরকে শিক্ষা লাভের সেই ব্যবস্থা করে দেয়। সমাজে বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র একক বলা হয়। সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয় সমাজের মধ্যে ক্রিয়া করে এবং সমাজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজটি সম্পাদন করে। সমাজ ছাড়া যেমন শিক্ষার অস্তিত্ব নেই, তেমনি শিক্ষা ছাড়াও উন্নত সমাজের কথা কল্পনা করা যায় না। কাজেই সমাজ ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। উপরিউক্ত আলোচনা বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ বাংলাদেশের সমাজ কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের সমাজেও শিক্ষা ও সমাজ একইভাবে সম্পর্কিত এ কথা অনায়াসে বলা যায়। (কবীর, ২০২২ : ৯৭-৯৮)

সমাজগঠনের পর সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে লোককবিগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় লোককবি সাধকগণ মৌখিকভাবে নীতি শিক্ষার প্রচলন রেখেছে। এতে করে নিয়ন্ত্রণে থেকেছে সমাজের নিয়মকানুন। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এই মনোশিক্ষাগুলো পরস্পরের হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। শুধু তাই নয় মনোশিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম চর্চার পথ সুগম হয়েছে। সমাজ মানবিকতার দিকে অগ্রসরমান হয়েছে। মনে যখন গুরু নামের জ্ঞানের বাতি জ্বলে তখন সকল অন্ধকার এমনিতে দূর হয়। সমাজ শিক্ষা হাতে হাত রেখে আলোর পথের সন্ধান করে। সমাজে যখনই অশিক্ষা ও কুসংস্কার ভর করেছে, ঠিক তখনি লোক সাধকদের মনোশিক্ষা আলোতে আলোকিত হয়েছে ভূবন। সমাজ তথা পৃথিবীর মানুষকে আলোর পথে ডেকেছেন মহাত্মা লালন সাঁই জী এভাবে :

সত্যবল সুপথে চল ওরে আমার মন
সত্য সুপথ না চিনিলে, পাবিনে মানুষের দর্শন ॥

এভাবেই গানের মাধ্যমে মনোশিক্ষার প্রচলন করে লোককবিরা। তারা বিশ্ববাসীকে সত্য ও সুপথের সন্ধান দেয়। সকল দলমত, সকল পথ, সকল ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মতবাদের সর্বস্তরের মানুষকে উন্মুক্তভাবে আমন্ত্রণ জানায় সত্য ও সুপথে আগমনের জন্য। রাধারমণ দত্তের মনোশিক্ষামূলক গান মানুষের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে। আর এই জ্ঞানই মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে। রাধারমণের শতাধিক মনোশিক্ষামূলক গানে মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার ইঙ্গিত মেলে :

১

চিনিয়া মানুষের সঙ্গ লইওরে পাষাণ মন, চিনিয়া মানষের সঙ্গ লইও
তুমি অকুলেতে নাও ডুবাইবায় চাইও ॥
যদি হয় কুজন, তার কাছে যাইও নারে মন।
তুমি আগে তার অন্তরের খবর লইও ॥
যদি হয় সুজন, তার কাছে মজাইও মন
রসিক জেনে রসের কথা কইও ॥
ভাইবে রাধারমণ কয়, শোন মোর মন মহাশয়
তুমি নিদাগেতে দাগ লাগাইবায় চাইও ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৬৫)

২

ওরে মন কুপথে না যাইও
ঘরে বসি হরিনাম নিরবধি লইও ॥
অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বানাইয়াছি ঘর
ভাই নাই বান্দব নাই কে লইব খবর ॥
অকূল সমুদ্রমাঝে ভাসিয়া ফিরে পেনা
কতদিনে দয়াল গুরু লওয়াইবায় কিনারা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
পার হইমু পার হইমু বইলে দিন তো যায় গইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৬১-১৬২)

৩

দুর্লভ মানব দেহ আর কি হবে জানি না
চৈতন্য হইয়া রে মন গুরু ভজ না।
ও মন, ধর্মগুরু কর্মগুরু দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু
গুরু কল্পতরুরে মন তাই কি জান না।
ও মন জ্বালাও গুরুজ্ঞানের বাতি
অজ্ঞানরে দেও আহুতি
ভব বন্ধন হরে মুক্তি কর ভক্তি সাধনা ॥
ও মন শ্রীরাধারমণের আশা শ্রীগুরু চরণ ভরসা
গুরু কৃষ্ণ—রূপরে মন তাই কি জান না।

(শর্মা, ২০১৯ : ১৬৭)

৪

ধররে অবোধ মন উপদেশ ধর
অসৎ সঙ্গ পরিহরি সাধু সঙ্গ কর।
লোভে কার সাধু সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন
কৃষ্ণ নামে কর রুচি আসক্তি প্রচুর
ভজনে অনর্থ নাশ নিষ্ঠার উদ্‌গম
ভাবের আবেশ হইলে জন্মে প্রেমাঙ্কুর।
প্রেমাঙ্কুর হইলে সাত্ত্বিকের উদয়
চিন্তা জাগরণ দ্বেষ মলিনাঙ্গ জয়।
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত্র বাখানি
প্রলাপ ব্যধিরুন্মাদ মোহমৃত্যু গনি।
এই দশ দশা যার অঙ্গের ভূষণ
তার অনুষঙ্গ চাহে শ্রীরাধরমণ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৬৮)

৫

পাষাণ মন তোর গইয়া যায় রে দিন।
আইতে একদিন যাইতে একদিন আর কত দিন বাকিরে।
তুমার দেশে যাইবার মনে নাইরে ॥

সত্য করি ভবে আইলাম রে মনরে গুরু ভজিবারে
মিছামায়ায় বন্ধ হইয়া পাশরিলায় তারে ॥
সমুদ্রমন্থন কইলাম মানিক পাইবার আশে
আমি ডুব দিয়া মানিক পাইলাম না আপন কর্ম দুষে ॥
বটবৃক্ষের তলে গেলাম ছায়া পাইবার আশে
পত্র ভেদি রৌদ্র রাগে আপন কর্ম দুষে ॥
ভাইবে রাধরমণ বলে রে মনেতে ভাবিয়া
পার হইমু পার হইমু বলে মোর দিন তো যায় গইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৬৮-১৬৯)

৬

পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে গো যতনে রাখিও তারে
পিরিতি পিঞ্জিরার পাখি ছুটলে কি আর মিলে,
ফুল চন্দন তুলসী দিয়া রাখিও যতনে।
রমণচান্দে বলে সখা কি ভাবছ মনেতে,
কর্মদোষে মজল্না মন শ্যামবন্ধের পিরিতে।

(শর্মা, ২০১৯ : ১৭০)

৭

বুঝি কোন কর্মফলে এলেরে মন ভূমণ্ডলে,
কত সাধে জন্ম পাইয়ে ছিলে এমন দুর্লভ জন্ম যায় বিফলে ॥
মনরে এই প্রতিজ্ঞা ছিল পূর্বে, ভজবে কৃষ্ণ এসে ভবে।
এখন নাইরে স্মরণ ভবের ভাবে, স্ত্রীপুত্র সম্পদে ভুইলে
মনরে শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে তিন রূপে এক বিশ্বাসেতে।
শুদ্ধ করণ রূপের ভজন সাধন বিনে আর কি মিলে।
মনের মহাজনের যেই মতো তাতে হ'রে অনুগত।
মন হইলে না মনের মতো, শ্রীরাধারমণ বলে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৭১)

৮

মন ঐ গুরু পদে ধরে তারে চিন মন,
তোর রঙ্গে রসে যাবে না দিন।
বিলাতের কর্তা জিনি মন হইবি স্বাধীন
মনরে হবিগঞ্জ নবিগঞ্জ কলিকাতা তেলিগঞ্জ রে
আশুগঞ্জেল্লাইনের ভিতরে মন আমার ঘোরাবি কতদিন।
রাস্তায় রাস্তায় থাম গজিয়ে তার বসিয়ে রে
তারে চিনিয়ে দেব ঠুকা রে মন, দিনের খবর পাবে দিন।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জন্ম যায় বিফলে
গুরুর চরণ পাবে বলে রে মন আশায় আশায় গেল দিন।

(শর্মা, ২০১৯ : ১৭২)

৯

মন তোর মতো বোকা চাষী ত্রিজগতে আর দেখি না
দেহের জমি পতিত রইলো চাষাবাদ তো করলি না ॥
যমের তশীল্‌দার এসে করবে তশীল্‌ ধরে কষে
মাল গুজারি করবি কিসে সে ভাবনা তো ভাব্‌লে না
ছয়টা ষাঁড় থাকতে তোর জমি আবাদ করলে না
নিলাম উঠিলে জমা রদের উপায় দেখি না।
কী দশা হবে শেষে সব নাশিলে আসলে বসে
দেহ যখন পড়বে ধসে উপায় কি তার বল না
ভাইবে রাধারমণ বলে আলসে জীবন যাপোনা
জমিদারের খাজনার কড়ি সময় থাকতে খোঁজনা ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৭৫)

১০

রে মন কী রসে ভুলিয়াছো, অসার সংসারে আশা
ভরসা করিয়াছো ॥
দেহকে আপন জেনে, যতন করিয়াছো
তুমি নি তোমার মনরে, আপন জানিয়াছো ॥

যাইবার বেলা সঙ্গে সাথী, কেবা করিয়াছো
ভাই বন্ধু সুতদারা, আপনা জানিয়াছো ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, মনেতে ভাবিয়া
ব্রহ্মানন্দের দেহতরী, শুকনায় ভাসাইয়া ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৭৬-১৭৭)

১১

শুনরে পাষাণ মন আর কত দিন রবে তুই ঘুমে অচেতন ॥
তুমি মনে মনে ভাবছ কি তোমার হবে না মরণ ॥
দুই দিন চাইর দিন ভবের খেলারে পরার সনে উলামেলারে
যাইবার কালে চিনবায় মজা বুঝবায়রে তখন ॥
বসত কর খাপুর দেশে মনরে গুম দিয়াছ কোন সাহসে রে
মনরে জাইগে দেখ তর চুরে নিল মহাজনের ধন ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার মানবজীবন যায় বিফলেরে
মনরে ব্রহ্মানন্দ কয় মোর কপালে ঘটল বিড়ম্বন ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৭৭)

১২

শুনহে মনভাই তুই বড় গোয়ার
অমৃত ছাড়িয়া বিষ করবে আহার ॥
সুধামৃত হরি নাম জগতের সার
কুমতি সঙ্গ দোষে সকলি অসার ॥
দূর্লভ মানব জন্ম না হইবে আর
শ্রীহরি সম্বল ভবসিন্ধু তরিবার ॥
হরি নাম চিন্তি মনে জপ অনিবার
শ্রীরাধারমণে ভণে হরি নাম সার ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ১৭৮)

১৩

হারাইল মূল লাভের আশে ভবে এসে মনরে পাগল ॥
পরের ধনে হইয়া ধনী এসেছ এ অবনী, মনরে
দিনে দিনে নাই আমদানী সদায় হানি রিপুর বশে
দারা সুত রাজ্য ধন যায় বৃথায় জীবন, মনরে
যখন আইসেশমন তখন কি কেহ আসবে পাশে
সাঙ্গ কর ভবের খেলা হাতে কর নামের মালা, মনরে
রাধারমণ বলে আর নাই বেলা একলা যাওয়া দূর দেশে।

(শর্মা, ২০১৯ : ১৮১)

৩.১.১৪ বৈষ্ণব সহজিয়া বিষয়ক ভাববাণী

বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ– তাই বৈষ্ণব মাত্রই কৃষ্ণভক্ত হয়ে থাকে। তারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে সর্বজ্ঞ ভাবেন, জানেন এবং মানেন। বৈষ্ণব ভক্তগণ কৃষ্ণকে ভাবে সখা, কেউ ভাবে সন্তান, কেউ- বা স্বামী। কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব সাধকগণ বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিভিন্ন রসের নানামত প্রচলন করেছে। এগুলো হলো—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

বৈষ্ণব পদাবলিতে এই পাঁচটি রসপর্যায়ের ভাগ থাকলেও সব রসের মূলে আছে একটি মাত্র রস- সেটি হলো ভক্তিরস। এ বিষয়ে শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'পদাবলি-পরিচয়' গ্রন্থে বলেন, 'এই জন্যই তাঁহারা ভগবদ্ প্রীতিকেই একমাত্র স্থায়ীভাব এবং ভক্তিকে তথা মধুরারতিকেই মুখ্যরস অর্থাৎ আদি রস বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী শ্রুতি প্রতিপাদিত রসকেই মধু ব্রহ্ম, আনন্দ ব্রহ্মরূপে আস্বাদনপূর্বক 'রসরাট' বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন'। যেমন :

মুখ্যরসেসু পুরা যঃ সক্ষেপেণোদিতো রহস্যাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট সবিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ ॥

(মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৮ : ১১৪)

আর ভক্তিরস স্ফুর্তি লাভ করেছে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণের ভজন বৈচিত্র্য অবলম্বন করে বৈষ্ণব পদাবলিতে পঞ্চরসের বিকাশ ঘটেছে।

শান্তরস

বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ হলেন অমিত তেজ-সম্পন্ন এবং ঐশ্বর্যশালী পুরুষ। কারণ তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি ভাব, ভক্তি ও প্রীতি জন্মে। এই ভক্তি, ভয় ও প্রীতিবশত তাঁর চরণে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা হয়। তাই কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণই হলো শান্তভাবের আরাধনা। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্ত রসের সৃষ্টি করেছে। এই শান্ত রসে ভক্ত ও ঈশ্বরের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব থাকে। তাই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি আদি-অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ড পতির প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন এভাবে :

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ মমপীলু
দয়া যেন ছোড়বি মোয়।
(বিদ্যাপতি)

দাস্যরস

দাস্যরসে বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে অমিত ঐশ্বর্যশালী প্রভু ভেবে নিজেদেরকে দাস মনে করে থাকে। এবং সেভাবেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করে। এ রসে ভক্তের সাথে স্রষ্টার প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই যে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক, সেটিই হলো দাস্যরস।

সখ্যরস

বৈষ্ণব সাধনায় ভক্ত ও ভগবানের প্রীতিময় সম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শান্ত রসে স্রষ্টার সাথে ভক্তের নিষ্ঠার মাধ্যমে সমর্পণের সম্পর্ক। আর দাস্যরসে ঈশ্বরের সেবার মাধ্যমে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। কিন্তু সখ্যরসে এসে ভক্তের সাথে ভগবানের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সখাগণ নানাভাবে কৃষ্ণসেবা করে আনন্দলাভ করে; অন্যদিকে কৃষ্ণও অনুরূপভাবে তার প্রতিদান দেয়। সখ্যরসে পদ রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র, বাসুদেব ঘোষ, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ। এখানে বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের সখ্যরস বিষয়ক পদ তুলে ধরা হলো :

কানাই হারিল আজু বিনোদ খেলায়
সুবলে করিয়া কণ্ঠ্যে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশী বটতলে লইয়া যায়।
(বলরাম দাস)

বাৎসল্যরস

খ্রিষ্টান ধর্মসহ বিশ্বের বহু ধর্মে ঈশ্বরকে পরমপিতা রূপে পূজা করার নজির রয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম সাধনে ঈশ্বরকে পিতা না বলে পুত্র হিসেবে পূজা করা হয়। এই পূজাকে বলা হয় পুত্র ভারের পূজা। এখানে বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে সন্তান হিসেবে কল্পনা করে তাকে পূজা করে। ভক্ত ও ভগবানের এই সম্পর্কের পরিণতি লাভ করে বাৎসল্যরসের মাধ্যমে।

মধুররস

বৈষ্ণব সাধনায় পঞ্চরসের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রস হলো মধুররস। বৈষ্ণব কবিরা এই রসকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। মধুররসে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রীতি এবং বাৎসল্যের স্নেহের সাথে এসে যোগ দেয় প্রেম। তাই স্বাভাবিকভাবেই মধুররসে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের সবগুণই বজায় থাকে। তাই মধুররস সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতি রসে
শান্ত-সাদ্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥

মধুররসের সাধনায় ভক্ত হয় প্রেমিকা আর ভগবান হন প্রেমিক। তাই বৈষ্ণব ভক্তগণ কৃষ্ণকে মনে করে পরমপুরুষ, আর নিজেদের মনে করে তার লীলা সহচরী কান্তা। উভয়ের প্রগাঢ় প্রেম সম্পর্কের মাধ্যমে যে ভগবাৎ আরাধনা এই হলো মধুররস সাধনা। বৈষ্ণব কবি রাধারমণের গান বিশ্লেষণ করলে বৈষ্ণব সহজীয়া বিষয়ক পদে এই সকল রসের সন্ধান মেলে। যেমন :

১

আশানি পুরাইবায় গুণমণি রে দীনের নাথ বন্ধু
আশানি পুরাইবায় গুণমণি ॥
ত্রিভুবনে ভরমনা করি না পাইলে তোমারে—
বাউল মনায় বিন্ধা করি ঘুরাস কত ঘুনি রে।
আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নৌকা মনুয়া যে কাণ্ডারি
হৃদ নগরে আছে হাট হুস মাঝি বেপারিরে।
শিশুকালে দেখা দিয়া-যৌবনকালে ঘুম
উদাসী করিলা দিয়া কুটানারকের চূম্‌রে।
কামক্রোধ ছাড়ি দিয়া হইয়া আউল
আশাপূর্ণের দিশা রাখে রমণ বাউলরে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫০৩)

২

আমার দেহতরী কী দিয়া গড়িলায় গুরুধন।
আমি ভূতের বেগার খাইটে মইলাম পাইলাম না
শ্রীগুরুর চরণ ॥
নায়ের আছে ষোলো গুড়া মধ্যে মধ্যে আছে জোড়া
ওবা গুরুধন।
নায়ের হাইল মানে না গুণ বলে না মনমাঝি ভাই
পাই না দর্শন ॥
পার হৈতাম গেলাম ধইয়া সে পারে পাষাণের মাইয়া
ওবা গুরুধন।
মাইয়ায় পার করে না, কূলে বৈসা ভাবতে আছে রাধারমণ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫০২)

৩

এমন মধুর নামে রতি না জন্মিলে রে
নির্বলের বল বন্ধু কেবল হরি।
নাম যজ্ঞ মহামন্ত্র উপাসনা করো হে
যদি নাম নিরলে নিতে পা
পাপতাপ দূরে যাবে মধুর হরির নামেরে ॥
পঞ্চ দিয়া পঞ্চ ধর আরেক পঞ্চসাধন কর রে
পঞ্চ দিয়া পঞ্চকে উদ্ধারো—
পঞ্চ লইয়া চল সাধুর বাজারে রে ॥
মাইয়ার অনুগত হয়ে প্রেম সাধনা করো হে
মাইয়া যে হয় অনঙ্গ মঞ্জরী
মাইয়ার প্রেমে উদয় হয় কিশোর কিশোরী রে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার বন্ধু কেবা আছে
ভব নদী দিতে চাও পাড়ি
ভব নদীর পাড়ি দিতে শ্রীগুরু কাণ্ডারিরে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫০৫)

৪

এই তো মহাজনের মতো
যার প্রেমে স্বয়ং কৃষ্ণ দিয়াছেন প্রেমের খৎ ॥
মাইয়ার সুখে সুখী জগৎ মাইয়ার অনুগত ॥
দাসখতের এই অর্থ দেহ আত্মেন্দ্রিয় যত
মাইয়ার সুখে অনুরত সে বড় কঠিন ব্রত
রাধা প্রেমে ঋণী কৃষ্ণ তমসুকে দস্তখত ॥
হরিহরের যেই মর্ম মাইয়ার সাধন মুখ্য কর্ম
আপনি আচরি ধর্ম দেখাইলেন জীবকে সহজ পথ
শ্রীরাধারমণে ভণে মাইয়া ভবে সৎ ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫০৫)

৫

কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু মাঝে থাক মইজে
হইয়ে গোপীর অনুগত ॥
গোপীর বিশুদ্ধ ভক্তি সজল রতি
প্রেম রসে উনমত
যেমন জল ছাড়া মীন জলের অধীন
জল বিনে মীন রয় নিহত ॥
গোপীর ভাব চাতকিনী উন্মাদিনী
মেঘের আশে পিপাসিত
পান করে না অন্য বারি প্রাণে মরি বিনে
নবঘনের সুধামৃত ॥
কালাচান্দ মদনমণি অনঙ্গ জিনি
মন্মথের মন্মথ
রাধারমণের কথা হৃদয়গাঁথা
মন হইল না মনের মত ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫০৭)

৬

দয়াল বিনে বন্ধু কেহ নাই এ সংসারে
দয়াল বন্ধু কৃপা সিন্ধু বিপদভঞ্জন মূলাধার ॥
ভাই বন্ধু পরিবার কেবা সঙ্গে যায় কার
মরিলে মমতা নাই ত্বরাই করে ঘরের বার ॥
মনেতে মিনতি করি চান বদনে বল হরি
সাধনের ধন হইল চুরি কার পানেতে চাই আর ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
ঘাটে বান্ধা শমনতরী নাই আশা তরিবার ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫১১)

৭

দেহার সুখে কেন প্রেমের মরা মর্লেমনা
প্রেমের মর্ম জানলে না ॥
মরা হইয়ে অধর ধরা রসিকের ভাব শিখলেম না ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রিপু ছয়জনা
ছয়জনা ছয়দিকে টানে মাঝির টিপ মানে না ॥
মেঘের আশে চাতকিনী বৈসে থাকে একমনা
প্রাণ যদি যায় জল পিপাসায় অন্য জল পান করে না ॥
কালাচান্দ রাসমোহন তিলকচান্দ ঠিকানা
প্রভু রঘুনাথের প্রেমের কারণে রাধারমণ সাধলে না ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫১২)

৮

ধরবে যদি রসের মানুষ নেহারে
সহজ ভাবেরি ঘরে
ভাবের গুরু কল্পতরু মনপ্রাণ যে হরে।
দেহরতি কর শূন্য গুরুরতি কর পুণ্য

কামশূন্য শুদ্ধ নির্বিকারে
মরা হয়ে অধর মরা চিন্তামণি পুরে।
অধর মানুষ সহজ রসে বিরাজ করে ঢাকার শ'রে।
সে মানুষ ত্রিপুন্নীর নীরে
অধর চান্দের রসের খেলা মদনগঞ্জের চকবাজারে।
চলরে মন মুসুদাবাদ
খিল জমির কর আবাদ উদয় চান্দ শ্রীরূপনগরে।
গোসাই শ্রীরাধারমণের আশা পুরে কিনা পুরে ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫১৩)

৯

রাধার প্রেমসিন্ধু মাঝে রসে মইজে কালাচান্দ নবীন গৌরা ॥
কামানুগো রসের গতি পঞ্চরতি ভেদ করিয়ে সাধন করা।
রাগের চব্বিশ গুরু কল্পতরু বেদবিধি সিদ্ধান্ত ছাড়া ॥
দৈবযোগে নিশাকালে সুযোগ পাইয়ে নিসবিকায়ে নেহার কড়া।
হইয়ে মরার মতো ধীর শান্ত কালভুজঙ্গের লেঞ্জে ধরা ॥
ভুজঙ্গের মাথে মণি চিন্তামণি মণির সুধা মূলে ধরা।
রাধারমণ বলে সুধাপানে ক্ষুধাতৃষ্ণা বারণ করা ॥

(শর্মা, ২০১৯ : ৫২৬)

১০

শ্যাম কালিয় সোনাবন্ধুরে বন্ধু তুমি আদরেরই ধন
তুমি আমার আমি তোমার জানে সর্বজন।
শতকোটি আরাধনায় রে বন্ধু পাইয়াছি তোমারে
আইসো আমার হৃদ মাঝারে শীতল করো তাপিতো প্রাণ ॥
যত আশা ছিল মনেরে বন্ধু পুরাওরে এখন
আইসো আমার কুলমাঝারে করো প্রেমজ্বালা নিবারণ ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে বন্ধু করি নিবেদন
তোমারে যে কোলে লইয়া হয় যেন মরণ ॥

(কবীর, ২০২২ : ২০৫)

১১

রস ছাড়া রসিক মিলে না, জল ছাড়া মীনের জীবন মরণ
রসিক চাইয়া ডুবলো রাধার মন।
সখীগো যে ঘাটে জল ভরতে গেলাম সে ঘাটে ইংরেজের ফল
এগো কলসির মুখে ঢাকনি দিয়ে সন্ধানে ভরিবো জল ॥
সখী গো দলে দলে অষ্ট দলে শত দলে বৃন্দাবন
এগো কোন ফুলেতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু প্রেমের গুরু মহাজন ॥
এগো দস্তা পিতল একই রকম মিশে নাগো কী কারণ
এগো সোনায় সোহাগা মিশে মন মিশেনা কী কারণ
রসিক চাইয়া ডুবলো রাধারমণ ॥

(কবীর, ২০২২ : ২১১)

৩.১.১৫ ধামাইল

ধামাইল মূলত বিয়ের অনুষ্ঠানে গীত আনন্দময় সংগীত। সিলেটের আঞ্চলিক শব্দ 'দুম্বইল' থেকে 'ধামাইল' শব্দটি এসেছে। সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানে বর বা কনের, ভাবি, সখি, দাদি-নানীরা ধামাইল গান পরিবেশন করে। ধামাইল গান নৃত্য সহযোগে গ্রাম্য নারীরা হাতে তালি বা থাবা দিয়ে পরিবেশন করেন। এই ধামাইল নৃত্যের উৎপত্তি মণিপুরী আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে। ধামাইল গানের বাণী ও সুর অত্যন্ত সহজ ও সরল। তবে ধামাইল গানের বাণী কখনো কখনো আনন্দ রসকে করুণ করে তোলে। ধামাইল গান তার শিল্প গুণে বাংলা লোক সংগীতের বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। ধামাইল গান মূলত সমবেত কণ্ঠের গান। এ গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নাই বললেই চলে। তবে বর্তমান সময়ে ধামাইল গানে বাংলা লোকবাদ্য যন্ত্রসহ আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই ধামাইল গানের প্রসিদ্ধ রচয়িতা বৈষ্ণব কবি রাধারমণ। তবে রাধারমণ রচিত বেশিরভাগ ধামাইল গানে রাধা-কৃষ্ণের স্তুতি রয়েছে। নিচে রাধারমণ রচিত ধামাইল গান দেওয়া হলো :

১

আমি কি হেরিলাম গো শ্যাম কালিয়া রূপে আমার
পাগল করল গো ॥
কুক্ষেণে জল ভরতে গো গেলাম
আমি রূপ দেখিয়া ভুইলে গো রইলাম

ও আমি জলের ছায়ার রূপ
দেখিয়া আমি ভুইলে রইলাম গো ॥
যদি আমি পাখি গো হইতাম
উড়ে গিয়া সে রূপ আমি নয়নে হেরিতাম
এগো পাখা দিতে দারুণ বিধি বিধি বাদী হইল গো ॥
ভাইবে রাধারমণ গো বলে
প্রেমানলে অঙ্গ গো জ্বলে
এবার আমার মনের দুঃখ
মনে রইল গো ॥

(দাশ, ২০১০ : ৭৫)

২

এক প্রাণ তুমি দিবায় কয় জনারে ছাড় আমারে
আমারে বানাইয়া দোষী তুমি হইলায় পরম সুখি
ও আমায় দোষী করলায় এ ভব সংসারে ॥
আমার বন্ধু চিকন কালা বাঁশি বাজায় দুপুরবেলা
ও বন্ধু আমায় ডাকে বারে বারে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
ও আমি যৌবতী নারী রইতে না দেয় ঘরে ॥

(দাশ, ২০১০ : ৮৫)

বলা বাহুল্য রাধারমণের গান বিষয়গত দিক থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তার গানের বিষয়ে বৈষ্ণব ধারার রীতির যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রভাব। রয়েছে সাধারণভাবে প্রচলিত ষড়রিপুর, পঞ্চকোষ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চরস সম্পর্কিত বিষয়। এই বৈষ্ণব কবিরগানে আরো রয়েছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়র বিষয়। বাংলা লোকসংগীতে মহাত্মা লালন সাই, জালাল খা, রাধারমণের মতো বিষয়গত দিক থেকে এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ খুব কম জনই রচনা করেছেন। রাধারমণ দত্ত গান রচনা করেছেন হৃদয়ের টানে অন্তরের নিগূঢ় প্রেম থেকে। সংগীতের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর বাস্তবতার কোলাহল থেকে নিজেকে পরমাত্মার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। পিতৃদেবের সান্নিধ্য দীর্ঘকাল না পেলেও পিতার জ্ঞানের আলোয়

আলোকিত হয়ে চিনিয়া মানুষের সাদ নিয়েছেন সারাজনম। তাই ভক্তি এবং ভারের রসে প্লাবিত হয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ের গান।

৩.১.১৬ জলভরা বিষয়ক গান

বৈষ্ণব কবি রাধারমণের 'জলভরা' পর্বের গানের বিষয়বস্তু হলো– জলের ঘাটে চিকনকালার বংশি হাতে বসে থাকা এবং বংশিয় সুরের মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে ধারার মনকে উচাটন করা। হাওরাঞ্চলের গ্রামীণ নারীরা বিয়ে উপলক্ষ্যে ধামাইল গান পরিবেশন করে থাকে। আর এই ধামাইল গানের অত্যাবশ্যক পর্ব হলো জলভরা গান। রাধারমণের অন্যান্য পর্বের গানের মতোই জলভরা পর্বের গানে বিরহের প্রসঙ্গ আছে। বিরহকাতর নারী মনের মর্মবেদনা অসাধারণভাবে প্রকাশ করেছেন রাধারমণ দত্ত তাঁর জলভরা পর্বের গানে। জলভরা পর্বের গানে বাঁশের বাঁশি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ পর্বের গানে কৃষ্ণ সময়ে-অসময়ে বাঁশি বাজিয়ে রাধার মন হরণের চেষ্টা করে। শুরুর দিকে রাধা এই বাঁশিকে গুরুত্ব না দিলেও পরে ঠিকই বুঝতে পারে- এই বাঁশির সুর কোন সাধারণ বাঁশির সুর না। এটি ডাকাতিয়া বাঁশির সুর। তাই যতই দিন যায় কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধা উন্মাদিনী হতে থাকে। এজন্য রাধারমণের জলভরা পর্বের গানগুলো শারিরীক আদোলে তৈরি করা হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিচ্ছেদকে উপজীব্য করে। যেমন :

১

জলে যাইও না গো রাই
আইজ রাধার জলে যাওয়ার জাতের বিচার নাই
মায়ে পিন্দইন যেমন তেমন ভইনে পিন্দইন শাড়ি
শ্রীমতি রাধিকায় পিন্দইন কৃষ্ণানীলাম্বরী।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোনগো ধনী রাই
কালার লাগি হইছন পাগল, কমলিনী রাই ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫১)

২

জলের ঘাটে লগো সখী জলের ঘাটে চল
কালার রূপ হেরিব নয়ন ভরি, চলগো সখি চল।
আমি নয়ন ভরি হেরব সেরূপ দাঁড়াইয়া জলে

বনফুলে মালা গাঁথি দবে বন্ধের গলে ॥

ঐ বাজে মোহন বাঁশি শুনগো শ্রবণে

প্রাণ হরিয়া নিল কালা ঐ বাঁশির টানে ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে, করি জলের ছল

কাল রূপ দেখিতে জলের ঘাটে চলগো সখী চল ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫১)

৩

প্রাণবন্ধু দাসীরে ফিরিয়া চাইও

অবলা রাধারে বন্ধু মনেতে ভাবিও।

নিতি নিতি চুপে আইসা যাওয়া কোন রূপেরে

ওগো ননদীর ডরে বন্ধু আমায় না ছাড়িও।

মুই যাইমু যমুনার জলে, ও বন্ধু তুমি যাইও কোন ছলেরে

এগো কদমডালে বসিয়া বন্ধু বাঁশিটি বাজাইও।

তুমি আমার প্রাণপ্রিয় আমায় শান্ত কর দেখা দিয়ারে

আমার বিষাদ সংকটের কালে যুগল চরণ দিয়ো গো।

দীনহীন কাঙ্গাল আমি ঠেকিয়া রইমু মায়াজালে রে

ওগো শ্রীরাধারমণে বলে দুঃখ দিলে দুঃখ সইও ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫১)

৪

যাব না আর জলে সইগো আর যাবনা জলে

জলের ঘাটে শ্যাম নটবর দেখছি কদম তলে ॥

কদম তলে বসি শ্যামে বাজায় যখন বাঁশি

ধুমার ছলে কান্‌তে থাকি যখন রানতে বসি ॥

সব সখি লৈয়া সঙ্গে জল ভরিতে গেলাম রঙ্গে

কালার রূপ দেখিয়া ভুলে রৈলাম কালা কদম তলে।

ভাইবে রাধারমণ বলে কালা আছে রাইয়ের ছলে

কদম তলে বাজায় বাঁশি রাধা রাধা বলে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫২)

৫

শ্যামচাদ আমার মন নিল কাড়িয়া
জলের ঘাটে গিয়েছিলাম জলের লাগিয়া।
শ্যামে নষ্ট করল জাতিকুল, তার জন্য মন বেয়াকুল
শ্যামের জ্বালায় মরি সইগো কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
প্রাণটা বান্ধা শ্যামের কাছে, শ্যাম যায় চলিয়া
আমি পাগলিনী হইয়া বেড়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে কী কাজ আর জাতিকুলে
দাসী হয়ে সঙ্গে কুলমান ত্যজিয়া ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫৩)

৬

চলগো সখী জল আনিতে
গিয়ে যমুনায় জলের ছায়ায় কদম্ব তলায় প্রেম খেলিতে ॥
আমি প্রেমেরই পিয়াসী কাঁখে নিয়ে কলসী হইলাম রওয়ানা জল ভরিতে।
আমার মনেরই আশা বন্ধের ভালবাসা খেলিতে পাশা কালারই সাথে।
এমন পাষাণো মারিয়া প্রেমবাণো ভুলিয়া রইলো কার কুঞ্জেতে।
আমার যৌবন হল শেষ প্রাণবন্ধু বিদেশ ঝাপ দিবো এখন যমুনার জলেতে।
আমার মরণকালে তোরা সবে মিলে যমুনারই জলে যাইও আমার সাথে।
আমার জিয়ন-মরণ কয় রাধারমণ সকলই অসার পাইলাম না তপস্যা করিতে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৬২-৬৩)

৭

জলের ঘাটে পাইলাম দেখা বন্ধু শ্যামরায়
এমন নিষ্ঠুর বন্ধু রাধাকে জ্বালায় ॥
হৃদয়েতে ছেল বসাইয়া জ্বালায় প্রেমের বাতি
আমার মনপ্রাণ হরিনিল করিল কলঙ্কী।
সাজাইয়া ফুলের মালা রইলাম আশা পন্থে

আসবে নিশো প্রাণবন্ধু অবলার প্রাণ থাকতে ॥
একেতো বসন্তের জ্বালা, জ্বালায় শ্যামরায়
বাঁশি বাজল কোন বনে সইগো জাইনে আয় ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধনি রাই
বন্ধের সঙ্গে দেখা হবে কদম্বের তলায় ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৬৩)

৮

বিদায় হইলাম গো রাই কমলিনী তোমার চরণে
আমি শুইলে স্বপনে দেখি গো রাধে দেখি না তুমি বিনে ॥
রাধে গো
গোষ্ঠ আচরণে যাই, রাই বইলে বাঁশরী বাজাই
বাঁশির স্বরে ডাকিগো তোমারে
বাইর হও বাইর হও রাধে দেখি তোমায় পরাণ ভরে।
রাধে গো
ছাড়িয়া যাই জনমের মত দিয়া যাই দানপত্র গো
চূড়া বাঁশি দিয়া যাই তোমারে রাধে
ঐ রাঙ্গা চরণে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৬৫-৬৬)

৯

রাধার নামে কে বাজাইল বাঁশিরে
বাঁশির ধ্বনি শুইনে আমি হইলাম উদাসীরে ॥
শুনিয়া তোমার বাঁশির ধ্বনি জল ভরিতে আসি আমি
ঘরে আছে কাল ননদী আমায় বানায় দোষীরে ॥
মনে লয় শ্রীচরণে হৈতাম তোমার দাসীরে।
কাল ননদীর ভয়ে মোর প্রাণটি কাঁপে থরে থরে
বলে ছলে জল ঢালিয়া কাংকে লই কলসীরে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে তুমি কি আর জান নারে
ওরে তুমি বিনে প্রাণ বাঁচে না তুমিই বিশ্বাসীরে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৬৭)

১০

শ্যাম তোমারে করি মানা মোহন বাঁশি বাজাইও না
সন্ধ্যাকালে বাজিয়ে বাঁশি নারীর মন করলায় উদাসী
তুমি পুরুষকুলে জন্ম নিয়া নারীর বেদন বুঝ না ॥
রাত্র নিশি দিবাকালে বাঁশি বাজায় রাধা বইলে
আমি ঘুমের ঘোরে চমকি উঠি কান্দি ভিজাই ফুল বিছানা ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে রাধা বলে বাঁশি বাজে
আমি পুরুষ হয়ে যেতে পারি নারী হয়ে দেয় যন্ত্রণা ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৬৮)

১১

শ্যামরূপে হেরিলাম তরুমূলে
যমুনার কাল জলে সৌদামিনী জ্বলে।
কী সুন্দর মাধুরিয়া কেমন সুন্দর বদন চন্দ্রিমা
শ্যামরুপের নাই কোন তুলনা জগত মণ্ডলে।
শ্যামরূপে জ্বলে আঁখি বাইর হল পরান পাখি
তবুনা ধরিতে পারি সময় যায় নানা ছলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে না জানি কি আছে ভালে
লেখছে বিধি রাইমনে যে আগুনে হিয়া জ্বলে ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৬৮)

১২

আমায় পাগল করল শ্যাম কালিয়া রূপে আমায়
কুক্ষণে জল ভরতে গেলাম, বিজলী চটকে শ্যাম নয়নে হেরলাম
আমার অঙুলে হিলাইয়া শ্যামে কি বলিল গো ॥
হায় বিধি যদি পাখা গো দিত;
উইড়া গিয়া দেখতাম শ্যাম জীবনের মত
আমার শ্যামের সঙ্গে দেখা যদি না হইল গো।

ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জন্ম যায় বিফলে
এবার আমার মনের ব্যাথা মনে রইল না ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫৭)

১৩

আমার নিত্যি জলে যাইতে হয়
জল ভারা তো সহজ ব্যাপার নয়
জল ভরা যেমন তেমন যন্ত্রণাটি সইতে হয় ॥
যখন আমি যাইগো জলে, সে থেকে তো আড়ে আড়ে
সে যে আড়াল থেকে তীর মারিল গো সই
ও আমার কলসীখানা ছিদ্র হয় ॥
যখন জল লইয়া আসি ননদীয়ে কয়
তুমি কি করিয়া কলসী ভাঙলায়
হাতে ছিল থালাবাটি ঠেস লাগিয়া ছিদ্র হয় ॥
ভাইবে রাধারমণ কয় কৃষ্ণপ্রেমে অঙ্গ দয়
কৃষ্ণ দরশনে রাধার জলে যাইতে হয় ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৫৭)

৩.২ রাধারমণের গানের সুরবৈচিত্র্য

বৈষ্ণব কবি রাধারমণের গান বাংলা লোকসংস্কৃতি তথা লোকসংগীতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লোকসংস্কৃতি বা লোকসংগীতের মধ্যেই আছে দেশজ ঐতিহ্য, মাটির সুর, মাটির গন্ধ, সহজাত রূপ। শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিশিলীত ঘরনার বাইরে লোকসংগীতের ঘরনাটি বেশ অপরিশলীত হলেও এই রূপের মধ্যেই থেকে যায় প্রকৃতির প্রকৃতরূপ, স্বতঃস্ফূর্ততা। শিল্পের এই মাত্রাটুকু ছুঁতেই আলোচনা করব বৈষ্ণব কবি রাধারমণের গানের সুরের বৈচিত্র্য নিয়ে।

আমরা জানি মধ্যযুগে গ্রামীণ জীবনে শিক্ষা লাভের প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তাই মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করত গুরুগৃহে। ধর্মশিক্ষার জন্য যে সকল পৌরাণিক গ্রন্থ রচিত হত তা মাতৃভাষায় রচিত না হওয়ায় সেগুলো সাধারণ লোকায়ত মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যেত। তখন লোকসাধক, লোককবিগণ বিভিন্ন

উৎসব পার্বনকে কেন্দ্র করে ঐ সকল ধর্মীয় বিষয়কে আশ্রয় করে গান রচনা করতেন; এবং নিজেরাই তাতে সুর সংযোজন করতেন। সে সুরে প্রকাশ পেত বাংলার রূপ মাধুর্য, প্রকাশ পেত ভক্ত হৃদয়ের প্রেমাকুতি। এসকল মহাজন সাধকের গানের সুরে ফুটে ওঠে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতি প্রেম নিবেদনের নিদর্শন। আবার সে সুরে কখনো প্রকাশ পায় লৌকিক মানব-মানবীর প্রেমের মধুর বা করুণ চিত্র। লোকসাধকগণ এসকল গানে যুক্ত করেন বাংলা লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার সুর। যেমন—বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সারি বিচ্ছেদী, ঝুমুর ইত্যাদি। বৈষ্ণব কবি রাধারমণের গানের সুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর গানের সুরের প্রভাব রয়েছে বাংলা লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার সুরের মধ্যে। রাধারমণের সংগীত ধারায় মিশে আছে প্রাচীন অপার্থিব রসধারার গীতিসুধা। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিসার, মিলন বিরহের সুরের সন্নিবেশ ঘটেছে এখানে। এতে কাব্য ও সুর পরস্পরের পরিপূরক। তাঁর গান সাধক গোষ্ঠীর মধ্যে অনুশীলিত অধ্যাত্ম গান। এ গানের সুর এককভাবে গীত হওয়ার জন্য রচিত বৈচিত্র্যপূর্ণ সুর, যেখানে গানের ভাবকে গুরুত্ব দিয়ে লোকসুরের পাশাপাশি হালকাভাবে রাগের ছায়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

রাধারমণের গানের সুরের ক্ষেত্রে রাগরাগিনী নয় ভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলার প্রচলিত লোকসুর ব্যবহার করা হলেও তা ভাবের উপর নির্ভরশীল। এসকল গানের সুরের ক্ষেত্রে প্রচলিত নির্দিষ্ট কোন সুর বা নির্দিষ্ট রাগের দাসত্ব করা হয়নি। বরং গানের বাণী ভাবের উপর নির্ভর করে সুর এগিয়ে গিয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। সংগীতর সুরের বিষয়ে বাণীর সাথে ভাবের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা স্বয়ং কবিগুরুরাও বলেছেন :

> রাগরাগিনীর শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যে ভাব প্রকাশ করা। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিনীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগরাগিনীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সে রাগরাগিনী আজ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানেকড়া বজায় আছে কি না; আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ যে, তাহার নিকটে অমনতরো অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি স্থূল বিশেষে মাধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় কিম্বা মন্দ শুনায় না, আর তাহাতে বর্ণীয় ভারের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুণ, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন—আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমন কি ঘুষ খাইয়াছি যে তাহার এত গোলামী করিতে হইবে ? আজকাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদঘর্ম হইয়া গান শুরু করেন, তখন সর্বপ্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া টিপিয়া ধরে ও ভাব বেচারীকে এমন করিয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ ছাড়ান যে সহৃদয় শ্রোতা মাত্রেরই বড় কষ্ট

বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে প্রভেদ উপরিউক্ত ওস্তাদের সহিত আর একজন ভাবুব গায়কের সেই প্রভেদ। কোন্ কোন্ রাগরাগিনীতে কী কী সুর লাগে-না লাগে তাহাতো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে। তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না, এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কী কী রাগিনীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। (ঠাকুর, ২০১৬ : ৬-৭)

সুর সংযোজনের ক্ষেত্রে বাংলা লোক সাধকগণ সচেতনভাবেই ভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ জন্যই বাংলা লোকসংগীতে অঞ্চল ভেদে গানের সুরের এতে বেশি বৈচিত্র্য। ভাটিয়ালি গান যেমন আধ্যত্মরসে পরিপূর্ণ তাই মানুষের জীবন সায়াহ্নে এসে বোধের উদয় হয়; সেই বোধের ভাবের প্রকাশ ঘটে ভাটিয়ালি গানের সুরে। এজন্যই ভাটিয়ালি গানের সুরের গঠন লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই সুরে দীর্ঘ টান এবং সুরে থাকে অবসরের চিহ্ন। এ গানের সুরে নেই কোন চটুলতা, বরং আছে জীবনবোধের অনন্য প্রকাশ। আবার ভাওয়াইয়া গানের সুরে চটুলতা, বিরহ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। গানের সুরে ভাজ থাকে, কারণ মৈশাল বা গাড়িয়াল যে পথে যায় তাতে উঁচু-নিচু ও ভাঙ্গা থাকে, যার কারণে এসব গানের সুরে এমন ভাজ লক্ষণীয়। এভাবে বাংলা লোকসংগীতের প্রতিটি ধারার দিকে লক্ষ্য করলে সুরের বৈচিত্র্য মিলবে।

তবে বাংলা লোক সাধক বা মহাজনীর গানের সুর সম্পূর্ণ বাণীর ভাবকে কেন্দ্র করে হয়। সেই ভাব নির্ভর গানে সুরে কখনো কখনো বিভিন্ন রাগরাগিনীর প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরক্ষ প্রভাব থাকে। তবে গানের বাণী অনুযায়ী যে ভাবের সঞ্চার হয়, সে অনুযায়ী সুর হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, রাধারমণদত্ত ও লালনের গান বিশ্লেষণ করতে চাই। যেহেতু গানের সুর বিশ্লেষণ করা হবে আকারমাত্রিক স্বরলিপি দিয়ে তাই আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা প্রয়োজন।

৩.২.১ আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

স্বর

১) শুদ্ধ স্বর : স র গ ম প ধ ন

২) বিকৃত স্বর : কোমল র = ঋ, কোমল গ = জ্ঞ, কড়ি বা তীব্র ম = ক্ষ, কোমল ধ = দ এবং কোমল ন = ণ

সপ্তক

১) উদারা বা মন্দ্র সপ্তক : স্বরের নিচে হসন্ত চিহ্ন (্) থাকে। যথা-স্, র্, গ্, ম্, প্, ধ্, ন্

২) মুদারা বা মধ্য সপ্তক : স্বরের উপরে বা নিচে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা- স, র, গ, ম, প, ধ, ন

৩) তারা বা তার সপ্তক : স্বরের মাথায় রেফ্ চিহ্ন (র্)থাকে। যথা- র্স, র্র, র্গ, র্ম, র্প, র্ধ, র্ন

মাত্রা

একটি মাত্রা = ।। যথা- সা, রা ইত্যাদি। অর্ধ মাত্রা - : যথা- সঃ, রঃ ইত্যাদি। দু'টি অর্ধ মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা- সরা, রগা ইত্যাদি। তিনটি এক-তৃতীয়াংশ মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা- সরগা, রগমা ইত্যাদি। চারটি সিকি মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা- সরগমা, রগমপা ইত্যাদি। এইরূপ এক মাত্রার মধ্যে যতগুলি স্বরই উচ্চারিত হোক না কেন, যথা- সরগমপধা ইত্যাদি, প্রত্যেক স্বরই সমান অংশে বিভক্ত। দু'টি সিকি মাত্রা মিলে এক অর্ধ মাত্রা। যথা- সরঃ, রগঃ ইত্যাদি। একটি অর্ধ মাত্রা ও দুটি সিকি মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা- সঃরগঃ, রঃগসঃ ইত্যাদি। একটি দেড় মাত্রা ও একটি অর্ধ মাত্রা মিলে মোট দু'মাত্রা। যথা- সাঃ রঃ, রাঃ সঃ ইত্যাদি।

তাল বা গ্রহের চিহ্ন

মাত্রা সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছ বা পদে বিভক্ত। প্রত্যেক গুচ্ছ বা পদের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে +, ১́, ০, ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি চিহ্ন ও সংখ্যা বিভিন্ন তালাঙ্ক নির্দেশ করে। যোগ '+ বা ১́' চিহ্নে সম্ ও শূন্য '০' চিহ্নে ফাঁক বুঝতে হবে।

প্রতি তাল বিভাগের পর ছেদ চিহ্ন বা এক-একটি দাঁড়ি (।) বসে। এবং তালের প্রতি আবর্তনের শুরুতে ও শেষে একটি করে দণ্ড (।) বসে। গানের স্থায়ীতে ও প্রায় প্রত্যেক কলির আরম্ভে যুগল দণ্ড (।।)বসে। কিন্তু কোন কলির শেষে স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন না হলে উক্ত কলির শেষে ও তার পরবর্তী কলির শুরুতে দুটি দণ্ডের স্থলে শুধু একটি করে দণ্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয়, সেখানে দুটি জোড়া দণ্ড (।। ।।)বসে।

বিবিধ

- স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন স্বরূপ দুটি করে দণ্ড বসে। কোন কলির শেষে যুগল দণ্ড (||)এবং সর্বশেষ দুটি জোড়া দণ্ড (|| ||) থাকলেই স্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে, সেখান থেকে আরম্ভ করতে হবে।
- স্থায়ী আরম্ভে যুগল দণ্ডের (||) বাইরে গানের অংশ গান আরম্ভ করে একবার মাত্র গাইতে হয়। কেননা প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু " " এইরূপ উদ্ধৃতি চিহ্নের দ্বারা পুনঃপুনঃ লিখিত হয়ে থাকে।
- কোন স্বরের শিরোদেশে যুগ্ম-দাঁড়ি, যথা-সা থাকলে, সেখানে থেমে গানের অন্য কলি ধরতে হবে এবং গান শেষ করার সময় এখানে শেষ করতে হবে।
- গুম্ফ-বন্ধনী ({ }) চিহ্ন থাকলে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। যথা । {সা রা গা মা} । এখানে সা রা গা মা-এই চারটি স্বর দুবার গাইতে হবে। পুনরাবৃত্তিকালে বক্র-বন্ধনী '( )' কতকগুলো স্বর বাদ দিয়ে যাওয়ার চিহ্ন যথা- । {সা রা (গা মা) } । । এখানে পুনরাবৃত্তিকালে গা ও মা বাদ যাবে।
- পুনরাবৃত্তিকাল কোন সুরের পরিবর্তন হলে তা নিম্নোক্ত দুপ্রকারে লিখিত হয় :
  (ক) শিরোদেশে '[ ]' এই সরল-বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলো লিখিত হয়ে থাকে। [ন্ সা]
  যথা- । {সা রা গা মা } । । এখানে প্রথমবারে সা রা গা মা এবং দ্বিতীয়বারে সা গা মা গাইতে হবে।
  (খ) বক্র-বন্ধনীস্থিত সুরের পরিবর্তন হলে তা বক্র-বন্ধনীর পরে লিখিত হয়।
  যথা- । {সা রা (গা মা) } । মা পা । । এখানে প্রথমবারে সা রা গা মা এবং দ্বিতীয়বারে সা রা মা পা গাইতে হবে।
- কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সবশেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে '[ ]' এই সরল বন্ধনী থাকলে, যথা- । [ ] । , || [ ] || ; স্থায়ীতে ফিরে এই সরল-বন্ধনীস্থিত পরিবর্তিত সুর গাইতে হবে।
- যখন একটি বা একাধিক স্বর বিরামহীনভাবে গাওয়া হয়, তখন সেই মাত্রা বা স্বরগুলোর বাম পার্শ্বে হাইফেন '-' চিহ্ন বসে। স্বরের নিচে গানের বাণী না থাকলে গানের পঙ্‌ক্তিতে শূন্য '০' দেওয়া হয়। যথা–

সা । । । অথবা সা রা গা মা

মা ০ ০ ০ গা ০ ০ ০

একই স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারিত হলে সেই স্বরের বাম পার্শ্বেও হাইফেন '-' চিহ্ন বসে। যথা–

সা সা রা রা অথবা সা সা রা রা

মা ০ ০ ০ গা ০ ০ ন্

- যখন লয় অব্যাহত রেখে এক বা একাধিক মাত্রায় সুরের স্তব্ধতা দেখাতে হয়, তখন সেই মাত্রা বা মাত্রাগুলোর বাম পার্শ্বে হাইফেন '-' বসে না এবং গানের পঙ্‌ক্তিতে কোন শূন্যও বসে না। যথা–

| সা । । ।| । । । । |

যা য়্

- স্পর্শ স্বর : কোন মূল স্বরের পূর্বে যদি কোন আনুষঙ্গিক স্বর নিমেষকাল স্পর্শ করে মাত্র, তা হলে সে-স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে মূল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়। যথা– ^{গ}সা, ^{ম}রা, ইত্যাদি মূল স্বরের পরে যদি কোন আনুষঙ্গিক স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে, তা হলে সে-স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে ডান পার্শ্বে লিখিত হয়। যথা– রা^{স}, সা^{গ} ইত্যাদি।
- মীড় : কোন একটি স্বর হ'তে অন্য আর একটি স্বরে বিশেষরূপে গড়িয়ে যাওয়াকে মীড় বলে। মীড়ের চিহ্ন–

'⁀' অথবা '‿'। যথা– গা ⁀ সা অথবা সা ‿ মা ইত্যাদি। (চক্রবর্তী, ২০২০ : ১৩)

গানের ভাবের উপর নির্ভর করে বাউল সাধক, বৈষ্ণব সাধকগণ কিভাবে গানের সুর সংযোজন করেন তা মহাত্মা লালন সাইজীর বিখ্যাত একটি গানের সুর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরব। গানটি দেহতত্ত্ব পর্যায়ের গান। তাই দেহতত্ত্ব গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান হলো মানবদেহের মাঝে পরমাত্মাকে খুঁজে বের করা। দেহের মাঝে যে আট কুঠুরি, নয় দরজা আছে সে সম্পর্কে জানা। যেমন :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায় ॥

আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা, মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা, আয়না মহল তায় ॥
কপালের ফের নইলে কি আর, পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ছেড়ে পাখি আমার, কোন ফাকে পালায় ॥
মন তুই রইলি খাঁচার আশে, খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে
কোন দিন খাঁচা পড়ব খসে, লালন ফকির কয় ॥

(মাননান, ২০১০ : ৭৪২)

গানটির স্থায়ী অংশের বাণীর অর্থ হলো—মানবদেহের ভিতরে যে আত্মা বা প্রাণপাখি তা এই মাবন কুঠুরি ভেদ করে কি রূপে আশা যাওয়া করে। মানুষের শরীর থেকে যখন এই প্রাণ পাখি উড়ে যায় তখন শূন্য খাঁচা মৃত দেহ হয়ে পড়ে থাকে। এই আত্মাকে মানুষ চাইলেই জোর করে পুষে রাখতে পারে না। সে আফসোসও সাধক তাঁর গানে স্থায়ীতে বর্ণনা করেছেন।

এবার আসা যাক, স্থায়ী অংশে ভাবনুযায়ী কী করে সুরাপিত হয়েছে সে বিষয় নিয়ে। সাধক এখানে নিজ আত্মার কাছে নিজেই প্রশ্ন করেছেন মানবদেহে আত্মা কীরূপে আসে যায়? তা কি আদৌ ধরা সম্ভব ? সম্ভব হলে তা হৃদপিঞ্জরে বন্দি করে সাধের দেহে করে রাখাতাম। যেহেতু নিজের কাছে সাধক প্রশ্নের বিষয় আত্মবিশ্বাসী, স্থীর তাই গানের স্থায়ী অংশের প্রথম লাইনের সুর মুদরা অংশের রা জ্ঞা রা সা দিয়ে শুরু আবার স্থায়ীর পরের লাইনে আফসোসের সাথে পাখিকে বন্দির চেষ্টা তাই সুর সেখানে পা মা পা র্সা হয়ে আস্তে আস্তে তারা সপ্তকের দিকে গিয়েছে; এবং যখন তা বৃথা চেষ্টায় পরিণত হচ্ছে তখন সুর কোমল ণা ধা পা মা গা রা হয়ে আবার মুদারূপ ফিরছে। অর্থাৎ সুর ফিরে এসে নিজ আত্মায় লীন হয়ে মিশে যাচ্ছে।

ঠিক একইভাবে গানের ভাব অনুযায়ী মানুষের শরীর ও মনের অবস্থার প্রকাশ ঘটে গানের অন্তরার সুরে। 'মন তুই রইলি খাঁচার আশে' মানবদেহে যে ঠুনকো কাঁচা বাঁশের, সেই সেই আত্মদর্শন সুরেও ফুটে ওঠে। একইভাবে গানের ভাব অনুযায়ী সুরের চলন হয়। ঠিক একই বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

> মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে আমাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ। আমাদের মনের ভাব বেগবান হইলে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়, নাহিলে অপেক্ষাকৃত মৃদু থাকে। উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে। সচারচর সামান্য

বিষয়ক কথোপকথনে তেমন সুর থাকে না। বেগবান মনে ভাবে সুর আসিয়া পড়ে। রোষের একটা সুর আছে, খেদের একটা সুর আছে, উল্লাসের একটা সুর আছে। (ঠাকুর, ২০১৬ : ২-৩)

বৈষ্ণব কবি রাধারমণের গানের সুর বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোন কোন গানে ভাবের সাথে মিলিয়ে যুক্ত হয়েছে বাংলার প্রচলিত লোকসুর। যেমন—ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বিচ্ছেদী ইত্যাদি। আর বেশির ভাগ গানের সুর হয়েছে ভাবকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মাহত্ম্য। তাই এগানের সুরের পাঁচ রসের সমাহার রয়েছে। যথা : শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস, মধুররস। জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশে যাওয়ার আকুতি গানের সুরে প্রকাশিত হয়। তাই রাধারমণের গানের সুরে বিরহের মাঝেও সুখ, আবার সুখের মাঝেও বিরহ মিলেমিশে একাকার। এ গানে ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে সুর করা হলেও কখনো কখনো মিশ্র শাস্ত্রীয় রাগের আবরণ লক্ষ করা যা। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় রাধারমণের মধুররসে সিক্ত অনুরাগ পর্যায়ের একটি গানের সুরবৈচিত্র্য তুলে ধরা হলো :

শ্যাম দেও আনিয়া বৃন্দে গো, বৃন্দে শ্যাম দেও আনিয়া
আমার মন প্রাণ আখি জুরায়, কার মুখ পানে চাই গো বৃন্দে ॥
সারা নিশী শয্যা পাতি গো, কান্দি সেবার জিনিস লইয়া ॥
কত চিন্তার রাজার বইসা আছে আমার, হৃদয় ও জুরিয়া গো বৃন্দে...
নারী জাতি অল্পমতি গো, ভুলায় শ্যামের বাঁশি দিয়া
এগো কোন বিধাতা বন্ধের আত্মা, গড়ছে পাশান দিয়া গো বৃন্দে...
ভাইরে রাধারমণ বলে গো বৃন্দে, মনরে ভাবিয়া
এ জনম গেল রাধার কান্দিয়া কান্দিয়া গো বৃন্দে।
(বাগচী, ২০১৩ : ২৮৫-২৮৬)।

গানটি যেহেতু মধুররসে সিক্ত তাই গানের বাণীতে ভক্তকে প্রেমিকা রূপে অর্থাৎ রাধার মনের আকুতি ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়। সেই সাথে বৈষ্ণব রীতি অনুযায়ী গানটি অনুরাগ পর্বের। আমরা জানি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় পূর্বরাগের পরে আসে অনুরাগ। যেখানে প্রেমিক প্রেমিকার সাক্ষাৎ বা স্বপনের মাঝে দর্শন ঘটে। পরবর্তীকালে আবার কৃষ্ণ দর্শনের জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে শয্যা সাজিয়ে। তাই এ গানের স্থায়ী অংশের সুরে শান্ত ভাব এবং গানের সুর হয় উদাবার না থেকে। যেখানে স্বরের চলন হয় ণ সা সা সা, সা রা জ্ঞ সা

হয়ে। এখানে স্থায়ী অংশের দ্বিতীয় লাইনের বাণীর ভাবেই প্রকাশ পা এক অসাসার পবিত্র অনুভূতির। যেখানে ভক্ত তার আরধ্য দেবতার রূপ দেখে প্রশান্তি লাভ করে, তনু মন শীতল করে তাই সুরের চলন থাকে মৃদাবায়। সা সা সা সা হয়ে রা মা কোমল ণ হয়ে কোমল জ্ঞ হয়ে আবার সা তেই ফিরে আসে।

অন্তরাতে গানের বাণীর ভাবানুযায়ী ভক্ত শ্রীমতি রাধা তার আরাধ্য দেবতাকে পাওয়ার আশায়। সারা নীশি শয্যা অপেক্ষোর কথা বর্ণনা করেছে। একই সাথে প্রাণনাথকে সেবার বাসনাও প্রকাশ করেছে। তাই গানের সুরে শান্ত রসের প্রকাশ ঘটেছে; গানটি স্বরলিপি দ্বারা সুর তুলে ধরলে তার প্রমাণ মিলবে :

স্থায়ী

	+				০											
‖	ণ	সা	মা	সা	|	সা	রা	জ্ঞ	সা	|	রা	মা	জ্ঞ	রা	|	রা	রা	জ্ঞ	রাস	|
	শ্যা	ম	দা	ও		আ	নি	য়া	০		বৃ	ন	দে	গো		বৃ	ন	দে	০		
|	সা	রা	ণা	সা	|	সা	রা	সা	সা	|	সা	সা	সা	সা	|	মা	রা	মা	ম	|
	শ্যা	ম	দা	জ্ঞ		আ	নি	য়া	০		আ	মা	র	০		ম	ণ	প্রা	ণ		
|	পা	ণা	ধা	পা	|	পা	মা	মা	মা	|	মা	ম গা	রা	স	|	রা	মা	জ্ঞ	রাস	|
	আ	খি	জু	রা		য়	কা	র	মু		খ	পা	নে	০		চা	ই	য়া	গো		

অন্তরা

	+				০											
‖	ধা সা	সা	মা	সা	|	সা	রা	সা	জ্ঞ	|	রা	রা	রা	মা	|	মা	জ্ঞ	রা	সা	|
	সা	রা	নি	শি		শ	য্যা	পা	তি		গো	০	কা	ন		দি	০	০	০		

| সা রা র ণ | সা সা সা সা | সা সা সা সা | মা রা মা ম |
| সে বা র জ্ঞ | নি স ল ই | আ মা র ০ | ম ণ প্রা ণ |

| মা মা পা পা | ণা ধা ণা পা | ধা ধা পা মা মা | গা রা সা রা মা |
| জা র ব ই | সা আ ছে আ | মা র হৃ দ | য় জু রি য়া |

| জ্ঞ রা সা া ||
| গো ০ ০ ০ |

(আলম, ২০২৫)

৩.২.২ রাধারমণের গানে বিচ্ছেদী সুরের প্রভাব

রাধারমণের গানের সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণে এবার আলোচনা করা যাক বিরহ-বিচ্ছেদ বিষয়ক গান নিয়ে। বিচ্ছেদী গান বলতে বোঝায়– প্রিয় বিচ্ছেদ ভারতীয় শোকার্ত অনুভূতির প্রকাশ। এ গানে মূলত নায়ক-নায়িকার বিরহ-যাতনার কথাই প্রকাশ পায়। হিন্দু মিথলজি অনুযায়ী বিচ্ছেদী গানের অধিকাংশই রাধা কৃষ্ণের কাহিনির মোড়কে ঢাকা। তেমনি বৈষ্ণবীয় ভাবনায় তো তা অনস্বীকার্যভাবেই। তবে রাধারমণের বিচ্ছদী গান লৌকিক জীবনের রাধা এবং কৃষ্ণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এলক্ষ্যে সামগ্রীকভাবে বিরহ বা বিচ্ছেদী গানের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হলো :

১. বিরহ বা বিচ্ছেদী গানের সুরের নিজস্ব একটি নকশা আছে,
২. এ গান মূলত একক কণ্ঠের গান,
৩. এ গান অনেক সময় তালহীন হয়,
৪. সমস্ত বিরহী আত্মার অন্তর্লীন বিরহ অনুভবের প্রকাশ,
৫. দীর্ঘ এবং স্থীর লম্বা সুরের প্রভাব,
৬. এ সকল গানের সুরে বিরহভাবরে অশ্রুভারাক্রান্তের আবেগের সন্নিবেশ ঘটে,
৭. এ গানে সুর যেমন প্রলম্বিত তেমনি গানের স্তবকের শেষে 'রে' উচ্চারণ দিয়ে হৃদয়ের হাহাকার বা না ছেড়ে যাওয়ার আকুতি প্রকাশ পায়।

এ পর্যায়ে রাধারমণের একটি জনপ্রিয় গানের সুর বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

ভ্রমর কইও গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া
ভ্রমর রে না খায় অন্ন না খায় জল
না বান্ধে কেশ
ঘর ছাড়া হইল যেমন পাগলিনী বেশ ॥
ভ্রমর রে...
আগে যদি জানতাম ভ্রমর, যাইবারে ছাড়িয়া
মাথার কেশ থুইতাম করি রাখিতাম বান্ধিয়া ॥
কইও কইও কইও ভ্রমর কৃষ্ণরে বুঝাইয়া
মুই রাধা মইরা যাইমু কৃষ্ণ হারা হইয়া রে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনরে কালিয়া
নিভ্যা ছিল মনের আগুন কে দিল জ্বালাইয়া ॥

গানের বাণীর ভাবানুযায়ী এবং বাংলা লোকসংগীতে বিচ্ছেদী গানের সুরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গানটির সুর সংযোজিত হয়েছে। তাই গানটির স্থায়ী অংশের সুর শুরু হয়েছে সরল চলনে। স্বর বিশ্লষণ করলে দেখা যায় বা মা গা দিয়ে। এবং বিচ্ছেদের অনলে শব্দটির সুরের স্বর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মা -া -া -া, মা পা ধা ণা পা ধা ধা -া -া ধা ণা ধা থেকে পা মা পর্যন্ত স্থীর লম্বা টান। যা বিচ্ছেদী গানের বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করেছে। গানটির পুরো স্বরলিপি তুলে ধরা হলো গানের সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণের জন্য :

তাল : কাহারবা

ভ্রমর কইয়ো গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া
ভ্রমর রে না খায় অন্ন না খায় জল
না বান্ধে কেশ
ঘর ছাড়া হইলে যেমন পাগলিনী বেশ ॥
ভ্রমর রে আগে যদি জানতাম ভ্রমর
যাইবারে ছাড়িয়া
মাথার কেশ দু'ভাগ করি রাখিতাম বান্ধিয়া ॥
কইও কইও কইও ভ্রমর কৃষ্ণরে বুঝাইয়া
মুই রাধিকা মইরা যাইমু কৃষ্ণ হারা হইয়া ॥
ভাইবে রাধা রমণ বলে শুনরে কালিয়া
নিভ্যা ছিল মনের আগুন কে দিল জ্বালাইয়া ॥

+ ০

|| রা মা া গা | মা গা া া | রা গা রা সা | া া া া |

ভ্র ম র কই ও ০ ০ ০ গি য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০

| রা মা া মা | মা া া া | মা মা া ধা | ণা পধা ধা া |

শ্রী কৃ ষ্ ন বি ০ ০ ০ ছে দে র অ ন ০০ লে ০

| া া ধণা ধা | পা মা া া | মা া পা মা | মা পা ধা া |

০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ঙ গ যা য় জ্ব লি য়া

| ধা ণা ধা ধা | ধপা মা া া | পা মা মা মা | গা রা রা মা |

য়া রে ০ ভ্র ম র ০ ০ ক ই ০ ও ০ ০ গি য়া

| গা রা া রা ||

০ ০ ০ ০

| া া মা পা |

০ ০ ভ্র মর

|| ধা া া া | ধণা ধা পধা পা | মা া মা ধপা | পমা মা মা া |

রে ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ আ ০০ গে০ য দি ০

| মপা মা গা রা | া রা রমা গা | রা সা া সা | রা মা গা মা |

জান ০ তাম রে ০ ভ্র ম০ ০ ০ র ০ যাই বা রে ছা ০

| রগা রা রা া | া া া া | রা মা মা মা | া া া া |

ড়ি০ ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ মা থার কে শ ০ ০ ০ ০

| মা পা ধা ধণধা | পা া া া | পণধা পা মা া | মা পা মা া |

দুভাগ করি০০ ০ ০ ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ রা খি তা ম

| পা ধা া ধা | ণা ধা ধা ধা | পা া মা া | পা মা মা া |

বান ধি ০ য়া রে ০ ভ্র ম ০ ০ র ০ ক ই ও ০

| রা রা া মা | গা রা া া ||

০ গি ০ য়া ০ ০ ০ ০

| া া মা পা |

০ ০ ভ্র মর

|| ধা া া া | ধণা ধা পধা পা | মা া মা ধপা | পমা মা মা া |

রে ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ক ০ই ও০ ক ই ও

| মপা মা গা রা | া রা রমা গা | রা সা া সা | রা মা গা মা |

ক০ ই ও রে ০ ভ্র ম০ ০ ০ ০ ০ কৃষ্ ন রে বু ০

| রগা রা রা া | া া া া | রা মা মা মা | া া া া |

ঝাই য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ মুই রা ধি কা ০ ০ ০ ০

মা	পা	পা	ধণধা	পা	া	া	া	পণধা	পা	মা	া	মা	পা	মা	া
মই	রা	যাই	মু০০	০	০	০	০	০০০	০	০	০	কৃষ্	ন	হা	০

পা	ধা	া	ধা	ণা	ধা	ধা	ধা	পা	া	মা	া	পা	মা	মা	গা
রা	হ	ই	য়া	রে	০	ভ্র	ম	০	০	০	০	ক	ই	ও	০

রা	রা	া	মা	গা	রা	া	া
০	গি	০	য়া	০	০	০	০

া	া	মা	পা
০	০	ভ্র	মর

ধা	া	া	া	ধণা	ধা	পধা	পা	মা	া	মা	ধপা	পমা	মা	মা	া
রে	০	০	০	০০	০	০০	০	০	০	ভা	০ই	বে০	রা	ধা	০

মপা	মা	গা	রা	া	রা	রমা	গা	রা	সা	া	সা	রা	মা	গা	মা
র০	০	ম	ন	০	ব	লে০	০	০	০	০	শু	ন	রে	কা	০

রগা	রা	রা	া	া	া	া	া	রা	মা	মা	মা	া	া	া	া
লি০	য়া	০	০	০	০	০	০	নি	ভ্যা	ছি	ল	০	০	০	০

মা	পা	া	ধা	পা	া	া	া	পণধা	পা	মা	া	মা	পা	মা	া
জ্বা	লা	ই	য়া	০	০	০	০	০০০	০	ন	০	কে	দি	ল	০

পা	ধা	া	ধা	ণা	ধা	ধা	ধা	পা	া	মা	া	পা	মা	মা	া

জ্বা লা ই য়া রে ০ ভ্র ম ০ ০ র ০ ক ই ও ০

। রা রা া মা । গা রা া া ॥

০ গি ০ য়া ০ ০ ০ ০

(চক্রবর্তী, ২০২০ : ১৮০)

স্বর বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাগের প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখানো হলো। রাধারমণের বিচ্ছেদী অঙ্গের গানের সুরের বৈচিত্র্যতা আরো বেশি পরিস্কারভাবে তুলে ধরার জন্য অন্য আর একটি বিচ্ছেদী গানের স্বরলিপিসহ গান তুলে ধরা হলো :

তাল : কাহারবা

আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে।
আমার হার পরে আর কি ফল হবে সখি,
প্রাণ বন্ধু নাই ব্রজেতে ॥
গলার হারে কি আর শোভা আছে,
যার শোভা তার সঙ্গে গ্যাছে গো।
এখন বন্ধুর নামে মালা গেঁথে সখি দেনা আমার গলেতে ॥
প্রাণের বন্ধু যদি আসে দ্যাশে,
বলিস তোরা বন্ধুর কাছে গো।
ও রাই, কৃষ্ণ বিনা, প্রাণ কেঁদেছে সখি যমুনার ঐ জলেতে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে
বড়ই দুঃখ রইলো মনে গো
নেও গো রাধা, মণিমালা পরাইও বন্ধের গলেতে ॥

[রসা সা ॥ সা গরা রা গা । া গা পগমা গরা । সা সাসগা গা । গপা মগা রসা া ।
॥ আ মার া গ ০ লা ০ ০ র হা০ ০০ রা ০ র্ খু০ লে । নে০ ০০ ০০ ০

। সা রা সণা ধা । ধা সা সগা গরা । সা রা সা া । া া া া }।
ও ০গো০ ০ ০ ০ ল০ লি০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। া মপা পা পা । া পা পা ধণা । পা ধা ণা পধা । া া া ধর্সা ।
০ আ০ মা র্ ০ হা র্ প০ রে আ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০

ণা	ধণা	ধা	পা	।	৷	পা	৷	ধণা	।	ধণধ ৷	ধপা	পধা	পমা	।	মপা	মা	গমা	গা	।
০	০০	০	র্		০	কি	০	ফল		হ০০	বে০	স০	খি০		প্রা০	ণ্	ণ্ব০	ন্	

রগ ৷	মগা	রা	সা	।	৷	৷	সগা	গা	।	গপা	মগা	রসা	৷	।	৷	৷	৷	।
ধু০	০০	না	ই		০	০	ব্র০	জে		তে০	০০	০০	০		০	০	০	০	

সা	রা	সণ্	ধা	।	ধা	সা	সগা	গরা	।	সা	রা	সা	৷	।	৷	৷	৷	৷	॥
ও	০গো০		০		০	০	ল০	লি০		তে	০	০	০		০	০	০	০	

{	৷	৷	গা	গমা	।	পা	পা	মাগমগা	।	৷	রসা	সা	৷	।	৷	সা	সা	গরা
	০	০	গলা০			০	র্	হারে০০		০ কি০		আ	০		০	র্	শো	ভা

মা	মা	মা	পা	মপাপা	গা	৷	৷	।	গপা	মগা	রসা	৷	সা	গরা	গা	গমগা
০	আ	ছে	০	০০০	০	০	০		০০	০০	০০	০	০	০	০০০০	

রগ ৷	সরা	সা	৷	।	৷	৷	৷	৷	।	৷	৷	সগা	গা	।	৷	মা	গমগা	রসা	।
০০	০০	০	০		০	০	০	০		০	০	যার্	শো		০	ভা	তা০০	০র	

সা	রা	সণ্	সা	।	ধা	সা	সগা	গরা	।	সা	রা	সা	৷	।	৷	৷}	মপা	পা	।
স	ং	গে০	০		০	০	গ্যা	ছে০		গো	০	০	০		০	০	এ০	খ	

৷	পা	পাধণা	।	ণা	পা	পধা	ণা	।	পধা	৷	৷	৷	।	র্সা	ণা	ধণা	ধা	।
০	ন	বন	ধু০		র্	না	মে০	০		০০	০	০	০		০	০	০০	০	

পা	পা	৷	ধণা	।	ধণধা	ধপা	পধা	পমা	।	মপা	মাগমগা	৷	।	রগা	মা	গা	রসা	।
০	মা		০লা০		গেঁ০০	থে০	স০	খি০		দে০	০না০০	০		আ০	০	০	মা০	

৷	সা	সগা	গা	।	গপা	মগা	রসা	৷	।	সা	রা	সণা	ধ্া	।	ধা	সা	সগা	গরা	।
০	র	গ০	লে		তে০	০০	০০	০		ও	০গো০		০		০	০	ল০	লি০	

সা	রা	সা	৷	।	৷	৷	৷	৷	॥
তে	০	০	০		০	০	০	০	

II { ৷ ৷ গাগমা ৷ পা পা মাগমগা I ৷ রসা সা ৷ ৷ ৷ সা গরা ৷
ও ও প্রাণে০ ও র্ বন্ধু০০ ও য০ দি ও ও ও আ সে

৷ মা মা মা পা ৷ মপমা গা ৷ ৷ ৷ পগা মগা রসা ৷ ৷ সা গরা গা গমগা ৷
ও দ্যা শে ও ০০০ ও ও ও ০০ ০০ ০০ ও ও ও ও ০০

৷ রগ ৷ সরা সা ৷ ৷ ৷ ৷ ৷ ৷ ৷ সগা গা ৷ আ মা গমগা রসা ৷
০০ ০০ ও ও ও ও ও ও ও ও বলি স্ ও তো রা০০ ০০

৷ সা রা সণ্ সা ৷ ধ্ সা সগা গরা ৷ সা রা সা ৷ ৷ ৷} মপা পা ৷
ব ন ধু০ ও ও র্ কা০ ছেদু গো ও ও ও ও ও ও০ রা

৷ ৷ পা পাধণা ৷ ৷ পা পধা ণা ৷ পধা ৷ ৷ ৷ ৷ র্সা ণা ধণা ধা ৷
ও ই কৃষ্ণ ন০ ও বী না০ ও ০০ ও ও ও ও ও ও ০০ ও

৷ পা পা পা ণা ৷ ধণধা ধপা পধা পমা ৷ মপা মাগমগা ৷ ৷ রগা মা গা রসা ৷
ও প্রা ণ কে দে০০ ছে০ স০ খি০ য০ ০মু০০ ও না০ ও র্ ঐ০

৷ ৷ ৷ সগা গা ৷ গপা মগা রসা ৷ ৷ সা রা সণ্ ধ্ ৷ ধ্ সা সগা গরা ৷
ও ও জ০ লে তে০ ০০ ০০ ও ও ০গো০ ও ও ও ল০ লি০

৷ সা রা সা ৷ ৷ ৷ ৷ ৷ II ৷
তে ও ও ও ও ও ও ও

II { ৷ গা গা গমা ৷ পা পা মা গমগা ৷ ৷ রসা সা ৷ ৷ ৷ ৷ সা গরা
ও ও ভা ইবে ও রা ধা ০০০ ও রম ণ ও ও ও ও ও

৷ মা মা মা পা ৷ মপমা গা ৷ ৷ ৷ গপা মগা রসা-া ৷ সা গরা গা গমগা ৷
ও ব লে ও ০০০ ও ও ও ০০ ০০ ০০০ ও ও ও ০০০

৷ রগ ৷ সরা সা ৷ ৷ ৷ ৷ ৷ ৷ ৷ ৷ সগা গা ৷ ৷ মা গমগা রসা ৷
০০ ০০ ও ও ও ও ও ও ও ও বড় ই ও দুঃ খ০ ০০

৷ সা রা সণ্ সা ৷ ধ্ সা সগা গরা I সা রা সা ৷ ৷ ৷} মপা পা ৷

	র	ই	লো০	০		০	০	ম০	নে০		গো	০	০	০		০	০	নে০	ও						
।	া	পা	পা	ধণা	।	া	পা	পধা	ণা	।	পধা	া	া	া	।	র্সা	ণা	ধণা	ধা	।					
	০	গো	০	০০		০	রা	ধা০	০		০০	০	০	০		ন্০	ধে	০	০০						
।	পা	পা	পা	ণা	।	ধাধা	ধপা	পধা	পমা	।	মপা	মা	পমগা	া	।	রগা	মা	গা	রসা	।					
	০	ম	ণি	০		মা০	লা০	প০	রা০		ইও	০	ব০০	০		ন্০	ধে	০	০০						
।	া	া	সগা	গা	।	গপা	মগা	রসা	া	।	সা	রা	সণ্া	ধা	।	ধ্া	সা	সগা	গরা	।					
	০	০	রগ	লে		তে০	০০	০০	০		ও	০গো	০	০		০	০	ল০	লি০						
।	সা	রা	সা	া	।	া	া	া	া	**II**															
	তে	০	০	০		০	০	০	০																

(ভট্টাচার্য্য, ২০২১ : ৩২৯)

৩.২.৩ রাধারমণের গানে ধামাইল সুরের প্রভাব

রাধারমণের গানে যেমন ভাবের উপর নির্ভর করে সুরারোপিত হয়েছে, তেমনই বাংলা লোকসংগীতে চিরায়িত ধারার সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বিশেষ করে ধামাইল গানের সুরের সাথে রাধারমণের গানের সুরের রয়েছে এক বিশেষ যোগ। বাংলা লোকসংগীতের গুরুত্বপূর্ণ ধারা ধামাইল গানের সকল বৈশিষ্ট্য আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে রাধারমণের ধামাইল অঙ্গের গানে। যার কারণে লোকসংগীতবেত্তারা রাধারমণকে ধামাইল গানের প্রবাদ পুরুষ বলে থাকেন। প্রচলিত ধামাইল গানের বাণী সহজ সরল। এ গানে গ্রামীণ নারী কবিদের জীবনের আনন্দ বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ধামাইল গান মৌখিক ধারাকে অবলম্বন করে বাংলা লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জনপ্রিয় লোকসংগীত ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ গানে সুর ও তাল সহজ ও সরল। সবগুলো সাধারণ মুদারা সপ্তকের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাল দ্রুত দাদরা হয়ে হয়ে যায়, তবে হাতে তালি দিয়ে গাওয়া হয়, যন্ত্রসংগীতের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তবে গানের শেষে লয় দ্বিগুণ হয়। রাধারমণ রচিত ধামাইল গানের সুরে বাংলাদেশের প্রচলিত ধামাইল গানের সুরের প্রভাব বিদ্যমান। তবে রাধারমণ রচিত ধামাইল গানের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক স্তুতি। এ গানে বৈষ্ণব ভাবের উদয় হলেও এতে সুরে থাকে বৈষ্ণব প্রেমের সাথে লৌকিক প্রেমে নির্মোহ আবেদন। নিচে রাধারমণ রচিত ধামাইল গানের সুরের বৈচিত্র্য তুলে ধরা হলো :

তাল : দাদরা/খেমটা

জলে গিয়াছিলাম সই
কালা কাজলের পাখি দেইখ্যা আইলাম কই ॥
পালিতে আছিলাম পাখি দুধ কলা দিয়া
এগো যাইবার কালে বেইমান পাখি
না চাইল ফিরিয়া। ।
সোনার পিঞ্জুরা সইগো
রূপার টাঙ্গুনী
এগো আবের চান্দুয়া দিয়া
পিঞ্জুরা ঢাকুনী ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে
পাখি রইল কই
এগো আইনা দে মোর প্রাণ পাখি
পিঞ্জুরাতে থুই ॥

‖	(মা	রা	া	।	মা	মা	া	।	পা	ধা	পা	।	মা	পা	ধা}	‖
	জ	লে	০		গি	য়া	০		স	০	০		০	০	ই	
।	(মা	রা	া	।	মা	মা	া	।	পা	ধা	পা	।	পা	ধা	পা)	।
	জ	লে	০		গি	য়া	০		ছি	লা	ম		স	০	ই	
।	ধা	া	ধা	।	া	ধা	া	।	ধা	ধা	ধা	।	ণা	ধা	পা	।
	কা	০	লা		০	কা	০		জ	লে	র		পা	খি	০	
।	পা	পা	পা	।	পা	ধা	ণা	।	ধা	পা	া	‖				
	দে	ই	খ্যা		আই	লা	ম		ক	০	ই					
‖	মা	মা	া	।	পা	ধা	পা	।	পা	ধা	পা	।	মা	রা	া	।
	পা	লি	০		তে	আ	০		ছি	লা	ম		পা	খি	০	

মা	মা	া	পা	ধা	পা	পা	পা	া	া	া	া
দু	ধ	০	ক	লা	০	দি	য়া	০	০	০	০

মা	পা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	া	ধা	ধা	ধা
এ	গো	০	যাই	বা	র	কা	লে	০	রি	য়	০

ণা	ধা	পা	পা	পা	পা	পা	ধা	ণা	ধা	ধা	পা
পা	খি	০	না	চা	ই	লো	ফি	০	রি	য়	০

মা	মা	া	পা	ধা	পা	পা	ধা	পা	মা	রা	া
সো	না	০	র	পি	ন্	জু	রা	০	সই	গো	০

মা	পা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	া	ন্ধা	ধা	ধা
এ	গো	০	আ	০	বে	র	চা	ন্	দু	য়া	০

ণা	ধা	পা	পা	পা	পা	পা	ধা	ণা	ধা	ধা	পা
দি	য়া	০	পি	ন্	জু	রা	ঢা	০	কু	নী	০

(মা	মা	া	পা	ধা	পা	পা	ধা	পা	মা	রা	া
ভা	ই	বে	রা	ধা	০	র	ম	ণ	ব	লে	০

মা	মা	া	পা	ধা	পা	পা	পা	া	া	া	া
পা	খি	০	রই	ল	০	ক	ই	০	০	০	০

মা	পা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	া	ধা	ধা	ধা
এ	গো	০	আ	ই	না	দে	মো	র	প্রা	ণ	০

ণা	ধা	পা	পা	পা	পা	পা	ধা	ণা	ধা	ধা	পা
পা	খি	০	পি	ন্	জু	রা	তে	০	থু	০	ই

(চক্রবর্তী, ২০২০ : ১৩৮)

৩.২.৪ রাধারমণের গানে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব

ভাটিয়ালি বাংলা লোকসংগীতে অন্যতম প্রাচীন ধারা। এ-গানে নদী, নৌকা, মাঝি ইত্যাদি শব্দের আধিক্য লক্ষণীয়। ভাটিয়ালি গানের বিষয়বস্তু লৌকিক, আধ্যাত্মিক ও রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক হয়ে থাকে। ভাটিয়ালি গানকে লোকসংগীতবেত্ত্বাগণ মাঝি-মাল্লাদের গান হিসেবেই অভিহিত করেন। ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সিলেট অঞ্চলে এ গানের উৎপত্তিস্থল হিসেবে ধরা হয়। গানের বিষয় অনুযায়ী ভাটিয়ালি গানের সুর করুণ। বিরহ-বিচ্ছেদ আধ্যাত্মিকতা এবং সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়া না পাওয়ার শূন্যতা-বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ পায় এ গানের সুরে। ভাটিয়ালি গানের সুর প্রসঙ্গে লোকসংগীত শিল্পী ও গবেষক রীনা দত্তের বক্তব্য তুলে ধরছি :

> যদিও লোকসংগীতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উড়ব জাতি বা স্বরের প্রাধান্য; কিন্তু ভাটিয়ালীর ক্ষেত্রে সপ্তস্বরের প্রয়োগ তাকে আরও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। একমাত্র কড়ি মাধ্যম ছাড়া সমস্ত স্বরই প্রায় শুদ্ধ লাগে। আবার অঞ্চলভেদে কোমল স্বরের ব্যবহারও ভাটিয়ালির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট লোকসংগীতবিদ সঙ্গীতাচার্য সুরেশ চক্রবর্তী পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালীকে খাম্বজ ঠাটের অন্তর্গত ঝিঁঝিট রাগিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরোহীতে 'সা রে মা পা ধা সা' এবং অবরোহীতে 'ণ ধ প ম পরে সা ণ ধ'। পূর্বাঙ্গে তিনি কশৌলী ঝিঁঝিট বলে আখ্যা দিয়েছেন। ভাটিয়ালীতে শুধু স্থায়ী এবং অন্তরা থাকে। অবশ্য অঞ্চল ভেদে সঞ্চারীতে ভাগও দেখতে পাওয়া যায়। এই সঞ্চারী আবার উদারার পঞ্চমে অনেক ক্ষেত্রে নেমে যেতে দেখা যায়। ... এই উদারার পঞ্চমে সুরকে ছুঁইয়ে মুদারার দিকে গানের গতি ভাটিয়ালীর সুরকে যেন আরও প্রাণবন্ত বৈচিত্র্যময় করে তোলে। (আহমদ, ২০০৯ : ৩২-৩৩)

রাধারমণ রচিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গানে ভাটিয়ালি গানের সুরের প্রভাব বিদ্যমান। যেখানে রয়েছে সুরে দীর্ঘ টানের ব্যবহার এবং সপ্তসুরের প্রভাব, আরোহীতে মুদারা থেকে যেমন তারার পঞ্চম পর্যন্ত সুর উপরে ওঠে, তেমনি অবরোহীতে উদারার বৈবত বা পঞ্চমের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে রাধারমণ রচিত ভাটিয়ালি সুরের প্রভাবিত গান স্বরলিপিসহ দেওয়া হলো :

তাল : কাহারবা

হরি গুণাগুণ রাধা গুণাগুণ
কৃষ্ণ গুণাগুণ গাওরে
সদাই আনন্দ রাইখো মনে ॥
মন উজান বাতাস উজান

হুশ কইরা নাও বাইও রে
সামনে আছে সাধুর বাজার
কিছু কিন্না লইও রে্ ॥

রাধা রানীর প্রেমবাজারে
রসের দোকান খুইলাছে রে
ওরে মন কেহই বেচে কেহই কিনে
দর কইরা কেউ খাওরে ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে
আমার তরী ভাঙারে
রাধার নামে বাদাম দিয়ে
ব্রজধামে চল রে ॥

|| া সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা মা জ্ঞা মা | পা পা া মা | জ্ঞা মজ্ঞা রা সা I
ও হ রি গু ণা ও গু ণ রা ধা ও গু ণা ০০ গু ণ

| া সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা মা জ্ঞা মা | া পা র্সণা ণা | ধা পা া া I
ও কৃষ্ ন গু ণা ও গু ণ ও গা ০০ ও রে ও ও ও

| পা মা মা জ্ঞা | া া া জ্ঞা | া মা পা পা | পা পা মজ্ঞা মপা I
ও ও ও ও ও ও ও স ও দা ই আ ন্ ন্ন দ০ ০০

| া মজ্ঞা ম জ্ঞা | রা সা রা সা II
ও রা০ ই খো ম ও ও নে

|| া া া মা | পা না না া I া র্সা া র্সা | র্সা র্সা পা া I
ও ও ও ম ন উ জা ও ও ন ও বা তাস উ জা ন

া	া	া	না		না	র্সা	র্রা	র্সা	I	না	া	া	না		না	র্রা	র্সা	র্সা	I
০	০	০	হুশ		কই	রা	না	০		ও	০	০	বাই		ও	০	০	রে	

া	া	া	া		া	র্সা	র্সা	র্সা	I	র্সা	র্রা	র্সা	ণা		া	ণা	া	ধা	I
০	০	০	০		০	সাম	নে	আ		ছে	০	সা	ধু		০	র	০	রা	

র্সণা	ধা	পা	া		া	পা	পা	পা	I	া	পা	পা	পা		া	া	া	মা	I
জা ০	০	র	০		০	কি	ছি	কি		ন্	ন্না	লই	ও		০	০	রে	০	

গা	া	া	া		া	া	া	জ্ঞা	I	া	মা	পা	পা		পা	পা	মজ্ঞামপা		I
০	০	০	০		০	০	০	স		০	দা	ই	আ		ন্	ন্ন	দ০	০০	

া	মজ্ঞা	মা	জ্ঞা		রা	সা	রা	সা	II
০	রা০	ই	খো		ম	০	০	নে	

II	া	া	া	না		না	র্সা	র্রা	র্সা	I	া	র্সা	র্সা	র্সা		র্সা	র্সা	পা	া	I
	০	০	০	রসে		ধা	রা	নী	০		০	র	০	প্রেম		বা	জা	রে	০	

I	া	া	া	না		না	র্সা	র্রা	র্সা	I	না	া	া	না		না	র্সা	র্গা	র্রা	I
	০	০	০	রসে		র	দো	কা	০		ন	০	খু	ই		লা	ছে	রে	০	

র্সা	া	া	া		পা	পা	ধা	ণা	I	া	া	র্সা	র্রা		র্রা	র্রা	র্রা	র্গা	I
০	০	০	০		ও	রে	ম	ন		০	০	কে	হ		ই	বেঁ	চে	০	

র্রা	র্সা	র্সা	না		না	ধা	ধা	া	I	ধা	ধা	ধা	ধা		ধা	পা	মা	া	I
কে	০	হ	ই		কে	০	নে	০		দ	র	কই	রা		কে	০	ও	০	

মা	মা	পা	ধা		ণা	ধা	পা	মা	I	জ্ঞা	মা	পা	পা		পা	পা	মজ্ঞা	মপা	I
খা	ই	ও	রে		০	০	০	০		স	দা	ই	আ		ন্	ন্ন	দ০	০০	

া	মজ্ঞা	মা	জ্ঞা		রা	সা	রা	সা	II
০	রা০	ই	খো		ম	০	০	নে	

া	া	া	মা		পা	না	না	া	I	া	র্সা	র্সা	র্সা		র্সা	র্সা	পা	া	I
০	০	০	ভাই		বে	রা	ধা	০		০	০	০	র		মন	ব	লে	০	

া	া	া	না		না	র্সা	র্রা	র্সা	I	না	া	া	না		না	র্রা	র্সা	র্সা	I
০	০	০	আমা		র	ত	রী	০		০	০	০	ভা		ঙা	০	রে	০	

র্সা	া	া	া		পা	পা	ধা	ণা	I	া	া	র্সা	র্রা		র্রা	র্রা	র্রা	র্গা	I
০	০	০	০		ও	রে	ম	ন		০	০	রা	ধা		র	না	মে	০	

র্রা	র্সা	র্সা	না		না	ধা	ধা	া	I	ধা	ধা	ধা	ধা		ধা	পা	মা	া	I
রা	০	দা	ম		দি	০	য়ে	০		০	ব্র	জ	ধা		মে	০	০	০	

মা	মা	পা	ধা		ণা	ধা	পা	মা	I	জ্ঞা	মা	পা	পা		পা	পা	মজ্ঞা	মপা	I
০	চ	ল	রে		০	০	০	০		স	দা	ই	আ		ন্	ন্ন	দ০	০০	

া	মজ্ঞা	মা	জ্ঞা		রা	সা	রা	সা	II
০	রা০	ই	খ		ম	০	০	নে	

(ভট্টাচার্য্য, ২০২১ : ৩১৭)

তাল : কাহারবা

ওরে আজ কেন রে প্রাণের সুবল

রাই এল না যমুনাতে

আমি রাই অপেক্ষায় বসে আছি

মোহন বাঁশি নিয়া হাতে ॥

সুবল রে বল বল সুবল সখা

কতদিনে হবে দেখা

রাধার কথা বলরে গোপনে

আমি রাই আসিলে জিজ্ঞাসিব

না আসিলে সময় মতো ॥

সুবল রে না জানি রাই কি কারণে

বিচ্ছেদ ভাবিয়া মনে

মান কইরাছে বিনা অপরাধে

আমি রাই সুখেতে

পারলাম না রাই মান ভাঙ্গাইতে ॥

সুবল রে মনে রইল মনের দুঃখ

সকল দুঃখ বরণ কর

সব দুঃখ রহিল অন্তরে

রাধা রমণে কয় ওরে সুবল

কাজ নাই যে আর এ পিরীতে ॥

| | | |

| মা পা পা ণধা | র্সণা ধা পা সা | I া া া পা | পা ধা ধণা ধপা I

ও ও রাই অ০ ০০ পে ক্ষা ০ ০ ০ য় ব সে আছি ০ ০

| পা া মধা পধা | মপা মা গা া | I া া া পা | পা ধা নধা পা ||

মো ০ হ০ ০০ ন০ বাঁ শি ০ ০ ০ ০ নি য়া হা তে০ ০

|| া া গা মা | পা ণা া া | I া া া া | ণা র্সা া ণা I

০ ০ সু বল রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

| ধা পা পণা ধণা | পধা পা া া | I পা দা পা মা | মা পা পা মা I

০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব ল

| জ্ঞা মা পদা মপা | মা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | I রা সা রজ্ঞা জ্ঞা | রা সা া া I

ব ল০ ০০ ০০ ০ সু ব ল স ০ ০ খা ০ ০ ০ ০

| া া া া | সা জ্ঞা রা মজ্ঞা | I রা সা া সা | রা সা ণ্ া I

০ ০ ০ ০ ক ত দি নে০ ০ ০ ০ হ বে দে খা ০

| া া া সা | গা গা গা গা | I সা গা মা গা | পদা পমা মা পা I

০ ০ ০ রা ধা র ক থা ০ ব ল রে গো০ ০০ প নে

| া া া দপা | মগা মা া া | I পা ণা ধা ণা | া া া া I

০ ০ ০ ০ আ মি ০ ০ রাই আ সি লে ০ ০ ০ ০

I া ণা র্সা র্সা | ণা ধা পা পণা | I ধণা পধা পা া | পা পা ধা ণধা I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ জি জ্ঞা সি ব০

| পা পা মধা পধা | মপা মা গা া | I পা পা পা ধা | ণধা প-া া া II

	০	না	আ০	০০		০০	সি	লে	০		স	ম	য়	ম		তো	০	০	০													
II	া	া	গা	মা	I	পা	ণা	া	া	I	া	া	া	া	I	ণা	র্সা	া	ণা	I													
	০	০	সু	বল		রে	০	০	০		০	০	০	০		০	০	০	০													
I	ধা	পা	পণা	ধণা	I	পধা	পা	া	া	I	পা	দা	পা	মা	I	মা	পা	পা	মা	I												
	০	০	০০	০০		০০	০	০	০		০	০	০	০		০	০	ম	নে													
I	জ্ঞা	জ্ঞমা	পদা	মপা	I	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	II	রা	সা	রজ্ঞা	জ্ঞা	I	রা	সা	া	া	I												
	রই	ল০	০	০		০	ম	নে	র		দুঃ	০	০	খ		০	০	০	০													
I	া	া	া	সা	I	সা	জ্ঞা	রা	মজ্ঞা	I	রা	সা	া	সা	I	রা	সা	ণ্	া	I												
	০	০	০	স		ক	ল	দুঃ	খ		০	০	০	ব		র	ণ	ক	র													
I	া	া	া	সা	I	গা	গা	গা	গা	I	সা	গা	মা	পা	I	পদা	পমা	মা	পা	I												
	০	০	০	সব		দুঃ	খ	র	০		০	হি	ল	অ		০০	০ন্	ত	রে													
I	া	া	া	দপা	I	মগা	মা	া	া	I	পা	ণা	ধা	ণা	I	া	া	া	া	I												
	০	০	০	০		রা	ধা	০	০		র	ম	নে	ক		০	০	০	০													
I	া	ণা	র্সা	র্সা	I	ণা	ধা	পা	পণা	I	ধণা	পধা	পা	া	I	পা	পা	ধা	ণধা	I												
	০	০	০	০		০	০	০	০		০০	০০	য়	০		ও	রে	সু	বো০													
I	পা	পা	মধা	পধা	I	পমা	মা	গা	া	I	পা	পা	পা	ধা	I	ণধা	পা	া	া	II	II											
	ল	কাজ	না০	০০		০ই	যে	আ	র		০	এ	পি	রী		তে	০	০	০													

(ভট্টাচার্য্য, ২০২১ : ৬০)

তাল : কাহারবা

জীবন থাকিতে গো

পিরিতে মন দিও না

বিনয় করি পায়ে ধরি

কাতরে করি মানা ॥

ঘরে বাইরে হইলাম দ্যোষি

কিবা দিবা কিবা নিশি

চিন্তিতেছি নিরলে বসিয়া

আমার ভাবিয়া তনু হইল সারা

কান্না শুনে দিন যাবে না ॥

মনো প্রাণ দিয়া বান্ধা

পাইলাম আমি লোকের নিন্দা

রাখলাম জীবন কোলেতে বান্ধিয়া

তার নিত্য একাদশী গো

দ্বাদশীর নাই পার না ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে

শ্রী রাধিকা চান্দের প্রাণ

হয় না কেন সমান সমান

আমার যায় না কেন শেষ যেখানে গো

প্রাণ আর ধৈর্য্য মানে না ॥

| | | |

| পা ৷ ৷ ৷ | গা গা রা সা I সা ৷ ৷ ৷ | ৷ ৷ ৷ স ||

রি ০ ০ ০ মা না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জী

গা || গা গা গা গা | মা ৷ পা ৷ I ৷ পা পা ৷ | ৷ ৷ ৷ পা ||

ঘ রে বা ই রে হ ই লা ম ০ দো ষী ০ ০ ০ ০ কি

| ধা র্সা র্সা র্সর্রা | ণা ৷ ৷ ণা I র্সণা ধপা ৷ ৷ | ৷ ৷ ৷ ধা I

বা নি দ্রা ০০ ০ ০ ০ কি বা০ নিশি ০ ০ ০ ০ ০ চি

| ধা ধা ধা ণা | ধপা ৷ ৷ পা I পা ধা পা ধা | পমা ৷ মা ৷ I

ন্তি তে ০ ছি ০০ ০ ০ নি র লে ০ ব সি০ ০ য়া ০

| ৷ ৷ মপা ধণা | ধা ৷ ৷ ধা I ধা ধা ধা ণা | ধপা ৷ ৷ পা I

০ ০ আ মা০ র ০ ০ ভা বি য়া ত নু ০০ ০ ০ হ

| পা ধা পা ধা | পমা ৷ ৷ ৷ I ৷ ৷ ৷ পা | ধপা মা ৷ ৷ I

ই ০ ল সা রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ন্না০ ০ ০ ০

| ৷ পধা পমা গা | ৷ ৷ পমা গা I রা সা রা গা | ৷ ৷ ৷ (রসা) II

০ শুনে ০০ ০ ০ ০ দি ন০ যা বে ০ না ০ ০ ০ জী

গা || গা গা গা গা | মা ৷ পা ৷ I ৷ পা পা ৷ | ৷ ৷ ৷ পা I

ম ন প্রা ণ দি ০ য়া ০ বা ন্ ধা ০ ০ ০ ০ পা

I ধা র্সা র্সা র্সর্রা | ণা ৷ ৷ ণা I র্সণা ধপা ৷ ৷ | ৷ ৷ ৷ ধা I

ই লা ম আমি ০ ০ ০ লো কের নিন্দা ০ ০ ০ ০ ০ রাখ্

| ধা ধা ধা ণা | ধপা া া পা I পা ধা পা ধা | পমা া মা া I

লা ম জী ব ০০ ০ ন কো লে তে বা ন্ দিয়া ০ ০ ০

| া া মপা ধণা | ধা া া ধা I ধা ধা ধা ণা | ধপা া া পা I

০ ০ তা০ ০০ র ০ ০ নি ত্য এ কা ০ ০০ ০ ০ দ

| পা ধা পা ধা | পমা া া া I া া া পা | ধপা মা া া I

শী০ ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ দ্বা দশী ০ র ০

| া পধা পমা গা | া া পমা গা I রা সা রা গা | া া া (রসা) II

০ না০ ই০ পা ০ ০ র০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ জী০

গা || গা গা গা গা | মা া পা া I া পা পা া | া া া পা I

ভা ই বে রা ধা র ০ ম ০ ণ ব লে ০ ০ ০ ০ শ্রী

| ধা র্সা র্সা র্সর্রা | ণা া া ণা I র্সণা ধপা া া | া া া ধা I

রা ধি কা ০০ ০ ০ ০ চা ন্দের প্রাণ ০ ০ ০ ০ ০ হ

| ধা ধা ধা ণা | ধপা া া পা I পা ধা পা ধা | পমা া মা া I

০ ০ আ০ মা০ র ০ ০ যা য় না কে ন ০০ ০ ০ শে

| পা ধা পা ধা | পমা া া া I া া া পা | ধপা মা া া I

ষ যে খা নে গো০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্রা ০ণ আ র ০

| া পধা পমা গা | া া পমা গা I রা সা রা গা | া া া (রসা)IIII

০ ধৈ০ র্য০ মা ০ ০ নে০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ জী০

(ভট্টাচার্য্য, ২০২১ : ১৪০)

৩.২.৫ রাধারমণের গানে বাউল সুরের প্রভাব

বাংলা লোকসংস্কৃতি তথা লোকসংগীতে অন্যতম অনুষঙ্গ বাউল গান। যারা গানের মাধ্যমে দেহের মাঝে দেহাতীতের সন্ধান করেন। রূপের মাঝে ধরতে চায় অরূপকে। এরা শাস্ত্রীয় ধর্ম মেনে জীবনযাপন করে না, সমস্ত ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ধর্মগ্রন্থকে তারা অস্বীকার করে গানের মাধ্যমে দেহভাণ্ডে খুঁজে বেড়ায় মনের মানুষকে। এই বাউল সম্প্রদায়ের গান মূলত বাণী প্রধান। বাণীর ভাবকে সমুন্নত রেখে বাউলেরা গান করে; তাই বাউল গান পরিবেশনের অন্যতম বাদ্যযন্ত্র একতারা, খঞ্জনী, ডুগি। হাতে একতারা এবং কোমরে ডুগি নিয়ে বাউল গান গেয়ে বেড়ায়। এ গানের সুর স্থীর ভাবের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। গানের বাণীকে ফুটিয়ে তুলতে একটা সুরের উপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তবে আরোহনের সুর সরলরৈখিকভাবে এগিয়ে যায়। বাউল গানের সুরে সাত স্বরেরই ব্যবহার হয়। অর্থাৎ বাউল গানের সুরের জাতি সম্পূর্ণ। বৈষ্ণব কবি রাধারমণের বহু গানে বাউল গানের সুরের জাতি সম্পূর্ণ; এবং সুরের প্রভাব বিদ্যমান। এসকল গানের সুর ও স্বর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় তুলনামূলক আলোচনার জন্য একাধিক মূল বাউল গানের সুর এবং রাধারমণের বাউল গানের সুরে প্রভাবিত গানগুলো স্বরলিপি সহকারে তুলে ধরছি-

তাল : ঝাপ তাল

জাত্ গেল জাত্ গেল বলে একি আজব কারখানা।
সত্য পথে কেউ নয় রাজী, সব দেখি তা না-নানা ॥
যখন তুমি ভবে এলে,
তখন তুমি কি জাত্ ছিলে,
কি জাত্ হবা যাবার কালে,
সেই কথা কেন বল না ॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-চামার-মুচি,
এক জলেই সকলে শুচি,
দেখে শুনে হয় না রুচি,
যমে তো কাকেও ছাড়বে না।
গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়,
তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়,
লালন বলে, জাত্ কারে কয়,
এই ভ্রম তো গেল না ॥

|| সা সা | রগা মপা পমা | গা মা | রা গা ৷ ||

জাত গে ল০ ০০ জাত গে ল ব লে ০

| সা রা | রা ৷ রা | গা পা | গরা গা সা |

এ কি আ ০ জব কা র্ খা ০ না

| র্সা র্সা | র্সা র্সা ৷ | না র্সা | র্সনা ধনা ধপা |

সত্ তো প ০ থে কেউ নয় রা জী ০

| ধা পা | মা গা মগা | রা মা | গরা গা রসা |

স বি দে ০ খি তা না না০ ০ না০

+

|| সা সা | রগা মপা মা I গা মা | রা গা ৷ ||

জাত্ গে ল০ ০০ জাত্ গে ল ব লে ০

| সা রা | রা রা রা I গা পা | গা রসা ৷ |

এ কি আ জ ব কা র খা না০ ০

| র্সা র্সা | র্সা র্সা ৷ I না র্সা | না ধা প |

সত ত প থে ০ কেউ নয় রা জী ০

| পা ধা | পা মা গ I গা মা | মগা রগা রসা ||

স বি দে খি ০ তা না না০ ০০ না০

|| গা গা | পা পা ধা I র্সা র্সা | র্সা র্সা ৷ |

ব্রাহ্ম ক্ষণ চ ন্ ডাল্ চা মার্ মু চি ০

| র্সা র্রা | র্সর্রা র্গর্মা র্গর্রা I র্রর্সা র্সা | না ধাপ |

এক জ লে০ ০ই স০ ক০ লে শু চি ০

| র্সা র্সা | র্সা র্সা ৷ I না র্সা | না ধা পা |

দে খে শু নে ০ হয় না রু চি ০

| পা ধা | পা মা গা I গা মা | রগা রসা া II
য মে তো কা ০ কেও ছাড়ু বে০ না০ ন

|| গা গা | পা া ধা I র্সা র্সা | র্সা র্সা া |
য খন তু ০ মি ভ বে এ লে ০

| র্সা র্রা | র্সর্রা র্গর্মা র্গা I র্রা র্সা | ন ধা গ |
ত খন্ তু০ ০০ মি কি জাত ছি লে ০

| র্সা র্সা | র্সা র্সা া I না র্স | না ধা প |
কি জাত হ বা ০ যা বার্ কা লে ০

| পা ধা | পা মা প I গা মা | মগা রগা রসা |
সেই ক থা কে ০ া ব ল০ ০০ না০

II গা গা | পা া ধা I র্সা র্সা | র্সা র্সা া |
গো প নে ০ যে যে শ্যার ভাত খায় ০

| র্সা র্রা | র্সর্রা র্গর্মা র্গা I র্রা র্সা | না দা পা |
তা তে ধ০ ০র্ মের্ কি ক্ষ তি হ য়

| র্সা র্সা | র্সা া র্সা I না র্সা | না ধা প |
লা লন ব ০ লে জাত কা রে ক য়

| ধা পা | পা া মগা I গা মা | গা রসা া |
এ ই ভ্র ম তো০ গে ০ ল না০ ০ II

স্বরলিপি : আলম, ২০২৫

তাল : কাহারবা

কাঙাল জানিয়া পার কর রে

দয়াল গুরু জগত উদ্ধার গুরু

গুরু আকাশেতে থাক

গুরু আবার পাতালেতে ধর

আমি বুঝিতেই না পারি

গুরু আমি বুঝিতেই না পারি

গুরু মহিমা অপার রে

দংশ গুরু ওঝা হইয়া

ঝাড় রমনী হইয়া

গুরু রমনী হইয়া

গুরু পুরুষের মন্ হর রে

ভাইবে রাধারমণ বলে

অসার সংসার

তুমি জগৎকে তরাইলায়

গুরু আমি রইলাম পারে

১				০							
মা	পা	পা	া	া	া	মা	পা	গা	মা	মা	গা
কা	০	ঙ্গা	০	০	ল্	জা	০	নি	০	য়া	০
রা	সা	া	ঁসা	রা	সা	সা	া	া	া	গা	া
পা	০	০	র্	ক	০	র	০	০	০	রে	০
সা	রা	রা	গা	সা	রা	সা	না	সা	গা	মা	পা
দ	০	য়া	ল	হু	০	রু	০	চ	গ	ত	উদ্
মা	পা	মা	গা	া	া	া	া	সা	ন্া	গা	মা

	ধা	র	০	০		০	০	০	০		গু	রু	গু	রু	
‖	া	া	া	া	‖	া	া	না	সা	‖	সা	সা	গা	া	‖
	০	০	০	০		০	০	আ	কা		০	শে	তে	০	
‖	সা	রা	রা	গা	‖	সা	রা	রা	না্	‖	সা	গা	গা	মা	‖
	থা	০	ক	০		গু	র	আ	বার্		পা	তা	লে	তে	‖
‖	গা	মা	া	া	‖	মা	পা	মা	পা	‖	মা	পা	মা	পা	‖
	ধ	র	০	০		০	০	০	০		০	০	০	০	
‖	মা	পা	ণধা	পা	‖	া	া	গা	মা	‖	মা	া	মা	পা	‖
	০	০	০	০		০	০	আ	মি		বু	০	ঝি	০	
‖	পা	পা	পা	মা	‖	পা	ণা	ণা	ধা	‖	ধা	পা	পা	া	‖
	তে	ই	না	০		পা	০	রি	০		গু	০	রু	০	
‖	পা	ণা	ণা	ণা	‖	ণা	র্সা	র্রা	া	‖	র্সা	া	র্সা	র্রা	‖
	০	০	বু	ঝি		০	তেই	না	০		পা	০	রি	০	
‖	র্সা	ণা	ণা	া	‖	র্সা	া	র্সা	া	‖	র্সা	া	ণধপা	া	‖
	গু	০	রু	০		ম	০	হি	০		মা০	অ০	০	০	
‖	পা	ধা	ধা	পা	‖	ধা	পা	মা	গা	‖					
	পা	০	র	০		রে	০	০	০						
‖	া	া	া	া	‖	া	ণা	র্না	সা		া	সা	গা	া	‖
	০	০	০	০		০	০	স	র্প		০	হই	য়া	০	

সা	রা	রা	গা	সা	রা	সা	না	সা	পা	গা	মা
দং	০	শ	০	গু	০	রু	০	ও	ঝা	হই	য়া

গা	মা	া	া	মা	পা	মা	পা	মা	পা	মা	পা
ঝা	ড়	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

মা	গা	া	া	া	া	া	া	া	া	মা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	র	ম

পা	পা	পা	মা	পা	ণা	ণা	ধা	ধা	পা	পা	মা
০	ণী	হ	০	ই	০	য়া	০	গু	০	রু	০

া	া	না	না	া	র্সা	র্গা	র্রা	র্রা	া	র্রা	র্গা
০	০	র	ম	০	ণী	হ	০	ই	০	য়া	০

র্রা	র্সা	র্সা	না	না	র্সা	র্সা	া	র্সা	র্সা	ণধা	পা
গু	০	রু	০	পু	০	রু	০	ষে	র	ম০	ন্

পা	ধা	ণধা	পা	ধা	পা	মা	গা
হ	০	র	০	রে	০	০	০

া	া	া	া	া	া	মা	পা	পা	পা	না	া
০	০	০	০	০	০	ভাই	বে	০	রা	ধা	০

না	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	া	র্গা	র্রা	র্সা	না	না	না
র	০	০	ম	ন্	ব	০	লে	০	০	অ	সা

র্সা	র্সা	র্রা	র্সা		না	র্সা	া	া		া	া	র্গা	র্রা	
	০	র	সং	০		সা	০	০	০		০	০	র	০	

র্সর্রা	র্সা	া	া		া	া	না	না		না	না	না	না	
	০০	০	০	০		০	০	তু	মি		জ	০	গ	ৎ	

র্সা	া	র্গা	র্রা		র্রা	র্রা	র্রা	র্গা		র্রা	র্সা	র্সা	না	
	কে	০	ত	০		রা	ই	লা	য়্		গু	০	রু	০	

র্সা	র্সা	র্সা	া		র্সা	র্সা	ণধা	পা		পা	ধা	পা	পা	
	আ	০	মি	০		র	ই	লা০	ম্		পা	০	র	০	

ধা	পা	মা	গা	II
রে	০	০	০	

(ভট্টাচার্য্য, ২০২১ : ৭৬)

তাল : দ্রুত দাদ্‌রা

কার পানে চাইয়া রে মন
কার পানে চাইয়া
সাঞ্জা কালে ঘোর জঙ্গলে
কান্দরে ব্যকুল হইয়া ॥
না লইলায় গুরু দীক্ষা
আগে করলায় বিয়া
এমন সুন্দর নারী
কার ঠাইন যাইবায় লইয়া ॥
বড় বাড়ী বড় ঘর ভাই
বড় কইলায় আশা
সেই আশা ভাইঙ্গা নিব

নদীর কূলে বাসা ॥
রাধারমণ বলে নদীর
কূলে বইয়া
পার হইমু পার হইমু করি
দিনতো যায় গইয়া ॥

|| া া রা | রা রা গা | মা া পা | ধপা মা গা I
ও ও কা র পা নে চা ই য়া রে০ ম ন

| রা গা রা | সা সন্া ধ্ন্া | সা া া | া া া I
কা ও র পা নে০ ০০ চা ই য়া ও ও ও

| মা া পা | মা পা া | পা া পা | মা পা া I
সা ও ঞ্জা কা লে ও ঘো র জ ঙ্গ লে ও

| ধধা া ণা | ধা পা া II মা ধা পা | মা গা া I
কা ও ন্দ ও ও ও রে ও ও ব্যা কু ল

|| রা রা া | রা গা া I মা পা া | ধপা মা গা I
হ ই য়া ও ও ও কা ন্দ ও রে০ ও ও

| রা গা রা | সা সন্া ধ্না I সা া া | া া া I
ব্যা কু ল হ ই০ ০০ সা ও ও ও ও ও

| া া মা | পা না না I না া র্সা | র্সা র্রর্সা না I
ও ও না ল ই লা য় ও ও গু রু০ ও

| র্সা া না | না র্সা র্ররর্রা I না া া | র্সা র্সা র্রা I

দী ক্ষা ০ ০ ০ ০০ আ গে ০ ক র লায়

| নর্সা া া | া া া I র্সা র্সা া | র্সা র্রা া I
বিয়া ০ ০ ০ ০ ০ এ ম ন সু ন্দ র

I র্সা া র্সা | র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা া | ধা পা র্গা I
না ০ রী ০ ০ ০ কা র ০ ঠা ই ন

| পা ণা ধা | পা মা া I গা রগা রা | সা া া II
যা ই বা য় ল ই য়া ০০ ০ ০ ০ ০

| া া মা | পা না না I না া র্সা | র্সা র্রর্সা না I
০ ০ ব ড় বা ড়ী ব ড় ঘ ০ ০০ ০

| র্সা া না | না র্সা র্ররা I না না া | র্সা র্সা র্রা I
র ০ ০ ০ ০ ০০ ভা ই ০ ব ড় ০

| নর্সা া া | র্সা া া I র্সা র্সা া | র্সা র্সা া I
কই লা ম আ শা ০ সে ই ০ আ শা ০

| র্সা া র্সা | র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা া | ধা পা া I
ভা ই ঙ্গা নি ব ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

| পা ণা ধা | পা মা া I গা রগা রা | সা া া I
ন দী র কূ লে ০ বা সা০ ০ ০ ০ ০

| া া মা | পা না না I না র্সা া | র্রর্সা না া I
০ ০ ভাই বে রা ধা র ম ণ বলে ০ ০

র্সা	া	না	না	র্সা	র্রা	I	না	না	া	র্সা	র্সা	র্রা	I
০	০	০	ন	দী	র		কূ	লে	০	ব	ই	য়া	

র্সা	া	র্সা	র্সা	র্সা	র্রা	I	র্সা	া	ণা	ধা	পা	া	I
পা	র	হ	ই	মু	০		ক	০	রি	দি	ন	০	

পা	ণা	ধা	পা	মা	া	I	গা	রগা	রা	I	সা	া	া	II II
তো	০	০	যা	০	য়		গ	ই০	য়া		০	০	০	

(ভট্টাচার্য্য, ২০২১ : ৭৫)

বাংলাদেশের লোকসংগীত এবং লোকসংগীতের সুর বৈচিত্র্যপূর্ণ। এজন্যই এই গান যুগ যুগ ধরে মানুষ তার শ্রুতি এবং স্মৃতিতে বহন করে চলছে। লোকসংগীতের সুরে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মতো যার নিজস্ব ওঠানামা আছে। লোকসাধকগণ সেই জোয়ার-ভাটার পথ ধরে নিজের হৃদয়ে যে সুরর আওয়াজ শুনতে পায় সেই সুর কণ্ঠে এনে গানের বিষয় অনুযায়ী সুর বাঁধে। তাই বাণী, ভাব ও সুরের যুগল মিলনে সার্থক শিল্প হয়। এজন্যই অঞ্চলভেদে লোকসংগীতের প্রতিটি ধারা যেমন বাউল, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মুর্শিদী ইত্যাদি গানের সুর ভাব অনুযায়ী বৈচিত্র্যময়। এসকল গানে সরাসরি কোনো রাগের ব্যবহার না হলেও বিভিন্ন মিশ্ররাগের সুরের ব্যবহার মনের অজান্তে লোকসাধকগণ যুক্ত করেন। এজন্যই সুখের গানগুলোর সুরের চলন একরকম, আবার বিরহ-বিচ্ছেদী গানের সুরের চলন অন্যরকম। এ সকল গানের সুরের চলন গড়ন সম্পূর্ণ ভাবের উপর নির্ভরশীল। ভাব থেকেই এ ধরনের গানের সুরের লয় নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের লোকসংগীতের এসব সুর স্বরলিপিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। যদিও স্বরলিপি সংগীতের সুর সংরক্ষণের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। বাংলাদেশের লোকসংগীতের এই বৈচিত্র্যময় সুর সংরক্ষণের জন্য লোকসংগীতের ধারাবাহিক চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তাই রাধারমণের গানের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিক চর্চার কোন বিকল্প নেই। তা না হলে এ গানের সুরের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়বে। কেননা রাধারমণের গানের ভাব এবং সুর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে কেবল স্বরলিপির উপর নির্ভর করে এ-গানের সুরবৈচিত্র্য বোঝা সম্ভব নয়। তাই স্বরলিপি দেখে তাল অনুযায়ী সুরের দিক অগ্রসর হলেও ভাব না বুঝে সঠিক লয় নির্ধারণ সম্ভব হয় না। রাধারমণের গান সুর এবং বাণীর যুগল মিলনে সামনের দিকে অগ্রসর হয়; এজন্য ভাব না বুঝে গানের সুরবৈচিত্র্য অনুসন্ধান করলে তা সৌন্দর্যহীন হয়ে

পড়বে। সেজন্য রাধারমণের গানের সুর বিশ্লেষণের পূর্বে গানের ভাব বুঝতে হবে আগে। শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যাকরণসহ বাংলা লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার সুর সম্পর্কে এবং সেই ধারার গানে আঞ্চলিক পরিচয়সহ বৈশিষ্ট্য জানা একান্ত প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

১. আহমদ, ওয়াকিল, (২০০৯), *বাংলা লোকসংগীত : ভাটিয়ালী*, লেখক সমবায়, ঢাকা

২. উল্লাহ, আহমদ, (২০১৫), *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ

৩. কবীর, জাহিদুল, (২০২২), *রাধারমণ দত্ত লোকদর্শন ও গীতিরূপ বিশ্লেষণ*, হাওলাদার প্রকাশনি, ঢাকা

৪. চক্রবর্তী, মৃদুলকান্তি, (২০২০), *লোকসঙ্গীত ও স্বরলিপি*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা

৫. চৌধুরী, অনিমেষ বিজয়, (২০২১), *অনিন্দ্য সুষমার কবি রাধারমণ*, গীতবিতান, বাংলাদেশ

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (২০১৬), *সংগীতচিন্তা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (২০১৭), *গীতবিতান*, অনিদ্য প্রকাশ, ঢাকা

৮. দাস, সুমনকুমার, (২০১০), *বাংলাদেশের ধামাইল গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, দাস, শ্রী সজনীকান্ত, (১৩৫৮), *পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী*, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

১০. বাগচী, তপন, (২০১৩), *রাধারমণের গান*, বর্ণায়ন, ঢাকা

১১. ভট্টাচার্য্য, বিপ্রদাস, (২০২১), *রাধারমণের গান ও স্বরলিপি*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা

১২. ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, (১৯৬৮), *বৈষ্ণ কবিতা*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি, কলকাতা

১৩. মজুমদার, বিবানবিহারী, (১৩৯৮), *পাঁচশত বছরের পদাবলী*, জিজ্ঞাসা প্রকাশন, কলকাতা

১৪. মাননান, আবদেল, (২০১০), *লালনসমগ্র*, নালন্দা, ঢাকা

১৫. শর্মা, নন্দলাল, (২০১৯), *রাধারমণ গীতিমালা*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

১৬. সেলিম, মাহমুদ, বিশ্বজিৎ রায়, (২০১৬), *স্মৃতিসত্তায় রাধারমণ*, রাধারমণ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা

চতুর্থ অধ্যায়

হাসন রাজার গানের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য

চতুর্থ অধ্যায়

হাসন রাজার গানের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য

৪.১ হাসন রাজার গানের বিষয়

হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) বাংলা মরমি সাধনার এক অনন্য কবি। যার চিন্তন ও সাধন পন্থা বাংলার মরমি ধারাকে দিয়েছে এক অসাধারণ রূপরেখা। হাসন রাজা তাঁর গানে শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে সুফি মতবাদকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। তাত্ত্বিকভাবে দেখলে সুফিবাদই তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু মনে হয়। তবে এর সঙ্গে কিছু পার্শ্বচিন্তাও (periphery) যুক্ত হয়েছে। ফলে তাঁর গানের বিষয়ে সুফিবাদ ভারতবর্ষীয় এবং রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বঙ্গীয় সাধনার ধারায় মিলিত হয়ে গৌড়িয় ও সহজিয়া বৈষ্ণবসহ অন্যান্য সাধন তরিকায় মিলিত হয়েছে। তাই হাসন রাজার গানে যেমন মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়ের বর্ণনা আছে, তেমনি সনাতনী ধর্মের বৈষ্ণব পদাবলির ন্যায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বিষয়ের উল্লেখও আছে। সুফিবাদের সুউচ্চ মরমি আদর্শই হাসন রাজাকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে তাই তাঁর গানে এই শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটে। সুফিবাদের এই প্রসঙ্গে গবেষক ড. তারাচাঁদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সূফিবাদ একটি জটিল চিন্তা পদ্ধতি। একটি নদী যেমন বহু স্থান থেকে আগত উপনদীর স্রোতে স্ফীত হয়, এও ঠিক তেমনি। এর আদি উৎস পবিত্র কোরান ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন। খ্রিস্টধর্ম ও নবপ্লেটোবাদী চিন্তায় তা পুষ্ট হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে কিছু ভাবনা তাতে যুক্ত হয়। যোরোয়াস্টিবাদ, মানিবাদ (manism) প্রভৃতি প্রাচীন পারস্যধর্ম থেকেও কোন কোন ভাবনা তাতে সংক্রমিত হয়। (ওয়াহাব, ২০০৭ : ২২৫)

এই দৃষ্টিতে হাসন রাজা একজন সুফি প্রেমিক পুরুষ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বাঙালি মনন চেতনার ধারক বাহক। তাই তিনি প্রচলিত শাস্ত্রীয় ধর্মের সাথে নিজেকে যুক্ত না রেখে বাঙালির দার্শনিক ও মরমিয়াবাদী ধারায় নিজেকে বিন্যস্ত করেছে। এই জন্যই তাঁর প্রেমিক মনন চেতনায় বাঙালি পরিচয়কে ভোলেননি; বরং তিনি লিখেছেন :

হাসন রাজা বাঙালী হয়ে কাঙালী
প্রেমানলে জ্বালিয়ে যায় প্রাণ

আমি তোমার বাঙালী গো সুন্দরী রাধা
আমি তোমার কাঙালী গো
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে
হাসন রাজা বাঙালী গো ॥
হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি খোদা
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুসল্লিয়ে দেয় বাধা ॥
(রাজা, ২০০৯ : ২৪)

হাসন রাজা উচ্চমার্গিয় সাধক, তাই তাকে প্রচলিত হিন্দুত্ব বা প্রচলিত মুসলমানিত্বের শাস্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে ফেলে বিচার করা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি সৃষ্টিশীল মরমি কবি এবং সুফি সাধক। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ও ভাবের গভীরতার জন্যই তিনি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। যত সময় গড়াচ্ছে তত বেশি তাঁর দর্শন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

কবি ও দার্শনিক টলস্টয়ের দর্শন চেতনার সাথে হাসন রাজার জীবন উপলব্ধির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। জমিদার হয়েও অতি সাধারণ জীবনযাপন তাঁকে অসাধারণ করে তুলেছে। তিনি হত দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে নিজেকে এবং তাঁর সম্পদকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। হাসন রাজার সম্পদের প্রায় সত্তর ভাগই ছিলো সিলেট এবং বিশ্বনাথে। তিনি তাঁর সম্পদের বৃহদাংশই সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। কারণ হাসন রাজা বিশ্বাস করতেন, রঙ্গীন জীবন বা দালানকোঠা কোন কিছুই স্থায়ী নয়। কেননা এই নশ্বর পৃথীবিতে ক্ষমতা, নাম, পরিচয়, সম্পদ একদিন হারিয়ে যাবে। তখন তার শুভকর্মই হবে একমাত্র সঙ্গী; তাঁর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই হবে মুক্তির পথ। যে পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানব-আত্মায় রূপ নিয়েছেন, সেই পরমের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তখন একমাত্র কাম্য হয়ে উঠেছিলো। তাই হাসন রাজার আত্মোপলব্ধি এবং পরমোউপলব্ধি দুইয়ের মিলনে এক উচ্চানুভূতিতে পৌঁছেছিলেন। যা সুফি দর্শনের সাধকগণের ন্যায় তাকে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি পরশে আবিষ্ট করত। ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পদ, বিত্তবৈভব যেন তার কাছে কেবলমাত্র ভোগের বিষয়। ঘর, জমিদারি বিষয়ে প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের বর্ণনা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> সুনামগঞ্জ শহরের লাগোয়া পশ্চিমে লক্ষণছিরি বা লক্ষণশ্রী গ্রামে (বর্তমান তেঘরিয়া গ্রাম) সুরমা নদীর দক্ষিণ দিকের তীরে ছিল হাসন রাজা সাহেবের ভদ্রাসন। কিন্তু তার বাড়ি দেখলে কে বলবে সেটা কোন জমিদার বাড়ি ? না দালান কোঠা, না পাকা ঘরদোর, পল্লী গ্রামের সাধারণ গৃহস্তবাড়ির মতো তারও ছিলো মাটির ঘর, খড়ের চাল, কোনটা বা ঢেউটিনের। তফাতের আর সংখ্যায় অনেকগুলো। ঘরের বৈঠকখানার

চোহারাও ছিল তথৈবচ, আসবাবপত্রের মধ্যে একখানা সাধারণ তক্তপোষ, তার উপরে ছেঁড়া পাতার শীতলপাটি বা জীর্ণ মলিন শতরঞ্জি, খানকয়েক নড়বড়ে চেয়ার, বেঞ্চি, টুল, টেবিল ইত্যাদি। সব মিলিয়ে যেন দীন-দশার চেহারা, জমিদার বাড়ির কোন জৌলুসের ছাপ ছিল না ঘরের বা ঘরের আসবাবপত্রে। কিন্তু পরিবেশটি ছিল মনোরম। বৈঠকখানার সামনেই পূর্বদিকে খোলা মাঠের মতো উঠোন আর উত্তরদিকে সুরমা নদীর অবাধ জলস্রোত। (কবীর, ২০২১ : ৫৮)

হাসন রাজা প্রিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে জাগতিক জীবনের সম্পদ ব্যাক্তি বৈভব থেকে নিজেই মুক্তি নিয়েছিলেন। তিনি মানুষের সাথে মিশে অসিমের আনন্দ লাভ করেছিলেন। তাই পাকা বাড়ি, দালানকোঠা, আরাম আয়েশ তাঁর কাছে ছিল তুচ্ছ। কারণ তিনি জানতেন এসব আয়েশী জীবন ক্ষণকালের, এসব ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই তিনি লিখেছিলেন :

লোকে বলে বলেরে ঘর বাড়ি ভালা না আমার
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার ॥
ভালা করি ঘর বানাইয়া, কয়দিন থাকব আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি, পাবনা চুল আমার ॥
এই ভাবিয়া হাসন রাজায়, ঘর দুয়ার, না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়, তার লাগিয়া কান্দে
জানত যদি হাসন রাজা, বাঁচব কতদিন
বানাইত দালানকোঠা করিয়া রঙ্গিন ॥
(কবীর, ২০২১ : ৪৭)।

হাসন রাজা ইসলামি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাই প্রকৃত সুফি যেমন জাগতিক মোহমায়ার ঊর্ধ্বে, সেরূপ তিনিও সে পথেই গমন করেছিলেন। তাই তো দুনিয়ার কোন লোভ, মোহ-মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

হাসন রাজা পাঞ্জাব থেকে আগত চিশতিয়া তরিকার পীর সৈয়দ মাহমুদ আলীর মুরিদ ছিলেন। তাই প্রকৃত সুফিদের ন্যায় হাসন রাজা নির্জনে বাস, দরিদ্রতা, পরপোকারীতা এবং নিভৃত সাধনা ও কোরান শরিফের মর্ম উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতেন। তাই তিনি কেবল সমাজের অনাচার বা জাগতিক অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তা নয়; বরং নিজের আত্মার দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতেন। সুতরাং তাঁর সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লার নৈকট্য লাভ।

এজন্যই তিনি প্রথমে শরিয়তের আইনকানুন বাস্তবজীবনে রূপায়ণের জন্য মুমিন মুসলমানদের আহ্বান করেছেন। পরবর্তী স্তরে তিনি প্রেমের মাধ্যমে পরমের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সুফিদের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে পরমে লীন হওয়া। ইসলামি শাস্ত্র মতে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরের কথা বলা আছে। মূলত আল্লাহর নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করতে হলে চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। তা হলো :

ক. শরিয়াত

খ. তরিকত

গ. হকিকত

ঘ. মারিফত

ক. শরিয়ত : কোরানের সরলীকৃত অর্থ বা সাধারণ অর্থ যা সকলের সামনে প্রকাশিত এবং সর্বসাধারণের জন্য তা অবশ্য পালনীয়। যা ইসলামে সরাসরি প্রকাশিত বিধানাবলি তাই শরিয়াত। আরো সহজভাবে বলা যেতে পারে শরিয়ত হলো মহান আল্লাহর দেওয়া প্রকাশ্য বিধান যা সরলভাবে পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা।

খ. তরিকত : সাধককে তরিকত স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যম হলো শরিয়তের বিধিনিষেধ ও পালনীয় বিধানাবলি সঠিকভাবে পালন করা। এই জন্য এ স্তরে এসে সাধকের একজন পথ প্রদর্শক বা পির আবশ্যক। অর্থাৎ তরিকত স্তরে এসে হকিকত এবং মারিফত স্তরে পৌঁছানোর জন্য সাধকের একজন আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের সাহায্য দরকার হয়। এই পথ প্রদর্শককে বলা হয় শাইখ বা পির যিনি তাকে যাবতীয় অন্তরসত্তায় পবিত্রকরণের শিক্ষা দেন। এই তরিকত স্তরের অনেকগুলো তরিকা আছে। কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তরিকা হলো চারটি : ১. কাদেরিয়া, ২. নকশাবন্দিয়া, ৩. চিস্তিয়া (উল্লেখ্য হাসন রাজা চিস্তিয়া তরিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন), এবং ৪. মুজাদ্দেদিয়া।

গ. হকিকত : তরিকত স্তর পার হয়ে সাধক হকিকত স্তরে পৌঁছায়। অর্থাৎ তরিকত থেকে আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশনায় হকিকতে যাত্রা। এই স্তরে কোরানের মূল অর্থ জানতে চাওয়া অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই হলো হকিকত। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তর অতিক্রমের পর সাধককে ধারাবাহিকভাবে তৃতীয় স্তর অতিক্রম করতে হয়।

ঘ. মারিফত : আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সর্বোচ্চ স্তর হলো মারিফত। এ স্তরে সাধক পরিশুদ্ধ মন দিয়ে স্বর্গীয় জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে আলোকিত করে। মারিফতে যারা আল্লাহর আরাধনা করেন, আল্লাহ তাকে দয়া করেন। তখন ব্যক্তির ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না, সাধকের সমস্ত কাজ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

এই চারটি স্তর পার করে আত্মসংযম, নিষ্ঠা ও নৈতিক উৎকর্ষের দ্বারা সুফি যে স্তরে উন্নিত হন তা হলো ফানাফিল্লা বা আত্মোৎসর্গ বা আত্মার বিনাশ এবং বাকা-বিল্লাহ বা স্রষ্টার নৈকট্য লাভ বলে পরিচিত। সাধনার এই স্তরে সুফি মতে পরমের সাথে মিলন ঘটে। সুফি যখন 'ফানা' থেকে 'বাকায়' পৌঁছায় তখন তার বিষয়ী ভ্রম কেটে যায়, ব্যক্তিগত বোধ তিরোহিত হয়, বিধান বা ধর্মাচারের আনুষ্ঠানিকতা লোপ পায়। সাধক সঠিক মিলনের স্তরে একাত্ম হয়ে যান। যে স্তরে মনসুর হাল্লাজ ঘোষণা করে 'আনাল হক' অর্থাৎ 'আমিই সত্য'। তদ্রুপ হযরত বায়েজিদ বোস্তামীও বলতেন 'আনা সুবহানি'।

হাসন রাজার সমগ্র জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই তাঁর মরমি দর্শন, সুফি দর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি শরিয়ত মেনে বুঝেই মারিফত স্তরে সাধন ভজন করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :

> আমি তাঁর কাব্য সাহিত্যের আলোচনা করে দেখেছি। তিনি প্রথমে শরীয়াতের আইন-কানুন বাস্তবজীবনে রূপায়নের জন্য মুমিন মুসলমানদের আহ্বান করেছেন। পরবর্তী স্তরে তিনি প্রেমের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়তমকে লাভ করার চেষ্টা করেছেন। সর্বশেষ স্তরে তিনি দার্শনিক রূপে তাঁর নিজের মধ্যেই সে প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। (আহ্মাদ, ২০১৯ : ৪৬)

দেওয়ান আজরফের এ বক্তব্যের স্বপক্ষে সহজেই যুক্তি মেলে হাসন রাজার গানের দর্শন থেকে। হাসন রাজা শরিয়তি মতে লিখেছেন :

নামাজ পড় নামাজ পড় ভাই মোমিন নামাজ পড়
একমনে পড়িও নামাজ চিত্ত করিয়া দড়
কাতার হইয়া নামাজ পড়িও একমনে
মাবুদ আল্লাহ জানিও যে তোমার সামনে
এই মতে নামাজ যে পড়িবে ভাই
নিশ্চয় জানিও তার বেহেস্তে হইবে ঠাঁই
নামাজ পড় রোযা রাখ কর এবাদাত
মমিন মুসলমানের ভাই মূল পথ ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২১৩)

আবার তিনি মারিফত পদ্ধতির চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর গানে। এ সকল গান থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় শাস্ত্রীয় ধর্ম ও আচরণবিধি সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। উপরে উদ্ধৃত গান শাস্ত্রীয় ধর্মের ইমান আকিদার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিখুঁত চিত্র। অর্থাৎ শরিয়তপন্থি চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উপরের গানে। এবার আসা যাক হাসন রাজার সাধনার ধারার ভিন্ন পথ-পন্থা ও পদ্ধতির মর্মবাদী রূপ বা মারিফতি বিষয়ে রচিত সংগীতের আলোচনায়।

হাসন রাজায় কয়
নামাজ রোযা ছাড়িয়া দিছি বেস্তে যাইবোর লয়
নামাজ রোযা করলেও ভেস্তে যাইবেরে নিশ্চয়
পরের মন্দ ছাড়িয়া দিছি দোযখেরই ডরে
বেস্ত দোযখ এরাফে বন্ধু নিওনাগো মোরে
বন্ধু ছাড়িয়া থাকব না গো এই মনে কয়
চরণ ধরিয়ে থাকি আমি এই মনে লয়
তিলেকমাত্র না দেখিলে মনপ্রাণ দয়
নাচে নাচে হাসন রাজা দেখিয়ে জগৎময়
পুরাও আকাঙ্ক্ষা মোর অঙ্গে করিয়ে লয়।

(রাজা, ২০০৯ : ৩০৩)

উপরোক্ত গানে হাসন রাজার মারিফতি চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। এ গানের মাধ্যমে হাসন রাজার মানসগঠনে শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে যে সুফি মতবাদ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তা বলা যায়। সুফিবাদের কেন্দ্রীয় ধারণায় মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে যে সম্পর্ক নির্মিত হয় তা প্রেমের। তাই হাসন রাজা প্রাণ বন্ধুকে ছেড়ে বেহেস্তে যেতে চায় না; কারণ সেখানে গেলে যদি প্রাণবন্ধুকে ছেড়ে থাকতে হয়। আবার দোযখেও যেতে চায় না একই কারণে। এখানে তাঁর মনের যে বাসনা তা ফুটে ওঠে গানের এই পয়ারের মাধ্যমে, যেখানে তিনি বলেছেন– "পুরাও আকাঙ্ক্ষা মোর অঙ্গে করিয়ে লয়"। এই পয়ার থেকে বোঝা যায় তিনি আত্মসংযম, নিষ্ঠা ও নৈতিক উৎকর্ষের মাধ্যমে 'ফানাফিল্লাহ' স্তরে উঠে স্রস্টার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করছেন। হাসন রাজা তাঁর সাধনার মাধ্যমে শরিয়ত থেকে মারিফত এবং 'ফানাফিল্লাহ' থেকে 'বাকাবিল্লায়' পৌঁছানোর যে বাসনা করেছিলেন অর্থাৎ সাধনার অতি উচ্চ মার্গে পৌঁছেছিলেন তাঁর রচনায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধনার 'ফানাফিল্লায়' আত্মোৎসর্গ বা আত্মার বিনাশের মাধ্যমে পরমের সাথে মিলন ঘটে। আবার সুফি যখন 'ফানা' থেকে বাকায় পৌঁছায় তখন

তাঁর বিষয় বিষয়ী ভ্রম কেটে যায়; তখন ধর্মাচারের আনুষ্ঠানিকতা লোপ পায়। তখন সাধক পরমের সাথে লীন হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন—আমি তিনি, যাকে আমি ভালোবাসি, এবং যাকে আমি ভালোবাসি তিনি আমি। সাধনার এই পর্যায়ে এসে হাসন রাজা লিখলেন :

বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি
সোনা মামি সোনা মামিগো
আমারে করিলারে বদনামি
আমি হইতে আল্লা রসুল আমি হইতে কুল
পাগলা হাসন রাজা বলে তাতে নাই ভুল
আমা হইতে আছমান জমিন আমি হইতে সব
আমি হইতে এজগত আমি হইতে রব
আপ চিনিলে দেখ খোদা চিনা জায়
হাছন রাজায় আপন চিনিয়ে এই গান গায়।

(রাজা, ২০০৯ : ২৪৭)

এই গান থেকে বোঝা যায়, হাসন রাজা আত্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমিত্বকে লীন করে নিজেকে পরমের সাথে যুক্ত করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, যেই দিকে তাকাই সবকিছুতে প্রাণবন্ধুকে দেখতে পাই। আমার আত্মার নূর যেন সব জায়গায় ছড়ানো। আসমান-জমিন ত্রিভূবন জুড়ে আমি। তাঁর অর্জিত এই আত্ম-জ্ঞানই হলো পরম জ্ঞান। যে জ্ঞান অর্জিত হলে নিজেকে চেনা যায়, আর যে নিজেকে চিনতে পারে সে আল্লাহকে চিনতে পারে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন, "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে (এটিকে হাদিসও বলা হয়)। হাসন রাজার গানে "বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি' অথবা আপন চিনলে খোদা চিনা যায়। এই উচ্চ মার্গের সাধানার সাথে মওলানা জালাল উদ্দিন রুমির বক্তব্যের মিল পাই। তিনি বলেছেন :

> The human being is an astrolabc of God but one needs an astronomer to know how to use the astrolabc ... When God makes a person to know himself through the astrolabc of that person's own being he can witness the manifestation of God and his uniqualified beauty moment by moment and glimmer by glimmer. That beauty is never absent from this 'mirror' (sings of the unseen : The discourse of Jalal Uddin Romi–Introduction and tanslation by W. M Thackston gr). (রাজা, ২০০৯ : ৩৩)

প্রভাতকুমার শর্মার মাধ্যমে হাসন রাজার মরমি দর্শনের সাথে পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ১৯২৫ সালে হাসন রাজার আটটি গান নিয়ে প্রভাতকুমার শর্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে শান্তিনিকেতনে দেখা করেন। এই মরমি কবিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও, তাঁর রচিত গান কবিগুরুকে অভিভূত করে। তবে হাসন রাজাকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য কবিগুরু প্রভাতকুমার শর্মা-কে লিখেছিলেন "ওহে পড়েছি গানগুলো। মনে হচ্ছে একটা কিছু যেন বলতে চায় লোকটি, ঠিক ধরতে পারছি না, এত কম কবিতায় ধরা যায় না (রাজা, ২০০৯ : ৭০)।" পরবর্তীকালে প্রভাতকুমার হাসন রাজার আরো পঁচাত্তরটি গান ডাকযোগে কবিগুরুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। হাসন রাজার কাব্যপরিচিতি কবিগুরুর কাছে উন্মোচিত হওয়ার পর এই ঘটনার অংশ বিশেষ দেশ পত্রিকাতে (২রা ফাল্গুন ১৩৭৬) প্রকাশিত হয়েছিল। হাসন রাজার উচ্চ মার্গিয় দর্শন- 'আমিই সত্য'। আমা হতে সকল বিশ্ব। এমন উপলব্ধির পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ Indian Philosopical Congress-এর সভাপতির অভিভাষণে তিনি প্রসঙ্গক্রমে হাসন রাজার দুটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তাঁর দর্শন চিন্তার সাথে বিশ্বকে পরিচয় করিয়ে দেন। ভাষণটি *Modern Review* (January 1925) পত্রিকায় "The Philosophy of our people" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

> It is a village poet of East Bengal who in his songs preaches the philosophical doctrine that the universe has its reality in its relation to the person; He sings,
>
> The sky and the earth are born of my own eyes
> The hardness and softness, the cold and the heat
> Are the product of mine own body;
> Thesweet smell and the bad are of my own nose.
> This poet sings of the eternal person within
> coming out and appearing before his eyes just as the vedic Rishi speakes of the person. Who in him,
> dwelling also in the heart of the sun.

I have seen the vision

The vision of mine own revealing itself,

coming out from within me.

The significant fact about this philosophical

poems is that they are of rude construction, written a

popular dialect and disclaimed by the academic

literature; they are sung to the people.

(কবীর, ২০২১ : ৬৪-৬৫)

লালন সাঁই–এর 'মনের মানুষ' রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণের মানুষ' আর হাসন রাজার 'প্রাণ প্রিয়া' সবই অন্তর্লোকের বিষয়। এই 'মনের মানুষ', 'প্রাণের মানুষ' ও 'প্রাণ প্রিয়া' সাথে বাঙালির সম্পর্ক অতিপ্রাচীন। আত্মা এবং পরমাত্মার এই সম্পর্ককে হাসন রাজা এক এবং অভিন্নরূপে দেখেছেন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা হাসন রাজার গানে মিলেমিশে লীন হয়ে গেছে। বাংলার লোক কবিদের দর্শন কবিগুরুকেও আকৃষ্ট করেছিল এবং মুগ্ধ করেছিল। তাইতো রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা দেখতে পাই-পরমাত্মা মানবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত :

তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি

তাই এসেছো নিচে

আমায় নইলে ত্রিভূবনেশ্বর

তোমার প্রেম হতো যে মিছে ॥

(ঠাকুর, ২০১৭ : ৮৭)।

হাসন রাজা মরমি কবি এবং সুফি সাধক হিসেবে আরো গভীরভাবে পরমের এই লীলাকে অনুধাবণ করেছেন। এবং তিনি সরাসরি তার অবস্থান জানান দিয়েছেন তাঁর রচিত সংগীতের মাধ্যমে। এই গবেষণায় হাসন রাজার সামগ্রীক জীবনের বিভিন্ন পর্বের রচিত অসংখ্য গান বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তত্ত্ব, পর্যায়গুলো তুলে ধরা হবে। যাতে করে শিক্ষার্থী, হাসন গবেষক, পাঠক সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সহজেই হাসন রাজার গানের মর্মবাণী, বিষয়বস্তু অনুধাবন করেন। যেন হাসন রাজার মরমি দর্শন সমাজে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। সমাজের মানুষ যারা বিবেক বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার ভোগবাদীতায় আশ্বস্ত হয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুদ্ধে মেতে উঠেছে তারা যেন হাসন রাজার এই মরমি চেতনাকে বুঝে আত্মশুদ্ধি লাভ করে। সে লক্ষ্যে হাসন রাজার এ পর্যন্ত উদ্ধারকৃত ৬৭২টি গানের মধ্যে থেকে হাসন রাজার

গানের বিষয়বস্তু, বিষয়শ্রেণির আলোকপাত করছি। হাসন রাজার বৈচিত্র্যময় সংগীতের বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর রচিত গানসমূহ পর্যালোচনা করা হলো :

১. হাসন রাজার গানে শরিয়ততত্ত্ব
২. হাসন রাজার গানে নবিতত্ত্ব
৩. হাসন রাজার গানে মুর্শিদতত্ত্ব
৪. হাসন রাজার গানে আশেক মাশুক
৫. হাসন রাজার গানে সুফি রহস্য
৬. হাসন রাজার গানে মারিফত তত্ত্ব
৭. হাসন রাজার গানে ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ তত্ত্ব
৮. হাসন রাজার গানে পুরাণতত্ত্ব

৪.১.১ হাসন রাজার গানে শরিয়ততত্ত্ব

শরিয়ত আরবি শব্দ। এর অর্থ রাস্তা বা পথ। এটি জীবন পদ্ধতি বা বিধিবিধান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামি আইন-কানুন বা বিধিবিধানকে একত্রে শরিয়ত বলা হয়। অর্থাৎ শরিয়ত হলো সেই সকল বিধিবিধান, যেখানে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশনা দিয়েছেন। শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি মানবজাতির জন্য সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. আকিদা বা বিশ্বাসগত বিধিবিধান
খ. নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত রীতিনীতি, এবং
গ. বাস্তব কাজকর্ম সংক্রান্ত নিয়মকানুন

সুন্দর ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। এই শরিয়ত হলো প্রকাশ্য বিদ্যা, গুপ্ত বিদ্যা নয়। বলা যেতে পারে, আল কোরানের সরলীকৃত অর্থ বা সাধারণ অর্থ সর্বসম্মুখে প্রকাশিত যা সাধারণভাবে পালনীয় তাই শরিয়ত।

ইসলাম মানুষের দ্বীনি ও বৈষয়িক সব অবস্থার সংশোধন ও সুষ্ঠু সংগঠনের উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় এসেছে। তাতে যেমন মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানুষের বস্তুগত ও বৈষয়িক জীবনকে সুন্দর শান্তিপূর্ণ করার ব্যবস্থা। শরিয়তের নিয়মকানুন পালনের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর

সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। মরমি কবি হাসন রাজা তাঁর বৈচিত্র্যময় সংগীত রচনায় উল্লেখ করেছেন শরিয়তপন্থী চিন্তা চেতনার কথা। যে গানগুলোর বাণী বিশ্লেষণ করলে তাঁর শরিয়তপন্থি ভাবধারার প্রকাশ পায়। এ সকল গান থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি হাসন রাজার ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে। নিচে হাসন রাজার শরিয়তপন্থী গানের উদাহরণ দেওয়া হলো :

১

নামাজ পড় নামাজ পড় ভাই মোমিন নামাজ পড়
একমনে পড়িও নামাজ চিত্ত করিয়া দড়
কাতার হইয়া নামাজ পড়িও একমনে
মাবুদ আল্লাহ জানিও যে তোমার সামনে
এই মতে নামাজ যে পড়িবে ভাই
নিশ্চয় জানিও তার বেহেস্তে হইবে ঠাঁই
নামাজ পড় রোযা রাখ কর এবাদাত
মমিন মুসলমানের ভাই মূল পথ ॥
আমি না লইলাম আল্লাজীর নাম।
না কইলাম তার কাম।
বৃথা কাজে হাছন রাজায় দিন গুয়াইলাম ॥
ভবের কাজে মত্ত হইয়া দিন গেল গইয়া।
আপন কার্য না করিলাম, রহিলাম ভুলিয়া ॥
নাম লইব নাম লইব করিয়া আয়ু হইল শেষ।
এখনও না করিলাম প্রাণ বন্ধের উদ্দেশ।
আশয় বিষয় পা্য়া হাছন (তুমি) কর জমিদারী ॥
চিরকাল থাকিবে নি হাছন রাজা লক্ষণছিরি।
কান্দে কান্দে হাছন রাজা, কী হবে উপায় ।
হাসরের দিন যখন পুছিবে খোদায় ॥
ছাড় ছাড় হাছন রাজা, এই ভবের আশ।
(কেবল) এক মনে চিন্তা কর, হইতাম বন্ধের দাস ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২১৩)

২

নমাজ পড় নমাজ পড় ভাই মমিন নমাজ পড়।
এক মনে পড়িও নমাজ চিত্ত করিয়ে দড় ॥
কাতর হইয়া নমাজ পড়িও এক মনে।
মাবুদ আল্লা জানিও যে তোমার সামনে ॥
সাক্ষাতে আল্লা তালা দড়াইও দিলে ॥
কবুল হইবে নমাজ, ছিজদা করিলে।
কাকুতি মিনতি করিয়া নমাজ পড়িও।
আল্লা বিনে নাহি কিছু মনেতে রাখিও।
এই মতে নমাজ যে পড়িবেক ভাই।
নিশ্চয় জানিও তার বেহেস্ত হবে ঠাঁই।
নমাজ পড়, রোজা রাখ, কর এবাদত।
এমিন মুসলমানের ভাই মূল এই পথ ॥
হাছন রাজায় সেলাম দেয় নমাজি সব ভাই।
নমাজ রোজা ছাড়িও না আল্লার দোহাই ॥
মুই গুণাগারের প্রতি দোয়া করিও ভাই।
আশিক হাছন রাজা যেন আল্লার দিদার পায় ॥

(আহ্‌মদ, ২০১৯ : ২৫৬)

৩

মমিন আরে ভাই ঈমান রাখিও দড়।
ঈমান না থাকিলে মমিন কিসের নমাজ পড় ॥
ও ঈমান রাখিও দড় ॥
এক আল্লা বিনে রে শরিক নাহি তাঁর।
লা শরিক জানিলে মমিন হইবায় উদ্ধার।
ও ঈমান রাখিও দড় ॥
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু জানিবায় সার।
মোহাম্মদ মুস্তফা নবী রছুল আল্লার।

নবীকে ভেজিলা আল্লা হেদায়েত কারণ ॥

কোরান নাজিল কৈলা অমূল্য রতন ॥

আল্লার কালাম আইল নবিজীর ঠাঁই।

জিবরিল ফিরিস্তায় কালাম আনিয়া দিলা ভাই।

আল্লার কালামের কথা জানিবার হক্।

নবীজির হাদিছের কথা জানিবায় বেশক।

ঈমান রাখি, ভাব রাখিও আর রাখিও ভক্তি।

ঈমানে মরিলে মমিন পাইবায় মুক্তি।

হাছন রাজায় ভিক্ষা চায় ও আল্লা ঈমান তোমার ঠাঁই।

জান বাহির হইতে যেন তোমায় দেখিয়া যাই।

ও ঈমান রাখিও দড় ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২৫৮)

৪

মমিন বান্দা হ নমাজ রোজা দৃঢ় পড়।

আল্লাজির নাম মমিন চিত্তে করিয় দড় ॥

নমাজ পড় রোজা রাখ হুকুম মানিও।

পাঁচ চিজ কনজ্জরা আমল করিও।

নমাজ পড়িতে দিলেকে রুজুও করিও।

আল্লা তোমার সাক্ষাতেতে মনে দড়াইও।

তুমি নাহি দেখ আল্লা, আল্লায় তোমায় দেখে।

এক মনে রাখিও বাব আল্লা যে সম্মুখে।

ঈমান দড়াইয়া মনে ছিজদাও দিও।

ছিজদাতে থাকিয়া খুব আজিজি করিও ॥

কাকুতি মিনতি করিও, না করিও ভুল।

ঈমান রাখিও দড় সকলেরই মূল ॥

এই মতে নমাজ যদি পড়িবারে পার।

নবীজীর সফাতে যাইবায় বেস্তখানা ঘর ॥

সুখে সম্মানে যাইয়া থাকিবায় ভাই।

খুশিতে রহিবে সদায় আর দুঃখ নাই ॥
হাছন রাজায় বলে আমার সুখের কার্য নাই।
বন্ধুরে যে সদায় দেখি এই আমি চাই ॥

(আহ্‌মদ, ২০১৯ : ২৫০)

৫

মরণ কথা স্মরণ হইল না হাছন রাজা, তোর,
মরণ কথা স্মরণ হইল না।
যখনে মরিয়া যাইবায়, মাটিতে হইব বাসা।
তখনে কোথায় রইব রঙ্গের রামপাশা।
ঘাড় খাইব হাড়ুয়া পোকে, মাড়ইল খাইব ঘুনে।
পূণ্য পন্থা না চিনিলায় যৌবনের গুমানে।
না রহিব ঘর বাড়ি না রহিব সংসার।
না রহিব লক্ষণছিরি না পরগণার।
কান্দিয়া হাছন রাজায় বলে, আল্লা কর সার।
কি ভাবিয়া নাচ হাছন শূন্যের মাঝার।

(রাজা, ২০০৯ : ২৫৯)

৪.১.২ হাসন রাজার গানে নবিতত্ত্ব

পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন আদি পিতা হজরত আদম (আ.)। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এবং একই সঙ্গে মানবজাতিকে হেদায়েতের জন্য আদিপিতাকে নবুওয়্যাত দান করেছিলেন। এরপর প্রতি যুগে সব মানুষের জন্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। নবুওয়্যাতের এই ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে।

নবি শব্দের অর্থ দূত বা বার্তাবাহক। আরবি 'নাবা' শব্দ থেকে 'নবি' শব্দের উৎপত্তি। নাবা অর্থ খবর। পবিত্র কোরানের পরিভাষায় নবি হলেন মহান আল্লাহর সুসংবাদ প্রদানকারী বিশেষ দূত। অতএব নবি হলেন এমন সত্ত্বা যিনি মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত বিশেষ ব্যক্তি; যার মাধ্যমে আল্লাতায়ালার জাহেরি ও বাতেনি জ্ঞানের প্রকাশ পায়।

দুনিয়াতে যুগে যুগে বহু নবি রাসুলের আগমন হয়েছে। তাঁদের কাছে এসেছে আসমানী কিতাব। যেমন তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিন ও সবশেষ কিতাব কোরান। এছাড়াও, নবিদের বিভিন্ন সহিফা পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেক নবিকেই তাঁর যুগে খোদাকে পাওয়ার উছিলা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের কাছে এসেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মহান আল্লাহতায়ালা নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোরান নাজিল করেছেন।

আল্লাহর নির্দেশে পরবর্তীকালে নবি মুহাম্মদ (সা.) কুরান প্রচার করেন এবং আল্লাহর গুণক্ষমতা মানুষকে বুঝান। আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদ (সা.)-কে জাহেরি এবং বাতেনি জ্ঞানদান করেছিলেন। বাতেনি বা গুপ্ত বিষয়গুলো আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন।

কাবাবাসীকে হেদায়াতের জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে হজরত ইবরাহীম (আ.) নিজপুত্র ইসমাইল (আ.)-কে সাথে নিয়ে কাবাঘর সংস্কার করার পর প্রার্থনা করেছিলেন, যেন আল্লাহতায়ালা কাবাবাসীর জন্য রাসুল প্রেরণ করেন, যিনি কাবাবাসীকে হেদায়াতের বাণী শুনাবেন। এই বিষয়ে পবিত্র কোরানের সুরা আল-বারাকার ১২৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে। উক্ত আয়াতে হজরত ইবরাহীম (আ.) মক্কাবাসীর মধ্যে থেকে যে রাসুল প্রেরণের জন্য আবেদন জানান, সেই রাসুলের ওপর তিনি চারটি দায়িত্ব অর্পণ বা পালনের কথাও উল্লেখ করেন। যেমন :

ক. আসমানী গ্রন্থের আয়াতসমূহ তাদের পাঠ করে শোনাবেন। অর্থাৎ নাযিলকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের অবগত করবেন।

খ. অবতীর্ণ কিতাবটি তিনি তাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিবেন।

গ. তিনি সেই লোকদের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ও শিক্ষা দিবেন। এবং

ঘ. তিনি সেই লোকদের আত্মিক পবিত্রকরণ পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন।

সুরা আল-বারাকায় ১২৯ নম্বর আয়াতের শেষ দুটি দায়িত্বের বিষয়ে গবেষক মোস্তাক আহমেদ তার *হাসন রাজার মরমী সংগীতের সূফিরহস্য* গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

বর্ণিত আয়াতের শেষে উল্লেখিত দুটি দায়িত্বের একটি হলো হিকমত, এবং অপরটি তাযকিয়ায়ে নফ্স পদ্ধতি। হিকমত দ্বারা ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ধর্মীয় কলা-কৌশল শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ দেহ ও আত্মা, এই দুইয়ের সংযোগ, সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলেই মানবদেহ। এই দুইয়ের

> সংযোগ সাধনের নামই ধর্মীয় বিজ্ঞান, সূফিদর্শন, বা তাসাউফ তত্ত্ব। শারীরিক ও মানবিক দায়িত্ববোধ পালনের নামই শরিয়ত। আর আত্মিক কলাকৌশল সম্পর্কে জানার নামই আত্মজ্ঞান ইলমে বাতেন, ইলমে নামকরণ করা যায়। সূফিবাদের মতে, আত্মিক উন্নতি আত্মোন্নতি সাধন, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়রোধ অথবা তরীকতের পথে আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথ নির্দেশ করে। সে সাথে তিনি তাঁর আত্মশক্তির রেখাপাত ও শাগরিদের আত্মায় ঘটিয়ে থাকেন। (আহ্মাদ, ২০১৯ : ২৪১)

উল্লেখিত আয়াতের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, 'ইউযাক্কীহিম' দ্বারা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ আত্মশুদ্ধি বাদে মানবাত্মা পবিত্র হয় না। আর এই আত্মশুদ্ধির জন্য তাসাউফ বা সুফি সাধনা শিক্ষার প্রয়োজন। এই তাসাউফ শিক্ষার প্রয়োজনেই একদল সাহাবা দুনিয়ার লোভ থেকে মুক্তি নিয়ে রাসুল (সা.)-এর সাহচর্যে বাস করতেন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত বহু মনীষী আল্লাহকে পাবার আশায় নবিকে ভালোবেসে তাঁর দেখানো পথে জীবনযাপন করেছেন। নবিতত্ত্ব, নবিপ্রেম নিয়ে সাধক লালন সাই বহু তত্ত্ব-গান রচনা করেছেন। লালন সাই নবি তত্ত্ব নিয়ে লেখেন :

নবী না চিনলে সে কি আল্লা পাবে
নবী দীনের চাঁদ তা দেখো নারে ভেবে ॥

(মাননান, ২০১০ : ১১৩)

ঠিক একইভাবে দয়ার নবিরপ্রেমে মশগুল হয়ে মরমি কবি হাসন রাজার নবিতত্ত্ব বিষয়ক গান রচনা করেন। নিম্নে হাসন রাজার নবিতত্ত্ব বিষয়ক গানের উল্লেখ করা হলো :

মমিন বান্দা হ নমাজ রোজা দৃঢ় মনে পড় ।
আল্লাজির নাম মমিন চিত্তে করিয়া দড় ॥
নমাজ পড় রোজা রাখ হুকুমও মানিও।
পাঁচ চিজ কনজ্জরা আমল করিও ॥
আল্লা তোমার সাক্ষাতেতে মনে দড়াইও ॥
তুমি নাহি দেখ আল্লা, আল্লায় তোমায় দেখে।
এক মনে রাখিও ভাব আল্লা যে সম্মুখে।
ঈমান দড়াইয়া মনে সিজদাও দিও।
সিজদাতে থাকিয়া খুব আজিজি করিও।
কাকুতি মিনতি করিও, না করিও ভুল।

ঈমান রাখিও দড় সকলেরই মূল ॥
এই মতে নমাজ যদি পড়িবারে পার।
নবীজির সফাতে যাইবায় বেস্তখানা ঘর ॥
সুখে সম্মানে যাইয়া থাকিবায় ভাই।
খুশিতে রহিবে সদায় আর দুঃখ নাই ॥
হাছন রাজায় বলে আমার সুখের কার্য নাই।
বন্ধুরে সে সদায় দেখি এই আমি চাই ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২৫৮)

৪.১.৩ হাসন রাজার গানে মুর্শিদতত্ত্ব

বাংলা লোকসাহিত্যে, বিশেষত মরমিয়া ধারার গানে "মুর্শিদ" বা আধ্যাত্মিক গুরু একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র। এই মুর্শিদ বা গুরু কেবল ধর্মীয় উপদেশদাতা নন বরং একজন পথপ্রদর্শক– যিনি আত্মার মুক্তির সোপান। হাসন রাজা ও তাঁর সমসাময়িক অনেক মরমি কবি-সাধক এই মুর্শিদ তত্ত্বকে তাঁদের সাধনার কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছেন। হাসন রাজার গানে মুর্শিদের প্রতি ভক্তি, আস্থা, আত্মসমর্পণ ও গুরুবাক্যের গুরুত্ব বিশেষভাবে দেখা যায়, যা তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবজীবনের উপলব্ধিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

হাসন রাজা জীবন ও জগতের চূড়ান্ত সত্যের সন্ধানী। তাঁর দৃষ্টিতে এই সংসার হলো এক মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ জগৎ, যেখানে মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, পরম সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই বিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমই হলেন একজন প্রকৃত মুর্শিদ। হাসন রাজার গানে মুর্শিদকে তাই কখনো কখনো পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব হিসেবে দেখা হয়েছে। যেমন :

আমার মনের মাঝে আছে ধন
বুঝতে পারবে যে ভাইরে সুজন
গুরুর পদে কর রে সাধন
গুরু বাক্য ঠিক রাখিলে পাবিরে তুই নিরঞ্জন

(রাজা, ২০০৯ : ১১৫)

এই গানে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, হাসন রাজা আত্ম-উন্মোচনের উপায় হিসেবে গুরুভক্তির কথা বলছেন। তাঁর মতে, মানুষের মনেই লুকিয়ে আছে পরম ধন–অর্থাৎ আত্মা বা পরমাত্মার স্পর্শ–কিন্তু সেই ধনকে উপলব্ধি করতে হলে একজন গুরুর কাছে যেতে হয়। গুরুর পদে সাধনা না করলে, তাঁর বাক্য পালন না

করলে, সেই অন্তর্নিহিত ধন উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এটি সরাসরি সুফি দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে গুরুর (মুর্শিদের) মধ্য দিয়েই আত্মা আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

"গুরু ভক্তি করলে পাবি মুক্তি বলেরে হাসন"–এই পঙক্তি গানটির সার-সংক্ষেপ বলা চলে। এখানে মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে গুরুভক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একথা শুধু ধর্মীয় উপদেশ নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের বহিঃপ্রকাশ। হাসন রাজা বারবার বুঝিয়ে দিতে চান, বাহ্যিক আচার-বিচারের মধ্যে নয় বরং একজন মুর্শিদের প্রতি নির্ভরশীলতা ও গভীর আস্থার মধ্য দিয়েই আত্মিক মুক্তি অর্জন সম্ভব।

এই তত্ত্ব তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গানে–"পার করে দে ভব নদী এগো মুর্শিদ"–তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে তিনি নিজেকে সংসার নদীর মাঝখানে অসহায় নাবিক হিসেবে কল্পনা করেছেন, যার একমাত্র আশ্রয় মুর্শিদের দয়া। এখানে মুর্শিদ যেন একাধারে পথপ্রদর্শক, নৌকাবাহক ও ত্রাণকর্তা। হাসন রাজা আত্মিক দীনতার কথা অকপটে স্বীকার করেন, বলেন–"পয়সা করে নাই মোর কেমনে হইমু পার", অর্থাৎ তিনি নিজে নিজে মুক্তি লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন নন। এই বিনয়, আত্মসমর্পণ এবং মুর্শিদের প্রতি অগাধ আস্থাই তাঁর মুর্শিদতত্ত্বের মর্মবাণী।

হাসন রাজা বলেন, "মায়াজালে বন্দী হইয়া, আপন চিনলি না"–এই পঙ্‌ক্তি আধ্যাত্মিক অজ্ঞতার বিরুদ্ধে এক ধরনের দ্রোহ প্রকাশ করে। মানুষ নিজের আসল পরিচয় ভুলে গিয়ে বাহ্যিক জগতের মোহে হারিয়ে যায়, ফলে সে আর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় একটিই–গুরু বা মুর্শিদের আশ্রয়। হাসন রাজার কাছে মুর্শিদ হলেন সেই আলোর দিশারী, যিনি শিষ্যকে নিজস্ব সত্তার গভীরে নিয়ে যান, এবং আত্মোপলব্ধির পথ দেখান।

এভাবে হাসন রাজার গানে মুর্শিদতত্ত্ব নিছক ধর্মীয় বয়ান নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক যাত্রার দিক-নির্দেশ। তিনি মুর্শিদকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন এক আত্মিক অন্বেষার মাধ্যমে, যে অন্বেষায় নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে জানা সম্ভব। তাঁর গানগুলোতে মুর্শিদের প্রতি নির্ভরতা, তাঁর আদেশ পালনের গুরুত্ব এবং আত্মার মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে মুর্শিদকে বরণ করার আহ্বান বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

এই তত্ত্ব বাংলা মরমি সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক। লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, পাগলা কানাই-এর মতো সাধকদের গানে মুর্শিদের ভূমিকা যেমন গভীর তাৎপর্যময়, হাসন রাজার গানেও মুর্শিদ ঠিক ততটাই কেন্দ্রীয় এক চরিত্র। পার্থক্য হলো, হাসন রাজা ব্যক্তিগত অনুশোচনা, অন্তর্জগতের উদ্বেগ ও শূন্যতা নিয়ে এ তত্ত্বকে ব্যক্ত করেছেন আরও আন্তরিক ও সরল ভঙ্গিতে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, হাসন রাজার গানে মুর্শিদ তত্ত্ব কেবল একটি আধ্যাত্মিক মতবাদ নয়, বরং তাঁর জীবনদর্শনের অঙ্গ। এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তিনি মানবজীবনের মূল লক্ষ্য–আত্মোপলব্ধি ও মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর গান আজও লোকজ মানুষের হৃদয়ে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। কারণ এই গানগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মার মুক্তির জন্য বাহ্যিক কিছু নয়, বরং একজন প্রকৃত মুর্শিদের দয়া, পথনির্দেশ এবং নিজের গভীর আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট। নিচে হাসন রাজার মুর্শিদতত্ত্বের গান তুলে ধরা হলো :

১

আমার মনের মাঝে আছে ধন, বুঝতে পারবে যে ভাইরে সুজন।
মনের মাঝের ধন - তারে জান না রে মন,
গুরুর পদে কর রে সাধন।
(ওরে) গুরুর বাক্য ঠিক রাখিলে
পাবিরে তুই নিরঞ্জন ॥
শুনরে মন কানা,
ও তুই দেখিয়া দেখলে না,
মায়া জালে বন্দি হইয়ে
আপনা চিনলে না।
(আরে) ভক্তি করলে মুক্তি পাবে,
বলে রে হীন হাছন ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১১৫)

২

আমার মনে লয় থাকিতাম বন্ধের হুজুর।
করিতাম প্রাণনাথের সেবা হইয়া তাঁর মজুর ॥
(আর) মনে লয় সদা থাকিতাম চাইয়া।
এই কথা অন্তরেতে উঠে রইয়া রইয়া ॥
মনে আমার উঠে পড়ে সদায় চাইয়া থাকি।
পলক না মারিও বলি, ওরে আমার আঁখি ॥
মনবাসনা পূর্ণ কর, দয়ার ঠাকুর।

চরণ ছাড়া আমারে যে, না রাখিও দূর ॥
চরণ ভিক্ষা চাই আমি তোমার ও ঠাঁই।
চরণ ছাড়া কোন স্থানে আমি যে না যাই
বেহেস্ত, দুজখ, এরাফের, আমার এর কার্য নাই।
তোমার সাক্ষাতে থাকিয়া চরণ যে ধুয়াই ॥
তোমার কাঙ্গাল হাছন রাজা, বলে হুতাশ হইয়া।
দূরে রাখলে মরবে কাঙ্গাল গলে ছুরি দিয়া ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১১৬)

৩

কপাল পুড়া মনে মরে মাইল গো।
কিসে কি যে মনে করে, স্বাধীন হয় গো ॥
মন যার ভাল হয় সবে ভাল কয় গো।
মন যার দুষ্ট হয় সবে মন্দ কয় গো ॥
মনেতে আউলিয়া হয় মনেতে দরবেশ গো।
মনে চুর চুট্টা হয় আর হয় ডাকাইত গো ॥
হাছন রাজায় বলে মন, হইয়াছে মূল গো।
মনেতে ঈশ্বরে মিশে, মনেতে শয়তান গো ॥
ভাল মন্দ মাবুদ আল্লায়, মনের মাঝে দিছে।
মনেতে পার হইয়া যাবে, মনে ডুবিবে গো ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১৬৭)

৪

পার করে দে ভব নদী এগো দিদি ॥
পয়সা কড়ি নাই মোর, কেমনে হইমু পার।
দয়া করে পার করে দে, তোমারে সাধি।
পার হইবার উপায় নাই, হাছন রাজা কান্দে তাই।
ভব সিন্ধুয়ে ডুবে মরি, ছয় জনা বিবাদী ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২১৯)

৪.১.৪ হাসন রাজার গানে আশেক মাশুক

হাসন রাজার গানগুলোতে একধরনের আকুলতা, নিরবধি প্রেম এবং আত্মদানের ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যা ইসলামি সুফিবাদের আশেক-মাশুক তত্ত্বের সাথে অদ্ভুতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। আশেক অর্থ প্রেমিক, মাশুক অর্থ প্রেমাস্পদ–এই প্রেমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আল্লাহ, যাঁর প্রতি একজন প্রেমিক আত্মাকে সমর্পণ করে নিঃশেষ হতে চায়। হাসন রাজার গানে এই আত্মিক প্রেমের স্বরূপ, চাহিদা ও ফলাফল গভীর ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে।

হাসন রাজা তাঁর গানে বলেন, "ছাড়িয়া থাকতে পারবো না আমি বন্ধেরে গো/সে যে আমার আমি তার নাহি ছাড়াছাড়ি"–এই পঙ্‌ক্তিগুলো নিছক দাম্পত্য প্রেম নয়, বরং এক অন্তর্মুখী আত্মিক সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। এখানে 'বন্ধু' বলতে বোঝানো হয়েছে সেই চিরন্তন প্রেমাস্পদ–আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর সাথে প্রেমিকের সম্পর্ক কোনও বাহ্যিক বন্ধন নয়, বরং অস্তিত্বগত। হাসন রাজা প্রেমিক (আশেক) হিসেবে ঘোষণা দেন, "আমি নয় রে জুদা (মিথ্যা)"–অর্থাৎ, এই সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ চরম আত্মিক একতা আল্লাহ ও বান্দার প্রেমে প্রতিফলিত হয়, যাকে সুফিবাদে বলা হয় তাওহিদে ইশক–প্রেমের মাধ্যমে ঐক্য।

তাঁর গানে তিনি রাধা-কৃষ্ণের উপমা টেনে বলেন, 'যেমন শ্রীকৃষ্ণের এক অঙ্গী শ্রীমতি রাধা'–যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি একজন মুসলমান হয়েও হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ প্রেম প্রতিমূর্তি রাধাকৃষ্ণের উদাহরণ টেনেছেন, যা প্রমাণ করে তাঁর ভাবনার সীমা ধর্মীয় গণ্ডির চেয়েও বহুদূর বিস্তৃত। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম ছিল আত্মিক, চিরন্তন এবং অবিচ্ছিন্ন–ঠিক তেমনই হাসন রাজাও তাঁর মাশুক আল্লাহর সঙ্গে এই অবিচ্ছেদ্য প্রেমে যুক্ত থাকতে চান।

আশেক-মাশুক তত্ত্বে প্রেমিক আল্লাহর প্রেমে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর অস্তিত্বের সবকিছুই প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিত হয়। হাসন রাজার অন্য আরেকটি গানে আমরা দেখি, প্রাণ কেন ছটফট করে লো দেখি তোর যৌবনের বাহার–এখানে 'তোর যৌবন' বলতে বোঝানো হয়েছে মাশুকের রূপ, যা আত্মাকে উদ্দীপ্ত করে। এই প্রেম যেন তাঁর সত্তাকে টেনে নিয়ে যায় এক অলৌকিক মিলনের দিকে। প্রেমিক হয়ে তিনি শুধু মাশুকের জন্য অপেক্ষা করেন, গান গেয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়ান, তাঁর প্রেমে 'প্রাণ লয়ে যায়'–নিছক আবেগের কথা নয়, আত্মার সমর্পণের স্বীকৃতি।

সব মিলিয়ে, হাসন রাজার গানে আশেক-মাশুক তত্ত্ব শুধু একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নয়, বরং তাঁর শিল্প-সাধনার প্রাণ। তাঁর গানের প্রতিটি চরণে ফুটে ওঠে সেই আত্মিক আকুলতা, প্রেমিকের ব্যাকুলতা এবং একাত্মতার সাধনা। এই গানের মাধ্যমে আমরা শুধু একজন লোককবিকে নয়, বরং একজন আত্মিক সাধক, এক সুফিকে খুঁজে পাই–যিনি গানকে বানিয়েছেন ঈশ্বর প্রেমের বাহন। তাঁর আশেকী জীবনের প্রকাশ এই গানগুলো আমাদেরকে নিয়ে যায় সেই আত্মিক উচ্চতায়, যেখানে প্রেমই পথ, প্রেমই সাধনা, আর প্রেমই পরম প্রাপ্তি। নিচে হাসন রাজা রচিত আশেক মাশুক তত্ত্বের গান তুলে ধরা হলো :

১

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে, রে মন,
খোদা মিলে প্রেমিক হইলে ॥
আর যদি খোদা ধরতে চাও –
তার সনে পিরীতি বাড়াও।
হায়রে, মিলিব মিলিব খোদা
প্রেমে তার মজিলে ॥
আর মিলিবে না রে প্রাণের খোদা
তছবি জপিলে।
হায়রে, মিলবে না, মিলবে না খোদা-
মাথা কুটি মইলে
আর মিলবে না রে প্রাণের খোদা,
নমাজ রোজা কইলে।
হায়রে, মিল্‌বে না মিল্‌বে না খোদা
হাছন রাজায় বইলে।

(রাজা, ২০০৯ : ১৮১)

২

ও জান বাইর হইল
যাইব বন্ধের বাড়ির জান বাহির হইলে রে ॥
হাছন রাজার জান যাইবে আল্লা কাছে উড়ি।
নমাজীরা বেহেস্তে পড়ি যাইবা গড়াগড়ি ॥
দুনিয়াদারের জানিবায় দুজখে বসতি।

দিনে রাইতে দুনিয়ার লাগি যার আছে মতি ॥
নমাজ রোজা নাহি করে, দুনিয়ার মায়া নাই।
নিশ্চয় জানিও তার এরাফেতে ঠাঁই ॥
আশিক লোকের জান থাকবে আল্লার আরশের তলে।
নাচিয়া নাচিয়া, আশিক হাছন রাজায় গান বলে ॥
(রাজা, ২০০৯ : ১৫১)

৩

আমি বান্দার কি লেখলায় নছিবে রে, হায়রে নাথ
আমি বান্দার কি লেখলায় নছিবে রে।
দূরে পড়িয়া থাকানি মোর নছিবের ঘুচিবে রে ॥
আছিলাম তোমার দ্বারি, নছিবে মোর কইল পরী।
তোমার লাগি দিনে রাইতে ঝুরি রে ॥
দিবা নিশি ঝুরিয়া মরি, ছাড়িয়া কি আর থাকতে পারি।
আবার মনে দাসত্ব যে করি রে ।
ভুলিতে না পারি তোরে, মন আমার কি যে করে।
আকাঙ্ক্ষা মোর থাকি তোর হুজুরে রে।
যে জনে দেখিয়াছে তোরে, সে কি ভুলিয়ে থাকতে পারে।
চান্দ মুখ দেখলে কি পাসরে রে ॥
পুরাও মোর মনের আশা, চরণতলে দিয়ে বাসা।
কাঙ্গালেরে রাখ চরণ তলে রে ॥
হাছন রাজা আশিক বলে চরণ ছায়ায় না রাখিলে।
(আরে) পড়িয়া মরমু তোমার দোয়ারে রে ॥
(রাজা, ২০০৯ : ১২৭)

৪

বন্ধে কেন আমার ভালবাসে না।
ছয় মাসে নয় মাসে একদিন আসে না ॥
আমি বলি আইস তারে, সে তো যায় গিয়া পরের ঘরে।
কাকুতি মিনতি করি আমার ঘরে বসে না ॥
কপালে মোর কী যে লেখা, লেখিয়াছে প্রাণ সখা।

দিয়ে দেখা আয় না কাছে প্রাণ মোর বাঁচে না ॥
কী যে আমি কী করিব, কেমন করিয়ে মন ফিরাব।
কত যত্ন করি তারে সেতো আমার হয় না ॥
হাছন রাজা কান্দিয়ে বলে আবার আসলে ধরব গলে।
তুলিয়ে লইব প্রিয় কোলে, ছাড়িয়া দিব না ॥
(রাজা, ২০০৯ : ২৩৭)

৫

প্রেমের জ্বালায় হাছন রাজা বলিল বন্ধুরে।
তুমি হইলায় প্রেমের সিন্ধু আমি বিন্দু রে।
কান্দা কুটা দেখিয়া বন্ধে বলিল আমার।
হাছন রাজা তুই আমার আমি যে তোমার।
দিলা ভরসা দিয়া এই করিল।
হৃদয়ে আসন করি বন্ধু বসিল
নাচে নাচে হাছন রাজা বন্ধু চিত্তে লইয়া
আমার বনে ঘরে বাইরে দামালি দেয় আনন্দে মজিয়া।
(রাজা, ২০০৯ : ৫৪২)

৬

পিরীতের ধারা, সে তো জানে না রে।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে, হইছে কারাবারা।
যখন আমি প্রেম প্রিয়সী, দেখায় তারাবারা।
দেখামাত্র হাছন রাজা, হইয়ে যায় সারা।
আঁখি দুইটি ঝলমল করে, আসমানে তারা।
দেখিয়ে হাছন রাজায় নাচে, হইয়ে প্রেমে মারা ॥
হাছন রাজা পিরীত করে জিতে হইছে মরা ।
কত মতে ধরতে চায়, পারে না অধরা ॥
(রাজা, ২০০৯ : ২২৬)

৭

ধর দিলারাম, ধর দিলারাম, ধর দিলারাম ধর।
হাছন রাজারে বান্ধিয়া রাখ দিলারাম তোর ঘর।

হাছন রাজা হাওয়ার মানুষ উঠিয়া দিল লড়।
গেলে না পাইবে আর তাহার খবর ॥
ধর দিলারাম, ধর দিলারাম আঞ্জা করিয়া।
সোনাজানে আদর করিয়া পাও দেও বেড়িয়া ॥
হাছন রাজা হাওয়ার মানুষ যাইবে রে উড়িয়া।
হাছন রাজারে বান্ধিয়া রাখে মনের জিঞ্জির দিয়া ॥
(রাজা, ২০০৯ : ২১২)

৪.১.৫ হাসন রাজার গানে সুফি রহস্য

সুফি দর্শন ইসলামি দর্শনেরই একটি উদার নৈতিক প্রেমাস্পদ ধারা। ইসলাম ধর্মের প্রসারের প্রায় দেড়শ বছর পর সুফি দর্শনের ক্রমবিকাশ ঘটে। সুফি সাধকেরা প্রেমের মাধ্যমে পরমের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। সুফি দর্শন মানবতাবাদী দর্শনের একটি অনন্য উদাহরণ। এই সুফি চিন্তার উদ্ভাব আরব ভূমিতে হলেও এই দর্শন পরিপূর্ণভাবে বিকাশ ঘটেছিল ইরানের মাটিতে। পরবর্তীকালে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষে সুফিবাদের প্রচলন হয়। এটি ভারতীয় মুসলিম জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী, নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, শাহ সুফি-সুলতান, শাহজালাল, শাহ মখদুম (র.) প্রভৃতি বিখ্যাত জ্ঞানতাপসেরা সুফি মতারক্ষী ছিলেন। এছাড়া আমীর খসরু, উরফি, ফায়জি, আবুল ফজল, কবীর, সারমুদ প্রভৃতি কবিরা সুফি আদর্শ প্রচার করে গেছেন।

সুফি দর্শনে মোকাম হলো আল্লাহর পথে স্থিতি। প্রথম মঞ্জিলের নাম শরিয়ত। শরিয়ত হলো আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রকাশের সরল পথ। এরপর তরিকত, হকিকত, মারেফত। এই মারেফত মোকামে সাধক 'লাহুত' তথ্য অহংবোধ শূন্য হয়। এই পর্যায়ে এসে সুফিগণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজের জীবনকে ছেড়ে দেয়। এ পর্যায়ে এসে সাধক নিজেই নিজের মাঝে লীন হয়ে যায় এবং নিরূপ সত্তাকে আপনার মধ্যে স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে R. A. Nickolson অনূদিত *কাশাফ-আল-মাহজুব* গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> Staion (Maqam) denotes anyone's standing in the way of God, and his fulfillment of the obligaiton apperfaining to that station and his keeping it until he comprehends its perfection so far as lies in a man's power. It is not permissible that he should quit his staiton without fulfilling the obligaitons there of, thus the first station is repentance (tawbat), then comes conversiton (inabot) the renuniation (Zuhd), then trust on God (tawkkul) one and so on, it is not permissible that anyone

should pretend to conversiton without repantance, or to renunciation without conversiton or trust in God without renunciaiton. (হোসেন, ২০১৯ : ৭৫)

এ থেকে সুফির মোকাম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সুফিদের অভিষ্ট লক্ষণ হলো ঈশ্বরের লীন হওয়া। এখানে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন ঘটে। সুফি দর্শনের আধ্যাত্মিক গুরু জালালউদ্দিন রুমী, তিনি সুফি দর্শন নিয়ে রচনা করেছেন বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *মাসনাভি*। প্রত্যেক দুই লাইনে মিল রেখে যে কবিতা লেখা হয় তাকে ফার্সিতে মাসনাভি ছন্দ বলে। এই মাসনাভি গ্রন্থে রুমী ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে- মানুষ কিসের অবদানে ব্যাকুল হয়ে ফিরে, কি কারণে তার মনে এমন ব্যাকুলতা, কোথায় মানুষ ছিলো আর এখন কোথায় আছে, সবশেষে কোথায় গিয়ে থামবে। সুফিবাদের মূল কথা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

বাঁশির সুর শোন
কেন সে নিজের কথা বলে চলছে ?
কিসের বিরহে সে কাঁদছে ?
সে বলে যে দিন হতে ঝাড় থেকে তার আমার বিচ্ছিন্ন করেছে,
সেদিন থেকেই আমার এই ক্রদন।
কেন আমি কাঁদি ?
আমার কাঁদার মধ্যেই তাঁর সন্ধান তুমি পাবে।
তবে সাধারণ মানুষ অন্ধ বধির।
চোখ তাদের আছে বটে, কিন্তু তারা দেখতে পায় না।
কান তাদের আছে বটে, কিন্তু শুনতে পায় না।
আমার বাঁশির সুর–তাঁর সুরেরই প্রতিধ্বনি
আমার আত্মার ক্রন্দন–তাঁর ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি।

(ওয়াহাব, ২০০৭ : ১২৭)

সুফিবাদের এ ধারণা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মানুষ সৃষ্টিকর্তার বাইরে কখনই অবস্থান করেনি, বরং পৃথিবীতে এসে মানুষ তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই মমিন ব্যক্তির কাছে মৃত্যু কোনো বিষয় নয়, বরং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সে তার রবের সান্নিধ্য লাভ করছে। এজন্য সুফির কাছে আল্লাহ হলেন সকল ইবাদতের ও সমস্ত সাধনার মূল আধার। প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করে একমাত্র তাতেই আত্মসমর্পণ ও আত্মবিলীন করে তাঁকে লাভ করাই সুফিসাধনার গূঢ় তাৎপর্য। বেহেশতের লালনা বা দোজখের ভীতি সুফি সাধনার

কারণ বা উৎস নয়। সুফির কাছে প্রেমিকের বেশে পরম প্রেমাস্পদের সাথে মিলনই বেহেশত আর তার সাথে বিরহই সুফির দোজখ; তাই সুফি সাধক হাসন রাজা লিখেছেন :

হাসন রাজা কয়
নামাজ রোযা ছাইড়া দিছি বেহেস্তে যাইবার ভয়
নামাজ রোযা করলে বেহেস্তে যাইবে রে নিশ্চয় ॥
পরের মন্দ ছাড়িয়াছি দুযখেরি ডরে
বেহেস্ত-দোযখ এরাফাতে প্রভু নিও না গো মোরে
বন্ধু ছাড়িয়া থাকব না গো এই মনে কয়
চরণ ধরিয়া থাকি আমি, এই মনে লয় ॥
বন্ধু ছাড়িয়া থাকতে নারি প্রাণে নাহি সয়
তিলেক মাত্র না দেখিলে মনপ্রাণ দায় ॥
নাচে নাচে হাসন রাজা দেখিয়া জগৎময়
পুরাও আকাঙ্ক্ষা তোমার অঙ্গে করিয়ে লয় ॥

(আহ্মদ, ২০১৯ : ৪১০)

হাসন রাজার উক্ত গানকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হলো প্রেম। সুফিদের নিকট প্রেমই ধর্ম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলন সেতুই হলো প্রেম। সুফিতত্ত্বে প্রেম ও দয়া (রহমত) মূলত একই অনুভূতির দুটি ভিন্ন নাম। তাই আল্লাহর প্রেম ও দয়াই সুফি জীবনের প্রধান কাম্য বিষয়। সুফিগণ মনে করেন, যে ইবাদতের মাঝে প্রেম নেই, সেই ইবাদত অন্তসারশূন্য। প্রেমহীন ইবাদত দিয়ে আল্লাহর দয়া বা অনুকম্পা পাওয়া সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সুফিকুল শিরোমণি গরিবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রা.) বলেন :

জা এক জাহেদ বা হাজারো আরবাইন রা ছাদ
মস্তমায় ইশকে বা এক আঁহ্ মিদা ছাদ ॥

আমরা হাসন রাজার গানের বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর প্রেম লক্ষ করি। একজন প্রকৃত সুফি যেমন সৃষ্টিকর্তার প্রেমে লীন হয়ে যায়, হাসন রাজাও তেমনি সৃষ্টিকর্তার প্রেমে মিশে গেছেন। তাই তিনি কখনও প্রাণ বন্ধু, কখনও পেয়াবির প্রেমে ডুবে মশগুল। নিচে হাসন রাজার সুফি পর্যায়ের গানের উল্লেখ করা হলো :

১

ওরে হাছন রাজা মিয়া, প্রেমের বান্ধন বান্ধ রে
দিলের জিঞ্জির দিয়া।
(আরে) ছুটিতে না পারে যেন প্রাণ বন্ধু প্রিয়া ॥
এমন বান্ধন বান্ধবে তারে দিল দড়াইয়া ॥
এক মনে তার প্রেমেতে যাইও রে মজিয়া।
দৃঢ় মনে প্রেম করিও বুঝিয়া সুজিয়া।
দিন রাইতে তার পানেতে রইও রে চাহিয়া।
তিলে পলে কোন কালে না থাকিও ভুলিয়া।
থাকিও থাকিও হাছন রাজা, দিল লাগাইয়া।
প্রাণবন্ধে লইবে তোরে, কোলে উঠাইয়া।
দিলের হযরত তোর, যাইবে রে মিটিয়া।
হাছন জানে বলে তোরে তোর মাঝে থাকিয়া।
আমার কথামতে চললে পাইবায় রে রঙ্গিয়া।
হাছন রাজা শুনিয়া বলে, না দিব ছাড়িয়া।
অবশ্য হাছন জানরে করব আমি বিয়া।

(রাজা, ২০০৯ : ১৬৩)

২

কতদিন থাকিবায় লক্ষণছিরি রে হাছন রাজা।
ও রাজা কতদিন থাকিবে লক্ষণছিরি।
আখেরেতে যাইতে হইবে একদিন মরিবে।
হাছন রাজা কতদিন থাকিবে লক্ষণছিরি।
এই যে দেখ আশয়-বিষয়, করিতেছ বাহাদুরী।
সব ছাড়ি যাইবায় হাছন রাজা একাশ্বরী রে ॥
আবালকাল গেল খেলে, যৌবন গেল মেলে।
বৃদ্ধ কাল সাক্ষাৎ এবে রহিলে বেভুলে।
ছাড় ছাড় হাছন রাজা, এই ভবের আশ।
এক মনে চিন্তা করিয়ে হও তাঁর দাস।
পূর্ণ ব্রহ্ম আজ্ঞা এ গান শুনিয়া।

ড হু হু হু বজুজ ইয়াহু, মনেতে টানিয়া।
আল্লা, আল্লা আল্লা আল্লা আল্লা আল্লা সার।
আল্লা বিনে কিছু নাই দেখ মন আমার।
রে হাছন রাজা কত দিন থাকবে লক্ষণছিরি।

(রাজা, ২০০৯ : ১৬৫)

৩

কামাই কৈলে জামাই পাইবায় ভাল গো সুন্দরী নাতিন।
কামাই কৈলে জামাই পাইবায় ভাল।
সোনা জামাই বুছা দিব, তোমার রাঙ্গা গালে গো।
ঋাল করিয়া কর কামাই, দিন আর রাইত।
রাত্রির মাঝে বিছানায় না হইও কাইত।
নিজ নাম ধরিয়া জামাইর, ডাক দিলে জানে।
অবশ্য আসিব জামাই শুনিলে করণে।
হাছন রাজায় বলে জামাই, আছে গো অন্তরে।
একমনে না ডাকিলে, আইসে না মন্তরে।
ডাক ডাক হাছন জান গো, একমন হইয়া।
তখনি তোর প্রাণের জামাই কোলে লইব আইয়া।

(রাজা, ২০০৯ : ১৭১)

৪

কি হইল মম প্রেমজ্বালা, জ্বলে, জ্বলে, জ্বলে।
অন্তরে বাহিরে জ্বলে, কলে, কলে, কলে।
না জানি কি করিয়ে মন ভুলাইল ছলে।
পাইলে তারে বেন্ধে রাখব গলে, গলে, গলে।
জানি না পিরীতের জ্বালা, কি করিয়ে জ্বালাইলে।
হায় হুতাশন প্রেমের জ্বালা, মাইলে, মাইলে মাইলে।
প্রেমের ছটকা লাগাইয়া প্রাণ কেড়ে নিলে।
প্রেম উদাসী হাছন রাজা বলে, বলে, বলে।

(রাজা, ২০০৯ : ১৭৮)

৫

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে-

পাবে না পাবে না খোদা নমাজ রোজা কইলে।

খোদা যদি ধরতে চাও, তাঁর সঙ্গে পিরীত বাড়াও।

মিলিবে মিলিবে খোদা, প্রেমে তাঁর মজিলে।

মিলিবে না রে প্রাণের খোদা তছবি টনকাইলে।

মিলবে না, মিলবে না খোদা নাম তাঁর লইলে।

আল্লা আল্লা কইলে কিবা, কলমাও পড়িলে।

পাইবে না রে প্রাণের খোদা, মাথা কুটিয়া মইলে।

অন্য পন্থে না যাইয়া, প্রেম পন্থে গেলে।

পাইবায় পাইবায় খোদা হাছন রাজায় বলে।

(রাজা, ২০০৯ : ১৮১)

৬

গুড্ডি উড়াইল মোরে, মৌলার হাতে ডুরি।

হাছন রাজারে যেমনে ফিরায়, তেমনে দিয়া ফিরি।

মৌলার হাতে আছে ডুরি, আমি তাতে বান্ধা।

যেমনে ফিরায় তেমনে ফিরি, এমনি ডুরির ফান্ধা।

গুড্ডি যে বানাইয়া মোরে বাতাসে উড়াইয়া উড়াইয়া।

খেইড় খেলায় মোরে দিয়া, কান্না মুণ্ডা দিয়া।

রঙ্গে রঙ্গে মোরে দিয়া, খেইড় খেলাইয়া।

হাউস মিটাইয়া, মুই গুড্ডিরে, ফেলিব ফাড়িয়া।

গুড্ডি হাছন রাজায় কান্দে, না লাগব তার দয়া।

মাটিতে মিশাইব আমার, সোনার বরণ কায়া ॥

হাছন রাজায় মিন্তি করে, মৌলার চরণ ধরি।

চরণ ছায়ায় রাখ মৌলা দাসকে তোমারি।

(রাজা, ২০০৯ : ১৮২)

৭

জ্বালাইল কে পিরীতের আগুন মম মনে রে।
মানে না মানে না মনে প্রাণ বন্ধু বিহনে রে।
যে জ্বালাইল প্রেমানল, সে যদি করে শীতল।
তবে রব এ ভূতল, নতুবা প্রাণ যাবে রে।
দাবানল যে দিয়াছে, সে বিনে প্রাণ না বাঁচে।
দেখা দেয় না আয় না কাছে মন চুরি করিয়ে রে।
হাছন রাজার মন চোরা, ধরতে গেলে না যায় ধরা।
লাগাইছে পিরীতের বেড়া আড়ালে থাকিয়া রে।

(রাজা, ২০০৯ : ১৮৭)

৮

তুমি কে আর আমি বা কে, তাই তো আমি বুঝি না রে।
এক বিনে দ্বিতীয় আমি, অন্য কিছু দেখি না রে।
তুমি হে জগতের কর্তা, আমি শব্দটিই মিথ্যা।
একা তুমি বিধাতা, তব শরিক অন্য নাই রে ॥
আমি আমি বলে যারা, বুঝে না বুঝে না তারা।
লাগিয়াছে সংসারি বেরা, মূর্খতা ছুটিছে না রে ॥
মিছামিছি বলি আমি সর্বব্যাপী হওরে তুমি।
সকলই তুই অন্তর্যামী, তুমি ভিন্ন কিছু নয় রে ॥
হাছন রাজা নামটি দিয়ে, রহিয়াছে ছাপাইয়ে।
সবই কর পরদা দিয়ে, বহিয়াছ ছাপাইয়ে।
বুঝিয়ে দেখি তুই বৈ, হাছন রাজা কিছু নই।
হাছন রাজা যারে কই, সেও দেখি তুমি ঐ রে ॥
তুমি কে আর আমি বা কে, তাইতো আমি বুঝি নারে।

(রাজা, ২০০৯ : ১৯৭)

৯

নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে
নিশা লাগিল রে।
হাছন রাজা প্যারীর প্রেমে মজিল রে ॥
ছটফট করে হাছন, দেখিয়া চান্দ মুখ।
হাছন জানের মুখ দেখি, জন্মেও গেল দুখ ॥
হাছন জানের রূপটা দেখি, ফালদি ফালদি উঠে।
চিড়াবারা হাছন রাজার বুকের মাঝে কুটে ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২১৫)

১০

পাগল রে ত্বরাইও নিজে নিজে
তোমার পাগল হাছন রাজায় না বুঝে।
পাগল রে ত্বরাইও নিজে নিজে।
ঘরে বাইরে বাড়িয়ে বাড়িয়ে, তোমারে খোঁজে।
তার কাছে ছাপিয়া থাকা, তোমার নাহি সাজে।
অন্যখানে খুঁজি কেন, তুমি আমার মাঝে।
উুকেতে রাখিমু তোরে, কি ধরাইব লাজে।
হাছন রাজা ভক্তি করে নিজে, নিজেরে পূজে।
আমি তো কিছুই নই, সকলই তুইযে।

(রাজা, ২০০৯ : ২১৮)

১১

পিরীত করিয়ে, পিরীত করিয়ে মোর মন উদাসী।
প্রাণ গেল প্রাণ গেল বন্ধুরে ভালোবাসি।
কথা কয় প্রাণ বন্ধে, যখন হাসি হাসি।
দেখিয়ে তাঁর রূপের বাহার, আইসে মোর বেহুশী।
পিরীত আজব চিজ্ জগতের প্রধান।
পিরীত কর প্রেমিকেরা, ছাড়িয়ে কুল মান।
পিরীত রত্ন কত যত্ন, পিরীতি জানিয়া সার।
পিরীত ভাবে পাইবায়, বন্ধুয়ার দিদার।

হাছন রাজায় পিরীত করিয়া, বন্ধুয়ারে পাইয়া।
এই কথা হাছন রাজা, ফিরে গাইয়া গাইয়া।

(রাজা, ২০০৯ : ২২০)

১২

পিরীতের আগুন, পিরীতের আগুন রে
উঠে উঠে চমকিয়া চমকিয়া।
ঐ দেখি ঐ নাই যায় গিয়া দেখা দিয়া ॥
বিজুলী চটকের মত আইসে আর যায়।
হাছন রাজায় ধরতে নারে করে হায় হায়।
রূপের চটক দেখিয়া হাছন রাজায় দেয় রে ফাল।
ঝারাইয়া ঝারাইয়া নাচায় বাবরিছাটা বাল।

(রাজা, ২০০৯ : ২২২)

১৩

পিরীতের ধারা, সে তো জানে না রে।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে, হইছে কারাবারা।
যখন আমি প্রেম প্রিয়সী, দেখায় তারাবারা।
দেখামাত্র হাছন রাজা, হইয়ে যায় সারা।
আঁখি দুইটি ঝলমল করে, আসমানে তারা।
দেখিয়ে হাছন রাজায় নাচে, হইয়ে প্রেমে মারা।
হাছন রাজা পিরীত করে জিতে হইছে মরা।
কত মতে ধরতে চায়, পারে না অধরা।

(রাজা, ২০০৯ : ২২৬)

১৪

প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
তোমারেও হাছন রাজা দুই জানে না।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
তুমি আমি দুই নয় এক বিনে জানি না।

এক বিনে দুই থাকা আমি মানি না।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
হাছন রাজা জানে মিশতে হইয়াছে ফানা।
হাছন রাজায় এক বিনে দুই জানে না।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
হাছন রাজা মিশতে জানে গাইতে আছে গানা।
আল্লা বিনে কিছু নাই হাছন রাজার জানা।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
তোমারেও হাছন রাজায় দুই জানে না।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।

(রাজা, ২০০৯ : ২২৮)

১৫

প্রেম জ্বরে, আমি প্রাণে এখন মরি গো, প্রেম জ্বরে।
এগো, প্রেম জ্বরে প্রাণ যায়, এখন কি যে করি গো প্রেম জ্বরে।
ধরছে মোরে প্রেম জ্বরে, কাম্পি আমি থরে থরে ।
এগো এমন সময় প্রাণ প্রিয়সীরে আঞ্জা দিয়া না ধরে।
প্রেম জ্বরে জ্বলিয়ে মরি, ঠাণ্ডা কর আসিয়ে পিয়ারী।
(এগো) ঠাণ্ডা করিয়ে চরণ তলে রাখ গো আমারে ।
কাকুতি মিনতি করি, শীঘ্র আইস প্রেমেশ্বরী।
(এগো) প্রেমজ্বও ছাড়াইয়া মোরে রাখ গো হুজুরে ॥
হাছন রাজা প্রেম জ্বরে, (এগো) ছটফট ছটফট করে।
(এগো) প্রিয়সীরে লও গো কোলে দুঃখ যাউক মোর দূরে ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২২৯)

১৬

প্রেমানলে হাছন রাজা জ্বলিল।
জ্বলিয়া যাইতে হাছন রাজা এই বলিল।
আমি যে জ্বলিয়া মরি এর নাই মোর দুঃখ।
জ্বলিয়া পুড়িয়ানি দেখিমু বন্ধের মুখ।

হাছন রাজা জ্বলিয়া মরতে নাচা কুদা করে।
প্রেমের আগুন ধরিয়াছে সকল শরীরে।
নিভাইলে না নিভে আগুন ধাক ধাকিয়া উঠে
লুটন কবুতরের মত, হাছন রাজা লুটে ॥
ছটফট করে হাছন, চতুর্দিকে চায়।
এম দুঃখ দেখিয়ানি মোর, প্রাণ বন্ধু আয় ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২৩০)

১৭

প্রেমের আগুন লাগল রে, হাছন রাজার অঙ্গে।
নিভে না আগুন ডুবলে সুরমা গাঙ্গে।
আ ধা করি জ্বলছে আগুন, কিসে কি করছে।
আনিয়া দে গো প্রাণের বন্ধ রে গলেতে ধরেঙ্গে।
হাছন রাজা বন্ধু বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে।
বন্ধুর আশায় নাচে হাছন, প্রেমেরই তরঙ্গে।
হাছন রাজায় বলে আমি, যাইমু বন্ধের সঙ্গে।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া মিশব তার রঙ্গে।

(রাজা, ২০০৯ : ২৩২)

১৮

প্রেমের মানুষ নয় যারা, হাছন রাজার গান শুনিস না তোরা।
অপ্রেমিক তো মানুষ নয় রে, জীবিত থাকতে সে মরা।
প্রেম নাই যারা আইস না ধার, ঘরত মোর শীঘ্র বাহির হ।
কাষ্টের মুর্তি ভূতের মত করি না কারাবারা।
হাছন রাজা প্রেমে নাচে, প্রেমিক পাইলে বসায় কাছে।
আঞ্জা করিয়া দেয় বুঝে হাছন রাজার এই ধারা।

(রাজা, ২০০৯ : ২৩৫)

১৯

বাগানে দেখিয়ে বনমালী
হাছন রাজা চৌধুরী নাচে হাতে দিয়া তালি।
কত রঙ্গের ফুল ফুটেছে, কত আছে কলি।
বাহারে বাহারে বোলে, ভ্রমরা বুলবুলি।
চমৎকার বাগানে মালী, চলছে হেলি দুলী।
হাছন রাজার প্রেমানল, দেখিয়ে উঠল জ্বলি।
প্রেমানলে জ্বলিয়ে হাছন, ফিরে গলি গলি।
হাছন রাজার মন বাসনা, করত কোলাকুলি।

(রাজা, ২০০৯ : ২৪৩)

৪.১.৬ হাসন রাজার গানে মারফততত্ত্ব

'মারফত' শব্দটি 'উরফুন' শব্দ থেকে আগত। 'উরফুন' শব্দের আভিধানিক অর্থ চেনা-জানা, কোন বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা। আর 'মারফত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ জানা-শোনা ও নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে কোন বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা। তবে তরিকত বা তাসাউফ শাস্ত্র মতে মারফত বা মারেফত শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা হলো বিশ্ব সৃষ্টির পরমসত্তা মহান আল্লাহ ও তাঁর সুবিশাল সৃষ্টি জগৎ এবং আপন সত্তাকে জানা। নিজ এবং পরমসত্তাকে জানার নাম মারেফত। যেমন: "মান আররাফা নাফসাহু ফাহাদ আররাফা রব্বাহু" অর্থাৎ যে তার নিজেকে জানতে পেরেছে সে তার সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পেরেছে। এই নিজেকে জানার জন্য অর্থাৎ মারেফত স্তরে আসার জন্য সাধককে আরো দুটি স্তর অতিক্রম করতে হয়; তা হলো তরিকত ও হকিকত। একজন মুরিদকে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত স্তর মান্য করেই মারেফত স্তরে পৌঁছাতে হয়। শরিয়ত মতে নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্ব ইত্যাদি মেনে আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে হয়। আর মারেফতে গুপ্তবিদ্যা জিকির বন্দিগির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। মারেফত সম্পর্কে ফকির লালন বলেন:

মারফত মূলবস্তু জানি
শরিয়ত তার সরপোষখানি
ঘুচাইলে সরপোষখানি
বস্তু বয়কি সরপোষ রয়

এখানে মারেফতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মূলবস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সরপেশ ফারসি শব্দ, অর্থ ঢাকনি, আচ্ছাদনী (ওয়াকিল আহমদ, ২০১৫ : ১৩)। যখন কোন ব্যক্তি এই মূলবস্তু বা মারেফত জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন সেই সিদ্ধ পুরুষকে বলা হয় আরেফ। সাধক যখন আরেফ হয়ে ওঠে তখন সে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ

করে। মহান আল্লাহর পুত-পবিত্র নূরের সাথে যখন বান্দার পরিচয় ঘটে সেই অবস্থাকে মারেফত বলে। এ স্তরে উন্নীত হতে পারলে আল্লাহতালার প্রদত্ত নূর ও জ্ঞান দ্বারা ভক্তের হৃদয় নূরে মারেফতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মারেফতের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে চারটি স্তর অতিক্রম করা অপরিহার্য। এই চারটি স্তর হলো :

ক. ইমান-অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন;

খ. তলব-অদৃশ্য বিষয়ের অনুসন্ধান-কার্যে লিপ্ত হওয়া;

গ. ইরফান-অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা; এবং

ঘ. ফানাফিল্লাহ-অদৃশ্য বস্তুতে উপনীত ও উন্নীত হওয়া। অর্থাৎ পরম প্রেমাস্পদের জ্যোতির্ময় সত্তার আলোকে নিজের ক্ষুদ্রতম সত্তাকে আলোকিত করে তোলা। (আহ্‌মাদ, ২০১৯ : ১১১)

মারেফত সাধকের সম্পূর্ণ আত্মজগতের বিষয়। মারেফতের জ্ঞান লাভ করলে মহান আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। ফানাফিল ওজুদ বা মানাফিল নফসকে অতিক্রমক করে সাধক ফানাফিল শায়েখ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে। সীমিত বস্তু জগতের চিন্তা এতদিনে সুফির সম্মুখ হতে বিলীন হতে চলেছে এবং সেই স্থলে আধ্যাত্মিক অসীম জগতের এক অভূতপূর্ব অখণ্ড রূপ তাঁর দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। এখানে মারেফত স্তরে দাঁড়িয়ে সাধক প্রত্যক্ষ করছেন অসীমকে। সাধক মারেফত রাজ্যে বিচরণ করলে অনেক অজানা রহস্য সম্পর্কে অবগত হন। এ বিশ্বজগতের আদি রহস্য, আত্মার বিভিন্ন তত্ত্ব, সৃষ্টি রহস্য, বেহস্ত-দোজখের নির্দেশনাবলি, আধ্যাত্মিক জগতের মনযিল ও মোকামসমূহ তাঁর কাছে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তিনি আত্মতত্ত্বের মাধ্যমে যাত-ই-ইলাহীকে জানতে পারেন। তরিকতে নফসের সাথে সংগ্রামে জয়ী হলে আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে পারলে তবেই এ অপার রহস্যময় মারিফত তার জন্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মরমি সাধক হাসন রাজা আধ্যাত্মিক জগতের মনযিল সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। তিনি মারেফতের গুপ্ত সাধনার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়। নিজের মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন :

১

আকুল কইল, আকুল কইল রে, প্রাণের বন্ধে রে।
হাছন রাজা বন্দি হইল প্রেমের ফান্দে রে।
কিবা ক্ষণে হইল দেখা, প্রাণ বন্ধের সনে।
ভুলিতে না পারি রূপ উঠে মনে মনে রে ॥
চন্দ্র জিনিয়া মুখখানি, ঝলমল ঝলমল করে।

সে রূপ দেখিয়া আমি কেমনে থাকি ঘরে।
চান্দমুখ দেখাইয়া মোর, আকুল কৈল হিয়া।
অন্তরে ছাপিয়া গেল, পরদা লাগাইয়া রে ॥
ছট ফট করে হিয়া তাহার কারণ।
অন্তরে হইল মম, প্রেমের হুতাশন রে ॥
হাছন রাজার গলে লাগিল এই যে প্রেমের ফাঁস।
জন্মে জন্মে হইয়াছি, প্রাণ বন্ধের দাস রে ॥
আকুল কইল।

(রাজা, ২০০৯ : ১১১)

২

আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে ।
আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে।
আরে দিলের চক্ষে চাইয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপ রে।
কাজল কুঠা ঘরের মাঝে, বসিয়াছে কালিয়া ॥
দেখিয়া প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া ॥
কিবা শোভা ধরে (ওরে) রূপে দেখতে চমৎকার।
(আরে) বলা নাহি যায় বন্ধের রূপের বাহার।
ঝলমল ঝলমল করে (ওরে) রূপে বিজলীর আকার।
মনুষ্যের কি শক্তি আছে, চক্ষে ধরিবার।
হাছন রাজায় রূপ দেখিলা হইয়া ফানা ফিল্লা।
হু হু হু হু ইয়াহু ইয়াহু, বল আল্লা আল্লা।

(রাজা, ২০০৯ : ১১২)

৩

আগুন লাগাইয়া দিল কুণে, হাছন রাজার মনে
নিবে না দারুণ আগুন জ্বলে দিলে জানে ॥
ধাক্ ধাক্ করিয়ে উঠিল আগুন ধৈল আমার প্রাণে ॥
গুরমা নদীর জল দিলে নিবে না সে কেনে।
লাগাইল, লাগাইল আগুন আমার মন মোহনে।

বাঁচি না গো বাঁচি না গো, প্রাণ বন্ধু বিহনে।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া যায় রে আগুন, কিসে নাই মানে।
বুঝিয়া দেখরে হাছন রাজা, ধরাইল না তোর ধনে ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১১৩)

৪

আমিই মূল নাগর রে ।
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে, ভব সাগরে রে ॥
আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিব শঙ্করী।
অধর চাঁদ হই আমি, আমি গৌর হরি।
খেলা খেলিবারে আইলাম এ ভবের বাজারে।
চিনিয়া না কোন জনে আমায় ধরতে পারে ॥
আমিই মূল, আমিই কোল, আমি সর্ব ঠাঁই।
আমি বিনে এ সংসারে আর কিছু নাই।
নাচ নাচ হাছন রাজা কারে কর ভয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া যাতে হইছ লয়।

(রাজা, ২০০৯ : ১১৯)

৫

আল্লা ভব সমুদ্‌রে আল্লা ভব সমুদরে তরাইয়া লও মোরে ।
তরান বরান চাই না আমি কেবল চাই তোরে ॥
তরাও মার যাই কর এর লাগি কে ঝুরে।
হাছন রাজার মনের সাধ দেখিত তোমারে ॥
চিত্তে কেন তোমার লাগি সদায় ধড়ফড় করে।
হাছন রাজার মনে কেবল থাকত তোর হুজুরে ॥
না চাই ধন, না চাই জন, না চাই জমিদারী।
হাছন রাজার মনোবাঞ্ছা থাকত চরণ ধরি।
পূর্ণ কর আকাঙ্ক্ষা প্রভু, ভক্তি করি তোরে।
পদতলে রাখ আশিক হাছন রাজারে।

(রাজা, ২০০৯ :১৩৬)

৬

ওবা মাবুদ আল্লাজি,
আমারে ভাসাইলায় আল্লার ভব-সিন্ধুর নীর ॥
ভব সিন্ধুর চাকে পড়ি ঘুরি' ফিরি-
উঠিবার সাধ্য নাই, কেমনেতে উঠি ॥
কান্দিয়া মিনতি করে-
হাছন রাজা দাসা
পার করিয়ে চরণ তলে
মোরে দেও বাসা।

(রাজা, ২০০৯ : ১৫৬)

৭

ওবা ! মুসলিম মিঞা, বল দেখি চাই
আমি নমাজ পড়মু কেমনে দিয়া।
যে দিকে ফিরিয়া চাই সেদিকে যে প্রাণপ্রিয়া।
ইব্রাহিম খলিলের ঘর মক্কার দিগে দিয়া।
সেই দিগেতে নমাজ আমি পড়মু কি দেখিয়া।
আল্লাজির বানায়া ঘর, আপনা রতন।
এ রতন ছাড়িয়া নমাজ পড়মু কি কারণ।

(রাজা, ২০০৯ : ১৫৮)

৮

কলে হাসে কলে মাতে, কলে করে কারখানা।
মন রে তুই হইলে ফানা।
কলের মালিক দেখিয়া হইল, হাছন রাজা মস্তানা।
রঙ্গে রঙ্গে কল বসাইয়া, করতেছে কলে খেলা।
সুজন যারা বুঝবে তারা, জ্ঞানীদের আছে জানা।

চক্ষে দেখে কানে শুনে নাকে বাস পায়।

মুখে দেখ রঙ্গ বিরঙ্গে গাইতেছে কলে গানা।

উন্দা কল, আনন্দ কল, হৃদয় কলে মারিয়ে তালা।

দম্ কলেতে সোওয়াব হইয়ে করতেছে কলে গানা।

কল কারিগর আইস হাছন, রাজার তো জানা চিনা।

আইস বন্ধু বইস কাছে কেন কর টানামানা।

কারিগরের রূপ দেখিয়ে, হাছন রাজা দেওয়ানা।

প্রেমের নাচন নাচে হাছন, শুনে না কারো মানা।

মন রে তুমি হইলায় ফানা ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১৬৮)

৯

কারে বন্ধু করিব পার, মোল্লার ঝি কারে বন্ধে করিব পার।

তোর বাপে করে নমাজ রোজা আমি গোনাগার।

তোর বাপে দিনে রাইতে নমাজ রোজা করে।

লোক সমাজে বসিয়ে কেন, নিন্দা করে মোরে।

তোর বাপে সর্বদাই, করে এবাদত।

মুই গুনাগারে লইনা কট মোল্লার মত।

নমাজ নমাজ কও মোল্লাজী জায়নামাজ নি চিন।

পিছ করটে আল্লা থৈয়া ঢুস দেও যে ময়দান ॥

খোদা খোদা কও মোল্লাজী খোদারে নি চিন।

গাইর বান্ধ দুধ থৈয়া লেইনজ ধরি টান।

হাছন রাজার আল্লায় মুল্লায় নাহি দেখে।

আজলের আন্ধি লাগছে কট মোল্লাজীর চোখে ॥

চোখ থাকিতে দিনের কানার মত নাহি লই।

গাক্ষাতে যে বন্ধু খাড়া মোল্লায় বলে কই।

(রাজা, ২০০৯ : ১৭৩)

১০

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনা রে।
যেই জনে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় দুনা রে ॥
সুবুদ্ধি ও সাধু যারা, প্রেম বাজারে যায় তারা।
নির্বুদ্ধিরা ভব বাজারে, বেগার খাটিয়া মরে রে ॥
প্রেম বাজারে বিকে রত্ন ভব বাজারে নাই।
সাধু যারা শীঘ্র তারা খরিদ করা চাই রে।
কুবুদ্ধিরা বইয়া রইছে ভবের বাজার চাইয়া রে ॥
মানিক রত্ন না কিনিলাম, প্রেমবাজারে যাইয়া।
সব বাজারে বোকার মত রইয়েছি বসিয়া রে ॥
হাছন রাজা বলে আমার কি লিখছে ললাটে।
যা লিখিয়াছে নিরঞ্জন সে কি আর মিটে রে ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২৩৩)

এ প্রসঙ্গে সাধক জালাল খাঁ তাঁর গানে উল্লেখ করেন—

আমি তুমি তুমিই আমি দুজনার এক পরিচয়
শাস্ত্র পড়ে আমার জানা কখন কিন্তু নাহি হয় ॥
প্রেম করিতে পরাণ আঁকা স্বভাব নিলে যাবে দেখা
খুঁজিতে হয় একা একা দুজনারই কার্য নয় ॥

(সরকার, ২০১৪ : ১৩৬)

৪.১.৭ হাসন রাজার গানে ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ তত্ত্ব

হাসন রাজার গানে আমরা দেখি এক নিরন্তর আত্মানুসন্ধান, সংসার ও সৃষ্টির রহস্য অনুধাবনের আকুলতা; আর সর্বোপরি একজন পরিপূর্ণ মুর্শিদের প্রতি নির্ভরতা। তবে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সবচেয়ে গভীর রূপ প্রতিফলিত হয়েছে ফানাফিল্লাহ (আত্মা আল্লাহর মধ্যে বিলীন হওয়া) এবং বাকাবিল্লাহ (আল্লাহর সত্তায় চিরস্থায়ীভাবে টিকে থাকা) তত্ত্বের প্রকাশে। তাঁর এ ধরনের বহু গান পাওয়া যায় যেখানে এই দুই সুফিতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব গান শুধু আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন নয়, একান্ত আত্মজিজ্ঞাসার প্রকাশ ও ঈশ্বরের সঙ্গে মমত্বের প্রকাশও বটে।

হাসন রাজার গানে 'আমি' বা 'আত্মসত্তা' কখনোই কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি; বরং সেই 'আমি' ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে ঈশ্বরসত্তায় বিলীন হওয়ার এক অভিজ্ঞানগত যাত্রায়। তিনি বলেছেন, "আমি তো কিছু নয়, সবই আল্লাহ হয়"। এই একটি পঙ্‌ক্তিতেই ফানা ফিল্লাহর সারতত্ত্ব নিহিত। এই ভাবাবেগ তার বহু গানে পুনরাবৃত হয়েছে। আল্লাহর প্রেমে এমন আত্মবিস্মৃত অবস্থা, যেখানে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা যাচ্ছে–এটি হলো ফানার সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও পরিণত রূপ। হাসন রাজার গানগুলোতে আমরা দেখতে পাই কীভাবে তাঁর ব্যক্তিসত্তা বিলীন হতে হতে এক সময় সর্বব্যাপী সত্তায় রূপ নিচ্ছে।

তিনি বলেন- "হাসান রাজায় কয়, আল্লাহ বিনে কিছু নয়/যত ইতি চোক্ষে দেখি, আল্লাহর খেলা হয়"। এই বাক্যে ঈশ্বর-সত্তার সর্বব্যাপীতা বা সর্বব্যাপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আলাদা করে কিছুই নেই, প্রত্যেক বস্তু, দৃশ্য ও অস্তিত্বে কেবল একমাত্র সত্তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। এটি ফানার সঙ্গে ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সত্তার একত্ব তত্ত্বেরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যার প্রবক্তা ছিলেন ইবনে আরবি। হাসন রাজার এই উপলব্ধি তাঁর সাধনার পরিণতি ছিল, যেখানে 'আমি' বলতে কিছু থাকে না–সবকিছু হয়ে যায় একমাত্র 'তুমি', অর্থাৎ ঈশ্বর।

এই অবস্থানে এসে ফানা ফিল্লাহ থেকে জন্ম নেয় বাকা বিল্লাহ–যেখানে সাধক আবার নিজেকে খুঁজে পান; তবে সেই 'নিজ' আর পুরনো সত্তা নয়, বরং একটি পূর্ণ ঈশ্বরসচেতন সত্তা। হাসন রাজার গানে এই রূপান্তরের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, তিনি বলেন, "এক হইয়া হাসন রাজা, নাচিয়া নাচিয়া কয়"–এই বাক্যে 'এক হইয়া' শব্দটি বোঝাচ্ছে, তিনি আলাদা কেউ নন, বরং ঈশ্বর-সত্তায় একীভূত হয়ে গেছেন। অথচ তিনি ফিরে এসেছেন এই জগতে, কথা বলছেন, গান গাইছেন, মানুষকে আলোর পথে ডেকেছেন। এটি বাকাবিল্লাহরই রূপ–ঈশ্বরসত্তায় টিকে থেকে জগতে কর্মরত থাকা। এই দুইটি তত্ত্বকে ভিত্তি করে হাসন রাজার গানের যে আধ্যাত্মিক অবয়ব গঠিত হয়েছে, তা অন্য যে কোনো লোকসাধকের চেয়ে ব্যতিক্রম। লালনের গানেও ফানা বা বাকা-র ছায়া আছে, কিন্তু হাসন রাজার গানে তা আরও সরল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং গভীরভাবে আত্মবোধসম্পন্ন। একদিকে তাঁর গানগুলোতে ধর্মীয় অনুশাসন বা কেতাবি ভাষা অনুপস্থিত, অপরদিকে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা এতটাই তীব্র যে এগুলোর মধ্য দিয়ে এক অভ্যন্তরীণ আলোকপ্রাপ্তির দরজা খুলে যায়।

আরেকটি গানে তিনি বলেন– "আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, হাসন রাজা অন্য নয়"–এখানে তিনি শুধু ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করছেন না, বরং নিজেকে ঈশ্বরসত্তার এক অংশ হিসেবে অনুভব করছেন। এই অনুভূতি শুধু আবেগগত নয়, বরং সুফি সাধনার একটি চরম অবস্থান, যেখানে 'আমি' আর 'তুমি'–এই দ্বৈততা বিলীন হয়ে

যায়। সত্যিকার সাধকের জীবনে এই মুহূর্তটি আসে, যখন তার আত্মা আর নিজের সীমার মধ্যে থাকে না, বরং চিরসত্যের মধ্যে আশ্রয় পায়।

এই পর্যায়ে এসে হাসন রাজার গান নিছক সংগীত নয়, এক গভীর মরমি ধ্যান। তাঁর গানের প্রতিটি শব্দ যেন ধ্বনি হয়ে আছড়ে পড়ে এক আত্মিক ব্যাখ্যার দরজায়। এই গানে ধ্বনি আছে, কিন্তু শব্দে কোনো অহং নেই। এই গান শুনে মনে হয়, এক ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে মহাসত্তার সঙ্গে কথা বলছে–আবার সেই সত্তার মুখপাত্র হিসেবেও নিজেকে প্রস্তুত করেছে। হাসন রাজার গানে ফানা ও বাকার এতবার সমন্বয় আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে তিনি শুধু ঈশ্বরসাধনার অনুসন্ধানী ছিলেন না, বরং প্রাপ্ত সাধক ছিলেন। তাঁর গানজুড়ে রয়েছে আত্মদর্শনের নির্মল স্বচ্ছতা, যা তাঁকে আলাদা করেছে অন্যান্য মরমি কবি থেকে। যে গানগুলোতে এই তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, সেই গানগুলোতে আমারা দেখতে পাই, কীভাবে একজন মানুষ নিজের অন্তর্জগতে ডুবে গিয়ে, সমস্ত কিছু পেরিয়ে, এক গভীর ঈশ্বর-অভিজ্ঞতায় পৌঁছাতে পারেন। এটি কেবল সাধনার শেষ কথা নয়, বাংলা আধ্যাত্মিক সাহিত্যেরও এক অনবদ্য সম্পদ। নিচে ফানাফিল্লাহ বাকাবিল্লাহ গান তুলে ধরা হলো।

১

হাছন রাজায় আল্লা আল্লা চায় চায়।
আল্লা বিনে কিছু চায় না হাছন রাজায় ॥
হাছন রাজা ডুবিয়াছে আল্লার মায়ায়।
আল্লাতে দিল লাগাইয়া হাছন রাজা গায় ॥
জাহিরে বাতিনে আল্লা আমি কিছু নায়।
আল্লার জাতে মিশিয়া হাছন রাজা গান গায় ॥

(রাজা, ২০০৯ : ৩০১)

২

হাছন রাজায় কয় আল্লাহ বিনে কিছু নয়।
যত ইতি চক্ষে দেখ আল্লাহ খেলা হয়।
আল্লাহ আমার মুখে বুকে সকলখানে রয়।
এক বিনে দুই নাই জানিও নিশ্চয়।
আল্লাহ আর হাছন রাজা দুই কুনে কয়।

আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ হাছন রাজা অন্য নয়।
এক হইয়া হাছন রাজা নাচিয়ে নাচিয়ে কয় ॥
আমি তো কিচ্ছু নই সবই আল্লাহ হয়।

(রাজা, ২০০৯ : ৩৩২)

৩

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্।
আল্লাহ্ বিনে যত দেখি সকলেই বল্লা।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্।
হাছন রাজায় কি যে বলে হইয়া ফানা ফিল্লা ॥

(রাজা, ২০০৯ : ৩৪৫)

৪

আর জুদা রাখব না, বন্ধুরে।
আর জুদা রাখব না।
জুদাইমে কত ছদমা তায়ত কেহ জানে না ॥
বন্ধে যদি ছুড়তে চাহে, আমি তা এ দিব না।
আঞ্জা করিয়ে ধরিয়ে রাখব, যাইতে তো পারব না।
সইতে না পারব আমি, প্রেমেরও যাতনা ॥
হাছন রাজা ক্যা হতা, হেয় হকে ফানা
নিজে নেস্থ হকে, আয়নুল হক কাহনা ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১৩১)

৫

আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে
আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে।
আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে!
আরে দিলের চক্ষে চাইয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপ রে।
কাজল কুঠা ঘরের মাঝে, বসিয়াছে কালিয়া।

দেখিয়া প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া ॥
কিবা শোভা ধরে (ওরে) রূপে দেখতে চমৎকার।
(আরে) বলা নাহি যায় বন্ধের রূপের বাহার ॥
ঝলমল ঝলমল করে (ওরে) রূপে বিজলীর আকার।
মনুষ্যের কি শক্তি আছে, চক্ষে ধরিবার ॥
হাছন রাজায় রূপ দেখিলা হইয়া ফানা ফিল্লা।
হু হু হু হু ইয়াহু ইয়াহু, বল আল্লা আল্লা ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১১২)

৬

এগো মইলা, তোমার লাগিয়ে হাছন রাজা বাউলা।
ভাবতে ভাবতে হাছন রাজা হইল এখন আউলা ॥
দিনে রাইতে উঠে মনে, প্রেমানলের শওলা।
আর কত সহিব প্রাণে, তুই বন্ধের জ্বালা ॥
সোনার রং অঙ্গ আমার, হইয়াছে রে কালা।
অন্তরে বাহিরে আমার জ্বলিয়ে হইল কয়লা ॥
লোকে বলে হাছন রাজা হইল রে আজুলা।
হাতে তালি দিয়া গিল্লা, করেরে কট মুল্লা ॥
আজুলা হইয়া হাছন রাজায় বলে আল্লা।
বারে বারে বলে, লাইলাহা ইল্লাল্লা।
নাচে নাচে হাছন রাজা হইয়া ফানা ফিল্লা।

(রাজা, ২০০৯ : ১৪০)

৭

পিরীতের কি এত যন্ত্রণা, আগে জানি না।
জানিলে তাহার পিরীতে, আমি মজতাম না ॥
পিরীত করিয়ে হাছন রাজা, হইল দেওয়ানা।
নাচে কুদে ফালায় ফুলায়, হইয়া ফানা।
নাচি নাচি চলছে হাছন রাজা মস্তানা।
খেমটা তালে গাইয়া যাইছে, পিরীতের গানা।

(রাজা, ২০০৯ : ২২৪)

৮

পিরীতের মানুষ যারা, আউলা ঝাউলা হয়রে তারা।
হাছন রাজায় পিরীত করিয়া হইয়াছে বুদ্ধিহারা।
পিরীতের এমনি ধারা, মন প্রাণ করে সারা।
আরও করে কারাবারা, লাগল যার পিরীতের বেরা ॥
হী বিশ্ব হাছন রাজা আউলা হইয়ে, ডাকতে আছে মৌলা বলিয়ে।
নাচতে আছে ফালাইয়ে, হইয়ে প্রেম প্রিয়সীর মারা ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২২৭)

৯

প্রেমের আগুন, প্রেমের আগুনরে বড়ই কঠিন।
ধড়পড়াইয়া মরে লোক, জানিবায় একিন ॥
যার অন্তরে লাগিয়াছে প্রেমেরি অনল।
নিভে না দারুণ আগুন দিলে সুর্মার জল ॥
সেই আগুন ধরিয়াছে হাছন রাজার গায়।
ফাল দিয়া ফাল দিয়া উঠে, হাছন করে হায় হায় ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২৩১)

১০

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক ও সোনা রে।
যেই জনে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় তিন দুনা রে ॥
প্রেমিকেরা প্রেম বাজারে, করে আনা জানা।
অপ্রেমিক তো যায় না কেহই, চৌখ থাকিতে কানা রে ॥
প্রেম বাজারে গিয়ে যারা বানাইয়াছে থানা।
মরণ তাদের দূর হইয়াছে সর্বদাই জিনা রে॥
হাছন রাজা প্রেম বাজারে গিয়ে হইল ফানা।
নাচন পিছন করিয়ে গায় প্রেমেরও গানা রে ॥

(রাজা, ২০০৯ : ২৩৩)

১১

হাছন রাজা প্রেমানলে জ্বলে
প্রাণ প্রিয়সী মোরে তুলিয়া লও কোলে ॥
বাসনা করিয়া হার, গাঁথিয়াছি ফুলে।
কোলে লইলে হার পরাইব, তুই প্রিয়সীর গলে ॥
মনে করিয়ে হাছন রাজায় তাল বাজায়।
নাচিয়া নাচিয়া হাছন রাজায় প্রেমের গান গায় ॥
মনের সাধ পূর্ণ কর, কোলে লইয়া মোরে।
এই বলিয়া প্রিয়সীরে, আঞ্জা করিয়া ধরে ॥
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া, বুকে বুক মিলাইয়া।
হাছন রাজা নামটি তার, দিল মিটাইয়া।
হাছন রাজা মিটিয়া বলে আল্লাই আল্লা।
কিছু নাই কেবলই ইল্লাল্লা ইল্লাল্লা।

(রাজা, ২০০৯ : ২৯৩)

৪.১.৮ হাসন রাজার গানে পুরাণতত্ত্ব

বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে হাসন রাজা ব্যতিক্রমী কবি ও সাধক, যিনি মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভেতরে থেকে গড়ে তুলেছিলেন আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক জগৎ, যার মধ্যে মিলেমিশে গেছে সুফিতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্মীয় মিথলজির গভীর ব্যঞ্জনা। তাঁর গান ও দর্শনে যে তীব্র আত্মবোধ, প্রেমতত্ত্ব, ঈশ্বরকেন্দ্রিক আকুতি এবং মানবিক করুণা প্রকাশ পেয়েছে, তা একদিকে সুফিবাদের মূল ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ, অপরদিকে এতে স্থান পেয়েছে হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক চরিত্র, দেবদেবী ও লীলার প্রতীকী রূপ। এই দুই ধারার সম্মিলন শুধু গানের শৈল্পিক সৌন্দর্য বাড়ায়নি, বরং তা তাঁর উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।

সুফিবাদ মূলত এক আত্মিক সাধনার পথ, যার কেন্দ্রে রয়েছে প্রেম, আত্মত্যাগ ও স্রষ্টার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা। সুফিরা বিশ্বাস করেন, আত্মা এক সময় আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই জগতের মোহে পড়েছে, আর সেই আত্মা আবার প্রেমের আগুনে দগ্ধ হয়ে, নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই প্রভুর কাছে ফিরে

যাওয়ার চেষ্টা করে। এই পথ যন্ত্রণাময়, প্রেমময় এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের দাবি রাখে। হাসন রাজার গানে আমরা এই আত্মিক যাত্রার নানা রূপ খুঁজে পাই। তাঁর গানে "মন চিনলায় না আপন, কোন্ দিন কোন্ সময় পরিবায় কাফন/করলায় না, করলায় না তুমি আল্লার নাম জপন" (রাজা, ২০০৯ : ২৫২) কিংবা "সকলি ঠাকুরের লীলা/এক বিনে দুই নাই হাছন রাজা দেখিলা" (রাজা, ২০০৯ : ৩৪৩) এসব পঙ্‌ক্তিতে আত্মার হাহাকার, দেহ-মন নিয়ে দ্বন্দ্ব, এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকুতি প্রকাশ পেয়েছে যা স্পষ্টত সুফিবাদেরই চিহ্ন।

তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আত্মিক সাধনার যাত্রাপথে হাসন রাজা শুধু আল্লাহ, পয়গম্বর, মুর্শিদ কিংবা সাঁই নাম নিয়েই থেমে থাকেননি। তিনি তাঁর গানে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কালী, রাধা, কৃষ্ণ, গৌরকানাই, রাম, ঠাকুর প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় চরিত্র, যেন তাঁরা কোনো ভিন্ন ধর্মের প্রতীক নন, বরং একই আধ্যাত্মিক সত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এ যেন একই ঈশ্বরের বহুবচন, যে কখনো কালী হয়ে আসে, কখনো কৃষ্ণ হয়ে প্রেম করে, আবার কখনো রাধার দুঃখে কাঁদে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল সাহিত্যিক কৌশল নয়, বরং এক গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও দর্শনের বহিঃপ্রকাশ, যা হাসন রাজার গানের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বকে আলাদা করে তোলে।

"ওমা কালী কালী গো এতনি ভঙ্গিমা জান/কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর যা ইচ্ছা হয় মন" (রাজা, ২০০৯ : ১৬০) গানটিতে কালীকে তিনি কেবল তাণ্ডবমূর্তি বা শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখেননি; বরং কালী এখানে মাতা, প্রেমিকা, আবার কখনো কৃষ্ণরূপেও ধরা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "কৃষ্ণরূপে প্রেমভাবে মামীর বসন টান"–এই পঙ্‌ক্তিতে একই চরিত্রে মিলেছে শক্তি ও প্রেম, ধ্বংস ও সৃষ্টি, মাতৃত্ব ও মায়া। কালী এখানে সেই চেতনার প্রতীক, যিনি সংসারেও বিরাজ করেন, আবার অসুরনাশিনী রূপেও আত্মার অন্ধকার দূর করেন। এই বহুরূপতা হিন্দু দর্শনের 'অদ্বৈত' তত্ত্বের সঙ্গে যেমন সম্পর্কযুক্ত, তেমনি সুফিবাদের 'তাওহিদ' অর্থাৎ ঈশ্বরের একত্ববাদের ধারণারও ঘনিষ্ঠ।

তেমনি "কানাই তুমি খেলাও কেনে/রঙ্গের রঙ্গিলা কানাই" (রাজা, ২০০৯ : ১৭০) গানটিতে কৃষ্ণের রসলীলা ও লীলাভিনয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাসন রাজা। এখানে ঈশ্বরকে তিনি দোষারোপ করছেন না, বরং এক প্রেমিক আত্মা হিসেবে তিনি কৃষ্ণের খেলার ব্যাখ্যা খুঁজছেন। কৃষ্ণের মায়াবী রঙিন খেলার অর্থ কী? কেন তিনি প্রেম সৃষ্টি করে আবার তা ভেঙে দেন? কেন ভালোবেসে ফেলে যান? এই প্রশ্ন সেই চিরন্তন আত্মার আর্তি, যে দেহজ ও বাহ্যিক প্রেমের আড়ালে অনন্ত প্রেমের অর্থ খুঁজে ফেরে। এই অনুসন্ধানই সুফিবাদের মূল, যেখানে 'মহব্বত' কেবল বাহ্যিক ভালোবাসা নয়, বরং স্রষ্টার কাছে পৌঁছাবার পবিত্র এক পথ।

আরেকটি গান– "গোবিন্দের লাগিয়া রাধার ঝুরে দুই নয়ন গো এগো বৃন্দে/শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া রাধা হায় হায় করিয়া কান্দে গো" (রাজা, ২০০৯ : ১৮৩) এই গানে রাধার প্রেমদহন ও কৃষ্ণ-বিরহকে বর্ণনা করে হাসন রাজা নিজেও ব্যথিত হয়েছেন। তিনি শুধু রাধার কান্না বর্ণনা করেননি, নিজেও কেঁদেছেন, রাধার দুঃখে তাঁর বুক ফেটে গেছে। এখানে রাধা আর কেবল পৌরাণিক চরিত্র নন, বরং প্রেমিক আত্মার প্রতীক, যিনি ঈশ্বর-রূপী প্রিয়জনের বিচ্ছেদে ধ্বংস হচ্ছেন। এমন ব্যাখ্যা একদিকে বৈষ্ণবদের 'প্রেমতত্ত্ব'-এর গভীরতা স্পর্শ করে, অন্যদিকে সুফিদের 'ফানা'–অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমে আত্মাকে বিলীন করার ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য সৃষ্টি করে। এই গানে যেমন 'মধুপুরে গেল কানাইরে' বলে কৃষ্ণের চলে যাওয়া উল্লেখ করেন, তেমনি রাধার তনু ক্ষীণ হওয়ার কথা বলেও বোঝান, যে আত্মা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন, তার দেহ-মন-সমগ্র সত্তা ব্যথায় পরিপূর্ণ হয়।

হাসন রাজার এইসব গান হিন্দু ধর্মীয় গল্পকে কেবল অলংকার হিসেবে ব্যবহার করেনি, বরং এগুলো আধ্যাত্মিক সত্যের বহুরূপ প্রকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই হাসন রাজার গভীর উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্বজনীনতা প্রকাশ পায়। তিনি ঈশ্বরের সন্ধান করতে গিয়ে কোথাও বলেননি, ঈশ্বর শুধু আল্লাহ, বা শুধু কৃষ্ণ, বা শুধু কালী। বরং তিনি বলেছেন, "তুমি বাড়ি তুমি ঘর মা, তুমিই সংসার/তুমি বিনে অন্য জনা কেহ নাই আর।" (রাজা, ২০০৯ : ১৬০) এই চরণের মধ্যেই নিহিত আছে একটি অদ্বৈত সত্য–যে ঈশ্বর মা রূপে, প্রেমিক রূপে, গুরু রূপে, ভক্ত রূপে–সবকিছুতেই আছেন। এই বিশ্বাস শুধু হিন্দু বা মুসলিম চিন্তার নয়, এটি সেই সার্বজনীন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, যেখানে ধর্মের সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়, কেবল আত্মার সম্পর্কটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। হাসন রাজার গান ও চিন্তা আমাদের দেখায় যে, সত্যিকারের সাধক কোনো ধর্মে আটকে থাকতে পারেন না। প্রেমই তাঁর ধর্ম হয়, ঈশ্বরই তাঁর কেন্দ্র হয়, এবং সব ধর্মের ভেতরকার সেই চিরন্তন সত্যকে একসূত্রে দেখার শক্তি তাঁর থাকে। এজন্যই তিনি আল্লাহকে যেমন ডেকেছেন, তেমনি গোপালকেও চেয়েছেন। তিনি যেমন মুর্শিদের জন্য আকুল হয়েছেন, তেমনি কালীমায়ের চরণেও আত্মসমর্পণ করেছেন। এইসব প্রকাশ কোনো দ্বিধা নয়, বরং এক চেতনার পরিণত অবস্থা, যেখানে ধর্ম নয়, প্রেমই মুখ্য।

সুফিবাদ ও হিন্দু মিথলজির এই অপূর্ব সমন্বয় হাসন রাজার গানে তাঁকে শুধু লোককবি বা জমিদার কবি করে রাখেনি, বরং বাংলার আধ্যাত্মিক ও লোকজ সাহিত্যধারায় তাঁকে স্থাপন করেছে একটি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক উচ্চতায়। তিনি ধর্মের মর্ম বুঝতেন বলেই সব ধর্মের ভেতরকার প্রেম ও আত্মজিজ্ঞাসাকে নিজের কাব্যে স্থান দিতে পেরেছেন। তাঁর এই সাহস, প্রজ্ঞা ও হৃদয়ের বিশালতা আজও আমাদেরকে বিস্মিত করে। এইভাবেই হাসন রাজার গানে আমরা পাই সেই চেতনার প্রতিচ্ছবি, যেখানে সুফি ও বৈষ্ণব–সব মিলে একাকার হয়ে গেছে প্রেমের মূর্তিতে। নিম্নে হাসন রাজার পুরাণতত্ত্ব বিষয়ক গান দেওয়া হলো :

১

ওমা কালী! কালী গো! এতনি ভঙ্গিমা জান।
কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর যা ইচ্ছা হয় মন ॥
মাগো স্বামীর বুকে পা দেও মা ক্রোদ্ধ হইলে রণ।
কৃষ্ণরূপে প্রেমভাবে, মামীর বসন টান॥
আদ্যা শক্তি হইয়া মাগো! পুত্রে রইলায় বর।
শতবার মারিয়া মাগো; কর পুত্রের ঘর ॥
কখন কালী, কখন রাধা, কখন গো তারিণী।
জ্ঞান চক্ষে চাইয়া দেখি, মা মোর পরাণী ॥
কালীরূপ ধরিয়া মাগো! অসুর কইলায় নাশ।
রামরূপে রাক্ষসগণ করিলায় বিনাশ॥
তুমি বাড়ি, তুমি ঘর মা! তুমিই সংসার ।
তুমি বিনে অন্য জনা কেহই নাই আর॥
নানা সময় নানারূপে, অবতার হইয়া।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর দুষ্টকে মারিয়া ॥
হাছন রাজা কালীভক্ত, কালী পদ সার।
কে বুঝিতে পারে মায়ের, অনন্ত ব্যাপার ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১৬০)

২

আমি মরিয়া পাই যদি, শ্যামের রাঙ্গা চরণ।
(আরে) তবে সে রঙ্গিনী রাধার সাফল্য জীবন॥
মরিয়া মরিয়া যদি, শ্যামের লাগাল পাই।
রাঙ্গা চরণে ধরি জনম গোওয়াই।
ছাড়াইলে না ছাড়িমু, ধরিমু চরণ।
যাহা করে জগন্নাথ, জগৎ মোহন॥
হাছন রাজায় বলে, জান যাইবে যখন।
সে সময়ে দেখতে চাই যুগল চরণ॥

(রাজা, ২০০৯ : ১২৮)

৩

আমি তোমার কাঙ্গালী গো সুন্দরী রাধা,
আমি তোমার কাঙ্গালী গো।
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে,
হাছন রাজা কাঙ্গালী গো॥
তোমার প্রেমে হাছন রাজার, মনে হুতাশন।
সুন্দরী রাধা, আমি তোমার কাঙ্গালী গো।

(রাজা, ২০০৯ : ১২২)

৪

আমি ছাড়ব না ঠাকুর চান্দকে মইলে গো প্রাণসই।
আমি ছাড়ব না ঠাকুর চান্দকে মইলে।
কি হইব তোদের কইলে গো প্রাণ সই।
আমি ছাড়ব না ঠাকুর চান্দকে মইলে।
ছাড়াইতে চাহিলে পুড়ি, মরিমু অনলে।
ছাড়ব না, ছাড়ব না আমি, তুলি লইছি কোলে,
গো প্রাণ সই॥
(আর) হৃদয়ে রাখিয়াছি তারে আহ্লাদ করিয়া।
বাঁচন না, বাঁচন না আমি, তাহারে ছাড়িয়া গো প্রাণসই॥
তোরা যে বল গো সই ছাড়িতাম তারে।
ছাড়িতে পারব না তোরা আগে মার মোরে গো ॥
হাছন রাজায় বলে ধরছি জীবনে মরণে।
ছাড়ব না ছাড়ব না তারে, মারিলে পরাণে
গো প্রাণ সই॥

(রাজা, ২০০৯ : ১২১)

৫

আমার হৃদয়েতে শ্রীহরি,
আমি কি তোর যমকে ভয় করি।

শত যমকে তেড়ে দিব, সহায় শিব শঙ্করী॥
আমি যখন উঠি রেগে, দেখে যমদূত ভাগে।
আসে না মোর মায়ের আগে, দেখ যেয়ে লক্ষণছিরি॥
হাছন রাজার সন্ধান আছে, যম কি আসবে তার কাছে।
প্রাণ দিয়েছি হরির কাছে, যম কারে নিবে ধরি॥
(রাজা, ২০০৯ : ১১৭)

৫

দয়াল কানাই! দয়াল কানাই রে !
পার করিয়া দেও কাঙ্গালীরে।
ভবসিন্ধু পার হইবার পয়সা কড়ি নাই।
দয়া করি পার করিয়া দেও বাড়ি চলি যাই॥
অকূল সমুদ্রের পাড়ি, পার করে দেও তাড়াতাড়ি।
সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, মনে ভয় পাই॥
দয়াল বলিয়ে নাম তোর, জানে সংসারে।
মুই অধমেরে পার করিয়া দেও, চলি যাই ঘরে॥
হাছন রাজায় ব্যগ্র দেখে দয়া লাগে কানাইর বুকে।
আইস তুরিয়ে কানাই ডাকে, তোমায় নিয়া যাই॥
(রাজা, ২০০৯ : ২০১)

৫

বাঁশী বাজাইয়ে যায় রে কালা।
দিয়ে আমায় জ্বালা।
নন্দের সুত হইয়ে আমার ভাইরে ডাকে শালা।
রইতে না পারি ঘরে মাথে লইয়ে ডালা।
চলিল সুন্দরী রাধে দুইপরিয়া বেলা।
গলেতে পরিয়া নিলাম গজমতি মালা।
আমার পানে চায় না করে রঙ্গে রঙ্গে খেলা।
প্রেমের জ্বালায় কান্দিয়ে ফিরে রাধিকা অভুলা,
হাছন রাজায় বলে ধর গিয়া কানাই যায় একেলা।
(রাজা, ২০০৯ : ৩৯৮)

৬

ঠাকুর ছাড়া থাকব নারে আর।
দাস হয়েছি আমি তার।
ঠাকুর ছাড়া থাকব নারে আর।
বসিয়া আছি ঠাকুর ঘরে কেমনে করিবে বার।
ঠাকুরের প্রেমে মজিয়া আছি।
তার কাছে মোর প্রাণ সঁপিয়াছি।
তারে ছাড়িয়া নাই বাঁচি।
পড়িয়া আছি তার দ্বার।
হাছন রাজা দাস হইয়া।
রইছি তার পানে চাইয়া।
যাব না ঠাকুর ছাড়িয়া।
এই মনে হাছন রাজায় ॥

(রাজা, ২০০৯ : ৪১৭)

৭

কঠিন শামের মন আমার সাজও ভুলে না।
মন প্রাণ দিয়ে কান্দি আসিয়া তো মিলে না।
কাকুতি মিনতি করি তবু তো সে আসে না।
আমি তো তার লাগিয়া মরি সে তো ভালবাসে না
আমার প্রেমের ফান্দে সে তো এগো ফাঁসে না।
মুখ পানে চাইয়ে থাকি একবার তো হাসে না।
হাছনজান বলে, বন্ধু সে তো আমার বশে না।
হাছন রাজারে দিয়ে মিছে করে কেন ঘোষণা।

(রাজা, ২০০৯ : ৪৩৬)

৮

ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর আমি চাই।
আমার ঠাকুর বিনে কিছু নাই।

ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর আমি চাই।
আমার যে প্রেমের বেমার ঠাকুর বিনে ঔষধ নাই।
ঠাকুর আমার মায় বাপ ঠাকুর ঘর গুষ্টির জামাই।
দিন কোচ য়ায় ঠাকুর বিনে প্রাণ বাঁচে না শুন এগো রাই।
কি করিলে হবে আমার ঠাকুরের ঘরে ঠাঁই।
হৃদ-কমলে থাকে ঠাকুর ধরিয়া না পাই।
হৃদয়েতে আছে ঠাকুর তার লাখান কেউ নাই।
দিনে রাইতে হাছন রাজায় ঠাকুরের গুণ গাই।
ঠাকুরে মোরে চরণ তলে রাখব নিরে ভাই।

(রাজা, ২০০৯ : ৪৪৮)

৯

হরি বল মন হরি বল মন, বিকিয়ে হরির প্রেম বাজারে।
হাছন রাজা প্রেমের মানুষ, প্রেমের নাচন নাচন করে।
হাছন রাজা বিকিয়ে আছে হরির নামে প্রেম বাজারে।
হরির নামে কীর্ত্তন করিয়ে সব বেড়াব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।
হাছন রাজা নিমন্ত্রণ করে আইসরে ভাই প্রেম বাজারে।
তুমি আমি সব মিলিয়ে প্রেম বিলাবো ঘরে ঘরে।
হাছন রাজা যুক্তি করে প্রেমিক চল যাই নগরে।
অপ্রেমিক পাইলে পরে ধরিয়ে আনবো প্রেম বাজারে।
হাছন রাজায় নাচন করে ধরিয়ে হরির শ্রীচরণে
হরি বল মন হরি বল মন হরির চরণ ছাড়বো না রে।

(রাজা, ২০০৯ : ৪৫২)

১০

রঙ্গীয়া কানাই, রঙ্গীয়া কানাই রে।
তুমি ভং কেন কর।
সুন্দর নারী দেখলে কেন আঞ্জা করিয়া ধর।
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া কানাই তুলিয়া লও কোলে।

গলেতে পরাও হার গাঁথিয়া নানান ফুলে।

তোমার স্বভাব দেখিয়া লোকে ডাকে লম্পটিয়া।

হাছন রাজা দোষী হইছে তোমার স্বভাব লইয়া।

(রাজা, ২০০৯ : ৪৫৮)

১১

কে বলে বন্ধু আমার কালা।

সোনিয়ে মনে হইল জ্বালা।

কে বলে বন্ধু আমার কালা।

কালা কালা কালা কালা রাধার বন্ধু কালা।

আমার বন্ধে সংসাররে করিয়াছে উজালা।

আমার বন্ধে রূপটি দেখ সংসার জুড়িয়া।

পরি স্বর্গ মর্ত পাতাল এ রইয়াছে বেড়িয়া।

দেওয়ান হাছন রাজায় করে শালার শালার শালা।

কি মত করিয়া কালার কাছ আমার বন্ধু আলা।

আরেক বার বলিবে যদি বন্ধু নয় মোর ভালা।

হাছন রাজায় কানে ধরিয়া দিব তোরে ডলা।

(রাজা, ২০০৯ : ৪৬৪)

১২

নিঠুর কালার পিরীত করিয়ে প্রাণ গেল সই।

তাইসে মইলাম, মইলাম, আমি খাব দই।

তার লাগি প্রাণ যায় সে বা রইল কই পিরীতের যন্ত্রণা প্রাণে আর কত সই।

নিতি নিতি মাখন রুটি তার লাগিয়া থই।

একা বসি কেমনে খাব প্রাণনাথ বই।

হাছন রাজায় বলে, আমি তার নামই লই।

ডাক শুনিয়া আইল নাকি প্রাণনাথ ঐ।

(রাজা, ২০০৯ : ৪৭৪)

১৩

হে মা করুণাময়ী কৃপা কর মুই অধমেরে।
কাকুতি মিনতি করি ডাকি মা তোমারে।
ঘিরিয়াছে মায়ারই জালে এখনি মারিবে কালে।
তুলিয়া লও গো ও মা কোলে তব সন্তানে রে।
পড়িয়া মা বিষম বিপাকে।
হাছন রাজার তোমায় ডাকে।
তরা করি কর রক্ষে মাও গো আমারে।

(রাজা, ২০০৯ : ৩১২)

৪.২ হাসন রাজার গানের সুরবৈচিত্র্য

বাংলা লোকসংগীত, বিশেষ করে, সুফি ধারার গান এক ঐতিহ্যপূর্ণ সংগীতধারা যা শাশ্বত মানুষের অনুভূতি, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধ্যাত্মিকতার মিলনস্থল। এই ধারায় হাসন রাজা তাঁর গানের সুরের মাধ্যমে নতুন অবয়বের উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গানের সুরের মেলডি বাংলা লোকসংগীতের নানা উপাদানকে ধারণ করেছে এবং এক অনন্যমাত্রা যোগ করেছে। হাসন রাজার গানের সুরে আমরা ভিন্ন রং দেখতে পাই–যা বাংলা লোকসংগীতের ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা এবং মানসিকতা একত্রিত হয়ে মানুষের অন্তরে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

তবে হাসন রাজার গানের সুর যে কেবল সুফি দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সীমাবদ্ধতা নয়, বরং তাতে বাংলার গ্রামীণ জীবন ও প্রেম–প্রকৃতির অমলিন চিত্র সৃষ্টি করেছে। এবং তাঁর গানের সুরের মাধ্যমে সমাজের দুঃখ, কষ্ট, মানব জীবনের সংকট এবং মহান আল্লাহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে। হাসন রাজার গানে এক নতুন মাত্রার আবেদন রয়েছে, যার কারণে তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে অমূল্য রতন হয়ে উঠেছে।

আমরা হাসন রাজার গানের সুরের দিকে গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাই– তাঁর গানের সুরের বিচিত্রতার কেন্দ্রে রয়েছে হৃদয়ের অনুভূতি এবং অসীমের সংমিশ্রণ। গানের ভাবের সাথে সুরের যুগল মিলনে সৃষ্টি হয়েছে সার্থক শিল্প। যা সহজেই আশেকের মনে প্রাণপ্রিয়াকে পাওয়ার দুর্বার বাসনাকে নাড়া দেয়।

হাসন রাজার গানের সুরের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করতে গেলে মরমি সুরে প্রকৃতিসত্ত্বার সন্ধান পাওয়া যায়। এ গানে প্রকৃতি শুধু একটি পটভূমি নয়; বরং এখানে প্রকৃতি একটি জীবন্ত চরিত্র। তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন

আত্মিক সত্তা হিসেবে, যার সঙ্গে মানুষের আত্মা গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাঁর বেশকিছু বিখ্যাত গানে প্রকৃতির নানা উপাদান যেমন- নদী, নৌকা, পাখি, গাছপালা ইত্যাদির আধ্যাত্মিক বিমূর্ততার রূপ ধারণ করে। আর হাসন রাজার গানের সুরে সেই সম্পর্ক যেন নতুন করে প্রকাশ পায়। হাসন রাজার গানের সুরে প্রকৃতির পাশাপাশি পরমসত্তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। কেননা এ গান এক গভীর অস্তিত্ববোধের প্রতিচ্ছবি। জীবনের অসারতা, দেহের নশ্বরতা এবং আত্মার চিরন্তনতা–এসব ভাবনা গানের সুরের গভীরে গাথা। হাসন রাজার গানের সুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–সুরে সাধকের ভাব বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির প্রয়োগ। কারণ তিনি মরমে অধিষ্ঠিত হয়েই গানে সুর প্রয়োগ করেছেন। তবে হাসন রাজার গানের সুরে নিজের অজান্তেই লোক–সংগীতের সুরের চিরন্তনতা আর ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা ও মানুষের অন্তর্গত অনুভূতির প্রতিফলনই নিহিত আছে। কেননা এই সুরগুলি যুগে যুগে পরিবর্তিত হলেও তার মৌলিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। লোক–গানের সুরে মানুষের জীবনের চিরন্তন সত্য জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিরহ, সংগ্রাম ও শান্তির প্রতিফলন ঘটে। হাসন রাজার গানে মরমি সুরের পাশাপাশি বাংলা লোক সুরের প্রভাব সম্পর্কে হাসন গবেষক ড. জাহিদুল কবীর বলেন: "সুফি তত্ত্বের প্রভাব তার গানে, দর্শনে থাকলেও সুর রচনার ক্ষেত্রে তিনি বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, জারি, মরমি, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধারাকে অনুসরণ করেছেন। এর সাথে মাঝি মাল্লার সরাসরি কর্মসংগীতের রূপটিও এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।" (কবীর, ২০২১ : ৪৬)

তাই আমরা বলতে পারি মরমি কবি হাসন রাজার গানে লোকসুর আলাদা কোন বাহ্যিক অলংকর নয়, বরং এটি গানগুলোর অন্তর্নিহিত দর্শন, যা রচনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। হাসন রাজার গানে বাংলা লোকসংগীতের বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে চিহ্নিত করা প্রয়োজন কোন কোন ধারার সুর গভীরভাবে জড়িত। গানের সুর ও বাণী বিশ্লেষণ করলে সুনির্দিষ্টভাবে বাংলা সংগীতের যে-সব ধারার সুরের প্রভাব হাসন রাজার গানে রয়েছে তা হলো :

১. বাউল ও মরমি গানের সুর
২. ভাটিয়ালি সুর
৩. সারি গানের সুর
৪. মারেফতি গানের সুর
৫. ধামাইল গানের সুর
৬. শাস্ত্রীয় গানের সুর

হাসন রাজার গানের গীতিময় সুর মানুষের হৃদয় ছুয়ে যায় খুব সহজে। তাঁর গানে বাউল ও মরমি সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে– যা বাংলা লোকসংগীতের ঐতিহ্য ও আধুনিকাতার মধ্যে এক নান্দনিক

সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। যার ফলে হাসন রাজার গান যতদিন যাচ্ছে তত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। তাই হাসন রাজার গানে বাউল ও মরমি সুরের প্রভাব আলোচনার পূর্বে বাউল গানের সুর ও বৈশিষ্ট্য এবং মরমি গানের সুরের পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথমেই আসা যাক বাউল গানের সুর ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে– বাউল গান মূলত বাংলা লোকসংগীতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা, যা সাধু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এই সাধক সম্প্রদায় গানের মাধ্যমে মনের মানুষের সন্ধান করে। বায়ু সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে দেহের মধ্যে অনুসন্ধান করে। বাউল গান মূলত বাণী প্রধান। বাউল গানের সুর সম্পর্কে *বাউল ফকির কথা* গ্রন্থে দিনেন্দ্র চৌধুরী বলেন :

> তত্ত্বমূলক গানের কোন নির্দিষ্ট সুর নেই। পুজাপার্বনের কিছু গান আছে যেগুলো পালটায় না। বছরের নির্দিষ্ট দিনে গাওয়া হয়, নিয়মিত চর্চা হয় না বলে মডিফিকেশন হয় না, চেঞ্জ হয় না। কিন্তু বাউল গানের সুরে ও ধাচে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যেমন আজকাল লালন ফকিরের গান সুর দিয়ে আমরা গাইছি, মিসলিস্কড হয়ে গেছে তো। এতে কোন অপরাধ আছে বলে মনে করি না, যদি যোগ্য লোক তাঁদের অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। (চক্রবর্তী, ২০১৪ : ৩৪৯)

এ জন্য বাউল গানে সুরের বৈশিষ্ট্য হলো সহজ, প্রাঞ্জল এবং বারংবার পুনরাবৃত্তিমূলক। এতে সাধারণত এক বা দুই সুরের মেলডি থাকে যা গানটিকে সহজ করে তোলে এবং শোনার সময় শ্রোতার মনে অজান্তেই এক ধরনের সান্ত্বনা ও আধ্যাত্মিকতার ছোয়া নিয়ে আসে। এ কারণে বাউল গানের সুরের সাধনায় ভক্তি ও সাধনা মিশ্রিত থাকে। অন্যদিকে মরমি গানের সুরে লক্ষ করা যায় গভীর ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সাধনার নিবেদন। মরমি সাধকেরা তাদের অন্তরের উপলব্ধি জীবনের দর্শনতত্ত্বগুলো গান ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। এ গানের সুরে ছন্দ ও তাল ভাব অনুযায়ী গতি বদলায় এবং সুরের ওঠানামা বেশি থাকে। যা সাধকের মনকে ধীরে ধীরে উচ্চ মোকামে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। হাসন রাজার গানে বাউল ও মরমি সুরের এক অনন্য সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। তিনি বাউল সুরের সরলতা এবং মরমি সুরের হৃদয়গ্রাহী আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে নতুন ধারার সুরে গান বেঁধেছেন। তাইতো তাঁর গানে বাউল সুরের মাধুর্য ও সরলতা মনকে প্রফুল্ল করে তোলে, যেখানে মরমি সুরের গভীরতা সাধককে চিন্তায় ডুবিয়ে দেয়। হাসন রাজার বাউল ও মরমি সুরে প্রভাবিত গান স্বরলিপিসহ তুলে ধরা হলো :

তাল : কাহারবা (চতুর্মাত্রিক)

আমিই মূল নাগর রে।
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে, ভব সাগরে রে।।

আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিবশঙ্করী।
অধর চাঁদ হই আমি, আমি গৌর হরি।।

খেলা খেলিবারে আইলাম এই ভবের বাজারে।
চিনিয়া না কোন জনে আমায় ধরতে পারে।।

আমিই মূল, আমিই কুল আমি সর্ব ঠাঁই।
আমি বিনে এ সংসারে আর কিছু নাই।।

নাচ নাচ হাসন রাজা কারে কর ভয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া যাতে হইছ লয়।।

সা সা া স সা -রা মা মা ০া পা া পা -ধা -ধা -া
ও আ মি ই মু ০ ল্ না ০ গ র্ রে ০ ০ ০

পধা ণধা -পা -মা -া ধপা -মা -া -া -া -া -া -া
০০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা সা | -া -া সা রা | মা -া মা পা I পা -ধা -া -া | -া -া -া -া I
আমি ই ০ ০ মু ল না ০ গ র্ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পধা ণধা পা মা | ধপা -মা -া -া I -া -া মধা ধা | -া ধা ণধা -পা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ সি ০ য়া ছি০ ০

I গা ধা পা মা | মা -ধা ণধা ধণা I ধপা া- পা া | ধা পা মা -া I

খেই ড় খে ০ লি ০ তে ০০ ০ ০ ভ ব্ সা গ রে ০

I ᵐগা -া -রা -সা | -া -া রা গা I -গা -পা -মা গা | রা -া সা রা I

রে ০ ০ ০ ০ ০ আ মিই মু ০ ০ ল্ না ০ গ র্

I ᵛসা -া -া -া | -া -া সা সা II

রে ০ ০ ০ ০ ০ আ মিই

II -া -া ধা -ধা | ণা ধা পা া I া া ধা র্সা | া র্সা র্রা -র্সা I

০ ০ আ ০ মি রা ধা ০ ০ ০ আ মি ই কা নু ০

I -সা -া -া -া | -া -া পা -া I -া -া র্সা -া | র্রা র্রা র্সা -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ মি ই শি ০

I ᵛ্ণা -ধা পা -া | পা ধা -া ধা I ণা -া ᵍধা -া | -পা -া -া -া I

ব ০ ০ ০ শ ং ০ ক রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া পা ধা | র্সা র্সা -া র্সা I ᵛর্সা -ণা -ধা পা | পা -ধা ধা -পা I

০ ০ অ ধ র্ চাঁ ০ দ হ ০ ০ ই আ ০ মি ০

I -া -া পা ধা | -া পা -মা া I ᵐগা -া -রা -সা | -া -া রা গা I

০ ০ আ মি ০ গৌ ০ র হ ০ রি ০ ০ ০ আ মি

I গা -পা -মা গা | রা -া সা রা I সা -া -া -া | -া -া সা সা II

মু ০ ০ ল না ০ গ র রে ০ ০ ০ ০ ০ আ মিই

II -া -া ধা ধা | -ণা ধা পা -া I -া -া ধা র্সা | -া র্সা র্রা র্সা I

ও ও খে লা ও খে লি ও ও ও বা রে ও আই লা ম্

I -া -া -া -া | -া -া পা -া I -া -া র্সা র্সা | র্রা র্সা -র্সা া I

ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও এ ই ভ বে ও র

I ঁণা -ধা পা -া | পা ধা -া -ধা I -ণা -া ঁধা -া | -পা -া -া -া I

বা ও ও ও জা রে ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও

I -া -া পা ধা | -র্সা র্সা া -া I ঁর্সা -ণা ধা -পা | পা -ধা ধা -পা I

ও ও চি নি ও য়া না ও কো ও ন ও জ ও নে ও

I -া -া পা ধা | -া পা মা া I ঁগা -া রা -সা | -া -া রা গা I

ও ও আ মা য় ধ র্ তে পা ও রে ও ও ও আ মি

I গা -পা -মা গা | রা -া সা রা I সা -া -া -া | -া -া সা সা II

মু ও ও ল না ও গ র্ রে ও ও ও ও ও আ মিই

II গা -পা -মা গা | রা -া সা রা I সা -া -া -া | -া -া সা সা II

মু ও ও ল না ও গ র্ রে ও ও ও ও ও আ মিই

II -া -া ধা ধা | ণা ধা পা -া I -া -া ধা র্সা | -া র্সা -র্সা -া I

ও ও আ মি ই মু ল ও ও ও আ মি ও কু ও ল

I -র্সা -া -া -া | -া -া পা -া I -া -া র্সা র্সা | -র্রা র্রা র্সা -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি ০ স র্ ০

I ঁণা -ধা পা -া | পা -ধা -া -ধা I -ণা -া ঁধা -া | -পা -া -া -া I

বা ০ ০ ০ ঠাঁ ০ ০ ০ ০ ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া পা -ধা | -া পা মা -া I ঁগা -া -রা -সা | -া -া রা গা I

০ ০ আ ০ র্ কি ছু ০ না ০ ০ ই ০ ০ আ মি

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা রা I সা -া -া -া | -া -া সা সা II

মু ০ ০ ল না ০ গ র্ রে ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

II -া -া ধা ধা | -ণা ধা পা -া I -া -া ধা র্সা | -া র্সা -র্সা -া I

০ ০ না চ ০ না চ ০ ০ ০ হা স ন্ রা জা ০

I -র্সা -া -া -া | -া -া পা -া I -া -া র্সা- -া | -র্রা -া র্সা -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ০ রে ০ ক ০

I ঁণা -ধা -পা -া | পা -ধা -া -ধা I -ণা -া ঁধা -া | -পা -া -া -া I

র ০ ০ ০ ভ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া পা ধা- | র্সা র্সা া -র্সা I ঁর্সা -ণা ধা -পা | পা -ধা ধা -পা I

০ ০ আ মি ০ ত্ব ছা ০ ড়ি ০ য়া ০ দি ০ য়া ০

I -া -া পা ধা | -া পা মা -া I ঁগা -া -রা সা | -া -া রা গা I

০ ০ যা তে ০ হই ছ ০ ল ০ ০ য় ০ ০ আ মি

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা রা I সা -া -া -া | -া -া সা সা II II

মু ০ ০ ল না ০ গ র্ রে ০ ০ ০ ০ ০ আ মিই

(চক্রবর্তী, ২০২০ : ৬৫)

৪.২.১ হাসন রাজার গানে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব

ভাটিয়ালি গান বাংলা লোকসংগীতের এক অমূল্য সম্পদ, যার উৎস নদীমাতৃক জীবন ধারা। মানুষের জীবন সায়াহ্নে এসে যে বোধের উপলব্ধি আসে, তা প্রকাশ পায় এই গানে। মূলত মাঝি ও নৌকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এই গানের সুরে মিশে থাকে আবহমান বাংলার নদীভিত্তিক সমাজের প্রেম, বিরহ, হাসি, কান্না ও আত্মার আকুতি। তাই গবেষকগণ ভাটিয়ালি গানের ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতিতে এর ভূমিকা এবং দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। ভাটিয়ালি গানের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষক ম. হাবিবুর রহমান বলেন :

> ভাটিয়ালি গানের আদি উৎপত্তিস্থল সিলেট ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চল। সুরমা ও মেঘনা নদী উপত্যকায় এ গানগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে এ গুলোর প্রসরণ ঘটে পূর্ববঙ্গের নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। পূর্ববাংলার মানুষের কল্পনিঃসৃত সংগীত হলো ভাটিয়ালি। ভাটিয়ালি এ দেশের একটি প্রাচীন সুরও বটে। (রহমান, ২০০৮ : ১৩৫)

বাংলা লোকসংগীতের অতিপ্রাচীন এ ধারার গানে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য। এই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যর জন্য আধুনিক কালেও এ গানের আবেদন হারায়নি। নিচে ভাটিয়ালি গানের সুরের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. **ধীরলয় ও করুণসুর :** ভাটিয়ালি গানের সুর সাধারণত ধীরগতির ও বিষাদময় হয়। যে সুর নদীর মৃদু ঢেউয়ের সাথে মানব মনের অপ্রকাশিত বেদনার সংযোগ স্থাপন করে। এ গানের সুরে বিচ্ছেদি ভাব থাকায় দীর্ঘ টান থাকে– যা বিরহ ও একাকীত্বের প্রতীক।
২. **প্রকৃতির মাঝে সুরের আবহ সৃষ্টি :** সুরের সাথে নদীর কলতানের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে ভাটিয়ালি গানে। গানের বাণী, সুর আর প্রকৃতির মিশ্রণে এ গান অনন্যমাত্রা পায়।

৩. **তালহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ :** বেশিরভাগ ভাটিয়ালি গানে নির্দিষ্ট তাল ছাড়া মাঝি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পরিবেশন করে। এতে গানের আবেগ বাধাহীনভাবে প্রকাশ পায়।

৪. **রাগের লক্ষণ প্রকাশ :** যদিও ভাটিয়ালি লোকগান, তবুও এ গান ভাব প্রধান হওয়াতে অনেক সময় ভৈরবী খাম্বাজ, কাফি প্রভৃতি রাগের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৫. **স্বরের গভীরতা ও অলংকারের প্রকাশ :** সুরে লম্ববীনের প্রবণতা থাকায় নৌকা যখন ঢেউয়ে দোল খায় তখন মনের অজান্তেই গানের সুরে অলংকারের প্রকাশ পায়। জীবনের গভীর উপলব্ধির কারণে এ গানের সুরে গভীরতা থাকে।

মরমি কবি হাসন রাজার বহু গানে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, ভাটিয়ালি সুর হাসন রাজার গানে শুধু সুরের শৈলী হিসেবে নয়, বরং তাঁর গানের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক স্তর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে ভাটিয়ালি সুরে প্রভাবিত হাসন রাজার গান স্বরলিপিসহ উদাহরণ দেওয়া হলো :

ওরে আমার পাগলা মাঝি
পাগলা নে তর বৈঠা নেরে ॥

ঈশান কোণে সাজ কইরাছে
মেঘ কইরাছে বায়ু কোণে
আমি ঠেকলাম পাগলা মাঝি লইয়া
নাও ভিড়াইতে উল্টা টানে ॥

হাছন রাজার ভাঙ্গা তরি
নাই যে কড়ি নাই কাণ্ডারি
আমি মধ্যিখানে ডুইবা মরি
কার কাছে কই কে বা শোনে ॥

II	-া	সগা	গগা	গমা	I	-মপা	পা	পদা	পদা	I	মপমা	মপা	গমগা	গমা	I	-মা	পপা	পদা	পদা	I
	০	ওরে	০আ	মার		০পাগ	লা	মা০	ঝি০		ও০০	রে০	আ০০	মার		০পা	গলা	মা০	ঝি০	
I	মপা	মমা	-া	মপা	I	গপা	মগা	সা	মা	I	ণ্া	ণ্া	সজ্ঞা	রসা	I	সরা	সা	-া	-া	I

পাগ লা০ ০ ০০ ০০ ০০ নে ত র বৈ ঠানে রে০ ০০ ০ ০ ০

I -া সমা গগা গমা I মপা পা পদা পদা I মপমা মপা গমগা গমা I -া মা পপা পদা পদা I

০ ওরে ০আ মার পাগ লা মা০ ঝি০ ও০০ রে০ আ০০ মার ০পা গলা মা০ ঝি০

I মপা মমা -া মপা I গপা মগা সা সণ্া I ণ্া ণ্া সজ্ঞা রসা I সরা সা -া -া I

পাগ লা০ ০ ০০ ০০ ০০ নে তর ০ বৈ ঠানে রে০ ০০ ০ ০ ০

II -া মপা পমা নপা I নর্সা র্সর্সা র্সা র্রর্সা I নর্সা -ার্গা র্রর্সা র্সর্রর্সনা I -া ননা -ার্সা র্সর্সর্রা I

০ ঈশা নকো নে০ সাজ কই রা ছে০ ০মে ০ঘ কই রা০ছে০ ০ বায়ু ০০ কোণে০

I নর্সা -া -া পপা I পর্সা র্সর্সা র্সা -ার্রা I র্সণা ণধা ধধা ণধপা I -া র্সস-া -ার্সর্সা -ার্রা-া I

রে০ ০ ০ আমি ঠেক লাম পা গলা মা০ ঝি০ লই য়া০০ ০ ঠেকলা ০মপা গলা০

I র্সণা ণধা ধধা ণধপা I পা পদা মপা মপা I মগা গমা পপা পর্সা I সণা ণপা পমা পমগা I

মা০ ঝি০ লই য়া০০ না ওভি ড়াই তে০ ০০ উল্টা টানে মাঝি নাও ভি০ ড়াই তে০০

I -াগা গমা পদা -াদা I দা -া -া -া I -া -া দণদা পমা I গা গমা মা মপা I

০০ উল ০টা ০নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০০ ০০ ০ বই ঠা ০০

I গপা মগা সা সরা I ণ্া ণ্সা-া -াজ্ঞা রজ্ঞা I সরসা -া -া -া II

০০ ০০ নে তো০ র বইঠা ০নে রে০ ০০০ ০ ০ ০

II {-া মপা পমা-া নপা I -ানর্সা র্সা র্সা র্রর্সনা I নর্সা -ার্গা র্রর্সা র্সর্রর্সনা I া ননা -ার্সা র্সর্রা I

০ হা০ ছনরা জার ০ভা০ ঙ্গা ত রি০০ ০না ০ই যে০ ক০০০ ড়ি নাই কান্ ডারি

I নর্সা -া -া (পপা) I পর্সা র্সা র্সা র্সর্রা I র্সণা ণধা ধা ণধপা I -া র্সর্সা -ার্সা র্সর্রা I

০০ ০ ০ আমি ম০ ধ্যি খা নে০ ডুই বা০ ম রি০০ ০ মধ্যি ০খা নে০

I সণা ণধা ধা ণধপা I -াপা পদা পমা মগা I মগা গমা পপা পর্সা I র্সণা ণপা পমা পমগা I

০ডু ইবা ম রি০০ ০কা রকা ছে০ কই কে০ বা০ শুনে মাঝি কার কা০ ছে০ কই০

I -াগা গমা পদা -াদা I দা -া -া -া I -া -া দণদা পমা I গমা মা-া মা মপা I

০কে ০বা ০শু ০নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০০ ০০ বই ঠা০ ০ ০০

I গপা মগা রসা রসা I ণ্া ণ্সা-া -জ্ঞা রজ্ঞা I সরসা -া -া -া III

০০ ০০ নে০ তো০ র বইঠা ০নে রে০ ০০০ ০ ০ ০

(লাকী, ২০১৫ : ৪০)

৪.২.২ হাসন রাজার গানে সারি গানের সুরের প্রভাব

বাংলাদেশের গ্রামীণ সাংস্কৃতিক জীবনে সারি গান গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সারি গান লোকসংগীতের ঐতিহ্যবাহী ধারা, যা ধারাবাহিকভাবে গাওয়া হয় বিশেষ করে, নৌকা বাইচের সময় বাইছাল বা মাঝিরা কর্মের গতি ও সমন্বয় বজায় রাখতে গায়। তাই সারি গানকে বলা হয় কর্ম সংগীত। 'সারি' শব্দটি সাধারণত একটি লাইনে বা একই সারিতে থাকা বোঝায়। গবেষকদের মতে 'সারি' শব্দটি মধ্যেযুগের সাহিত্য থেকে এসেছে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাজে সংগীত অর্থে 'সারি' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। নৌকা বাইচ খেলার সময় সারি বৈঠা টেনে নৌকা বাওয়ার সময় এ গান করা হয় বলে এর নাম সারি গান। এক্ষেত্রে সারি গান সম্পর্কে প্রখ্যাত লোক গবেষক পল্লব সেন গুপ্তের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য–" নৌকা চালানোর সময় বৈঠা ফেলার ঝোঁকের সঙ্গে গাওয়া দ্রুত কিম্বা মধ্যলয়ের গানকেই 'সারি' বলে গণ্য করা হয়। ভাটিয়ালীর ধীর লয় কিম্বা লয়হীন সুরেলা টানের সঙ্গে ঐ ঝোক ও তালের সারিগানে এখানেই পার্থক্য। তাছাড়া, ভাটিয়ালী একক কণ্ঠের গান; সারি বৃন্দগীত।" (পাল, চৌধুরী ১৯৪৮ : ১২৮)

কর্মসংগীত হিসেবে লোকসংগীতে সারি গানের গুরুত্ব হলো :

১. মাঝিদের মনোবল বৃদ্ধি করে,

২. শ্রম বা কর্মের সমন্বয় ঘটায়,

৩. সামাজিক একত্মা ও ঐক্য তৈরি করে,

৪. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে, ও

৫. সামাজিক বিনোদন ও মনোরঞ্জন হয়।

বাংলা লোকসংগীতে সারি গানের যে গুরুত্ব ঠিক একই গুরুত্ব হাসন রাজার রচিত সারি গানে প্রকাশ পায় না। কেননা হাসন রাজার গান নিছক বিনোদনের জন্য নয়; এখানে সুরে সারি গানের প্রভাব থাকলেও তা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। তাই তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বাংলার প্রচলিত লোকসংগীত সারি গান শ্রমগাথা এবং দলীয় গান, অন্যদিকে হাসন রাজার রচিত সারি গান আত্মানুসন্ধানমূলক। গানের প্রভাবের দিক থেকেও রয়েছে পার্থক্য। প্রচলিত সারি গান কেবল বাহ্যিক উদ্দীপনা তৈরি করলেও হাসন রাজার গানে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবনার প্রভাব।

তাই বলা যেতে পারে, সারি গান আর হাসন রাজার গানের মধ্যে এক গভীর সাংস্কৃতিক ও সুরাত্মক যোগসূত্র রয়েছে। উভয় ধারাই বাংলার মাটি, নদী ও মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সারি গানের ছন্দের ভেতর দিয়ে হাসন রাজা এক নতুন ধ্যানময় সুরের জগৎ নির্মাণ করেছেন। যেখানে বাংলার নদী, নৌকা, প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নিম্নে সারি গানের সুরে রচিত হাসন রাজার গান দেওয়া হলো :

তাল: কাহারবা

ছাড়িলাম হাসনের নাও রে
হাসন রাজার নাও রে ঢলো ঢলো গুড়া
ওরে বৈঠা না ফালাইতে নাওয়ে শূন্যে করে উড়া ॥
হেঁইয়া হোঁ হেঁইয়া হেঁইয়া হোঁ হেঁইয়া
সুখের মায়ায় করছিল পিরিত নদীর কূলে বইয়া
এখন কেন ছাইড়া গেল সায়রে ভাসাইয়া রে ॥
হেঁইয়া হোঁ হেঁইয়া হেঁইয়া হোঁ হেঁইয়া
পিরিত রতন পিরিত যতন পিরিত হইল জ্বালা
পিরিত করা প্রাণে মরা মন না জানিয়ারে ॥
হেঁইয়া হোঁ হেঁইয়া হেঁইয়া হোঁ হেঁইয়া
নায়ে থাইকা হাসন রাজা বলে যে ডাকিয়া

পিরীতি না করিও রে ভাই মন না দেখিয়া রে ॥

(কবীর, ২০২১ : ৫০)

তাল: দ্রুত দাদরা

ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন।

সাধন বিনে নারীর সনে হারাইলাম মূলধন॥

আর দই বলিয়া চুন গুলিয়া খাইল কত জন।

হক না জেনে মুখ পুড়িল লালসের কারণ॥

আউলিয়া ছাড়া নদীর কূলে যে করে আসন।

জ্ঞানশূন্য রে কুম্ভীরে খায় ভাঙ্গিয়া গর্দন ॥

ফকির হাছন রাজায় বলে ঠেকছি খাইয়া নদীর জল

নিশার চোটে লাগলো ঠোঁটে উল্টা বড়ির কল ॥

II	-া	-া	গা	।	সা	রা	া	I	গা	মা	গা	।	রা	সা	-া	I			
I	০	০	ও		যৌ	ব	ন		ঘু	মে	০		র	স্ব	০				
I	ণ্	প্া	-া	।	-া	-া	-া	I	প্া	প্া	া	।	ণ্া	-ণা	-া	I			
I	প	ন	০		০	০	০		সা	ধ	ন		বি	নে	০				
I	সা	সা	া	।	গা	গা	-া	I	পা	পা	া	।	ধা	ণা	ধা	I			
I	না	রী	র		কা	ছে	০		হা	রা	ই		লাম	মূ	ল				
I	পা	মা	া	।	গা	সা	রা	I	গা	মা	গা	।	রা	সা	-া	I			
I	ধ	ন	০		যৌ	ব	ন		ঘু	মে	০		র	স্ব	০				
I	সা	-া	া	।	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I			
I	প	০	ন		০	০	০		০	০	০		০	০	০				

গা গা II গা া গা । গা সা রা I গা মা গা । রা সা -া I

আ র দ ই ব লি য়া ০ চু ন গু লি য়া ০

I সা া সা । রা সা -া I সা -া -া । -া -া -া I

I খা ই লো ক ত ০ জ ০ ন ০ ০ ০

I ধ্া া ধ্া । সা সা -া I রা রা মা । মা মা -া I

I হ ক না জে নে ০ মু খ পু ড়ি ল ০

I পা পা -া । ধা ণা ধা I পা -মা া । -া -া -া II

লা ল ০ সের কা ০ র ০ ণ ০ ০ ০

গা গা II গা া গা । গা সা রা I গা মা গা । রা সা -া I

আ র আউ লি য়া ছা ড়া ০ ন দী র কূ লে ০

I সা -া সা । রা সা -া I সা -া া । -া -া -া I

I যে ০ ক রে আ ০ স ০ ন ০ ০ ০

I ধ্া া ধ্া । সা সা -া I রা রা মা । মা মা -া I

I জ্ঞা ন শূ ন্য রে ০ কু ম্ ভী রে খা য়

I পা পা -া । ধা ণা ধা I পা -মা া । -া -া -া II

ভা ঙ্ গি য়া গ র্ দ ন ০ ০ ০ ০

গা গা II গা া গা । গা সা রা I গা মা গা । রা সা -া I

ফ কির হা ছ ন রা জা য় ব লে ০ ঠে ক ছি

I	সা	া	সা	।	রা	সা	-া	I	সা	-া	-া	।	-া	-া	-া	I
I	খা	ই	য়া		ন	দী	র		জ	০	ল		০	০	০	
I	ধ্া	া	ধ্া	।	সা	সা	-া	I	রা	রা	মা	।	মা	মা	-া	I
I	নি	শা	র		চো	টে	০		লা	গ	লো		ঠোঁ	টে	০	
I	পা	পা	া	।	ধা	ণা	ধা	I	পা	-মা	-া	।	-া	-া	-া	IIII
	উ	ল্	টা		বা	ড়ি	র		ক	ল	০		০	০	০	

(লাকী, ২০১৫ : ৩৮)

৪.২.৩ হাসন রাজার গানে মারেফতি গানের সুরের প্রভাব

বাংলা লোকসংগীতে মারেফতি বা মারফতি গান বেশ জনপ্রিয়। এ গান সুফিবাদ আশ্রিত ভক্তিমূলক গান। আল্লাহর প্রতি প্রেম ভক্তি নিবেদন করার জন্য মরমি সাধকেরা এই গান গেয়ে থাকেন। 'মারেফত' শব্দটি এসেছে আরবি 'মারিফা' (Marifa) থেকে, যার অর্থ হলো আধ্যাত্মিক বা গুপ্তজ্ঞান। মারেফতি গান মূলত আত্ম উপলব্ধি, স্রষ্টার একাত্মতা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। এ গানের বৈশিষ্ট হলো :

- দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য
- প্রতীকি ভাষা ও গূঢ়তত্ত্বের ব্যবহার
- আত্ম-সন্ধান ও আল্লাহর সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা
- এটি মূলত একক কণ্ঠের গান

মারেফতি গানের উৎস সম্পর্কে লোকসংস্কৃতি গবেষক অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন,

> মারফতি সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার আদি উৎস পবিত্র কোরান ও হজরত মহাম্মদ (স.) এর জীবনী ও বাণী। পবিত্র কোরানে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ কর্তৃক মানবসৃষ্টির এবং আল্লাহর সাথে মানব সম্পর্কের নানা বিষয় রয়েছে। সুফিতত্ত্বে যার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

হযরত মহম্মদ (স.)–এর পবিত্র জীবন ও বাণীর মাধ্যমেও সুফিমতবাদের নানা তথ্য ও উপকরণের সূত্র নিহিত রয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত রসুল হযরত মুহম্মদ (স.)–কে 'নুর-নবী' (নূর-ই-নবী) বলা হয়, কেননা আল্লাহ তাঁকে নিজের 'ছুরাতে' পয়দা করেছেন। মহান আল্লাহ স্বয়ং 'নূর' বা জ্যোতিস্বরূপ। নূর আরবী শব্দ, অর্থ আলো বা জ্যোতি। 'নূর-নবী'র অর্থ আলোকিত মহাপুরুষ। মুসলিম বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন আল্লাহর নূরে আলোকিত মহানবী বা শ্রেষ্ঠ মানুষ। বাউল কবি পাঞ্জুশাহ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন,"আল্লাহর নূরে নবী পয়দা, নবীর নূরে সারা জাহান নূরে জানে আদম তনে বসত করে বর্তমান। (আহমদ, ২০১৫ : ৯-১০)

মারেফতি গান মূলত সুফি দর্শনের একটি শাখা যেখানে আত্মজ্ঞান, আত্মা ও স্রষ্টার মিলন এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। হাসন রাজার গানের মূল দর্শনও তাই ভোগবাদি দুনিয়া ছেড়ে প্রাণ প্রিয়ার সান্নিধ্য লাভ করা। তাই লক্ষ করলে দেখা যায় হাসন রাজার গানে মারেফতি গানের তত্ত্ব ও সুরের প্রভাব গভীরভাবে প্রোথিত। তাঁর বাণী ও সুর একদিকে যেমন লোকসংগীতের ঘরনায় পড়ে, তেমনি তাতে সুফি সুরের আধ্যাত্মিক নির্যাস প্রবাহিত হয়। আত্মজ্ঞানের সন্ধান, অহং বিসর্জন। প্রেমময় ভক্তি এবং নিরাকার সত্তার প্রতি আকর্ষণ– এসবই হাসন রাজার গানের মধ্যে দিয়ে মারেফতি ভাবধারাকে জীবন্ত করে তোলে। নিম্নে হাসন রাজার মারেফতি সুরে রচিত গানের উদাহরণ দেওয়া হলো :

তাল: দ্রুত দাদরা

বিচার করি চাইয়া দেখি সকলি যে আমি।
সোনামামী! সোনা মামী গো! আমারে করিলায় বদনামি ॥
আমি হইতে আল্লা রছুল, আমি হইতে কুল।
পাগলা হাছন রাজা বলে, তাতে নাই মোর ভুল ॥
আমা হইতে আসমান জমিন আমি হইতেই সব।
আমি হইতে ত্রিজগৎ, আমি হইতে রব ॥
আমি আউয়াল, আমি আখের জাহের বাতিন।
না বুঝিয়া দেশের লোকে, বাসে মোরে ভিন্ ॥
আমা হইতে পয়দা হইছে এই ত্রিজগৎ।
গউর করি চাইয়া দেখ হে আমার ও মত ॥
আক্কেল হইতে পয়দা হইল মাবুদ আল্লার।
বিশ্বাসে করিল পয়দা রছুল উল্লার ॥
মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন।

কর্ণ হইতে পয়দা হইছে মুসলমানী দিন ॥
আর পয়দা করিল যে শুনিবারে যত।
সবদ, সাবদ আওয়াজ ইত্যাদি যে কত ॥
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিয়াছে, ঠাণ্ডা আর গরম ॥
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় আর বদবয়,
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাছন রাজা কয় ॥
মরণ জিয়ন নাইরে আমার ভাবিয়া দেখ ভাই।
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি এই দেখতে পাই ॥
পাগল হইয়া হাছন রাজা কিসেতে কি কয়।
মরব মরব দেশের লোক মোর কথা যদি লয়॥
জিহবায় বানাইয়া আছে মিঠা আর তিতা।
জীবের মরণ নাইরে দেখ সর্বদাই জিতা ॥
আপন চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়।
হাছন রাজায় আপন চিনিয়ে এই গান গায় ॥

II	মা	া	মা	।	মা	পা	-া	I	পা	া	ধা	।	পা	ধা	া	I
I	বি	চা	র		ক	রি	০		চা	ই	য়া		দে	খি	০	
I	র্সা	র্সা	-া	।	ণা	ধা	-া	I	পা	মা	-া	।	গা	সা	-া	I
I	স	ক	০		লি	যে	০		আ	মি	০		সো	না	০	
I	রা	রা	-া	।	-া	-া	-া	I	পা	া	পা	।	মা	গা	-া	I
I	মা	মী	০		০	০	০		মা	মী	০		গো	০	০	
I	রা	রা	-া	।	মা	গা	-া	I	রা	মা	গা	।	রা	সা	া	I
I	আ	মা	০		রে	ক	০		রি	লা	ই		ব	০	দ	

I সা া -া । -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া II

I না মি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা া সা । রা রা -া I মা া মা । মা মা গা I

I আ মি ০ হই তে ০ আ ল্ লা রা ছু ল

I সা া সা । রা মা গা I রা -া া । -া -া -া I

I আ মি ০ হই তে ০ কু ০ ল ০ ০ ০

I সা রা া । রা পা া I পা পা া । মা া রা I

I পা গ ল হা ছ ন রা জা য় ব লে ০

I মজ্ঞা জ্ঞা -া । রা সা া I সা -া া । -া -া -া II

I তা০ তে ০ নাই মো র ভু ০ ল ০ ০ ০

II সা া সা । রা রা -া I মা া মা । মা মা গা I

I আ মি ০ হই তে ০ আস্ মা ন জ মি ন

II সা া সা । রা মা গা I রা -া া । -া -া -া I

I আ মি ০ হই তে ০ স ০ ব ০ ০ ০

I সা রা -া । রা পা -া I পা পা -া । মা া রা I

I আ মি ০ হই তে ০ ত্রি ০ ০ জ গ ৎ

I মজ্ঞা জ্ঞা -া । রা সা া I সা -া া । -া -া -া II

I আ০ মি ০ হই তে ০ র ০ ব ০ ০ ০

II	মা	পা	-া	।	না	না	-া	I	র্সা	া	র্সা	।	র্সা	র্সা	া	I
I	আ	মি	০		আউ	য়া	ল		আ	মি	০		আ	খে	র	
I	র্রা	র্জ্ঞা	-া	।	র্রা	র্সা	-া	I	র্সা	া	া	।	-া	-া	-া	I
I	জা	হে	০		র	বা	০		তি	০	ন		০	০	০	
I	র্সা	না	-া	।	র্সা	র্রা	-া	I	র্সা	ণা	া	।	ধা	পা	-া	I
I	না	বু	০		ঝি	য়া	০		দে	শে	র		লো	কে	০	
I	ণা	ণা	-া	।	ধা	পা	ধা	I	মা	-া	া	।	-া	-া	-া	II
I	বা	সে	০		মো	রে	০		ভি	০	ন		০	০	০	

(লাকী, ২০১৫ : ৮৩)

[বাকি অন্তরা একই সুরে রচিত]

৪.২.৪ হাসন রাজার গানে ধামাইল সুরের প্রভাব

ধামাইল গান বাংলা লোকসংগীতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– যা নৃত্যসহযোগে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এ গানের ধারা সিলেট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিস্তার লাভ করেছে। এ গান বিশেষভাবে নারীদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সামাজিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এ গানের ব্যবহার লক্ষণীয়। ধামাইল গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর গীতনৃত্যের রীতি। নারীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একে অপরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করতালি ও পদচারণার মাধ্যমে গান পরিবেশন করে। গানের বিষয়বস্তুতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা ভক্তি, নারীর সংসার জীবনের অভিজ্ঞতা আবেগ এবং আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রকাশ ঘটে। সাংগেতিক দিক থেকে এ গান সাধারণত দ্রুত দাদরা, কাহারবা তালে গীত হয়। ঢোল, মন্দিরা, করতাল, খোর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় ধামাইল গান আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ধামাইল গান ও নৃত্যের পরিবেশন রীতি সম্পর্কে গবেষক সুমন কুমার দাস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "দ্রুতলয়ে নৃত্য চলাকালীন ৯ মাত্রার পর ১০, ১১ মাত্রার মধ্যে অঙ্গকে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে এনে 'সম'- এ স্থাপন কৃতিত্বের পরিচায়ক। নৃত্যটি ১২ মাত্রার পর প্রতিটি ৩ মাত্রায় ডানে বাঁয়ে পিছনে সামনে চক্রোকারে ঘুরে ঘুরে মাঝে মাঝে একটা প্রস্ফুটিত ফুলের রূপ দেওয়ার কৌশল মাত্র।" (দাশ, ২০১০ : ৮) মরমি কবি

হাসন রাজার গানের সুরে ও ছন্দে সিলেট অঞ্চলের প্রাচীন ও জনপ্রিয় লোকসংগীত ধারা ধামাইল গানের সুরের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর গানের সুরে ধামাইলের ছন্দ, রিদম ও গীতিনৃত্য ঐতিহ্য একটি স্বকীয় রূপে স্থান পেয়েছে। এমন একটি গানের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

তাল: দাদরা (দ্রুতলয়)

লোকে বলে বলেরে ঘর বাড়ি ভালা না আমার।
কী ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার॥
ভালা করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকমু আর।
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাক না চুল আমার॥
এ ভাবিয়া হাছন রাজা ঘর-দুয়ার না বান্দে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় তাই ভাবিয়া কান্দে॥
জানত যদি হাছন রাজা বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান-কোঠা করিয়া রঙ্গিন ॥

II	-া	-া	-া	।	ন্া	সা	-া	I	রা	রা	-া	।	-া	-া	-া	I
I	০	০	০		লো	কে	০		ব	লে	য়া		০	০	০	
I	পা	পা	-া	।	মা	-গা	-রা	I	রা	া	রা	।	মা	গা	-া	I
I	ব	লে	০		রে	০	০		ঘ	র্	বা		ড়ি	ভা	০	
I	রা	-গা	-রা	।	সা	সা	-া	I	সা	-া	া	।	-া	ন্া	সা	I
I	লা	০	০		না	আ	০		মা	০	র্		০	লো	কে	
I	রা	রা	-া	।	-া	-া	-া	I	মা	-া	মা	।	মা	মা	-া	I
I	ব	লে	০		০	০	০		কি	০	ঘ		র	বা	০	
I	পা	া	ধা	।	পা	ধা	-া	I	র্সা	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	-পা	I

I না ই মু আ মি ০ শূ ন্ নে র মা ০

I পা -ধা -পা । মা গা -া II

I ঝা ০ র লো কে ০

II সা সা -া । রা রা -া I পা পা -া । পমা মা -া I

I ভা লা ০ ক রি ০ ঘ র্ বা নাই য়া ০

I মা -া -া । -া -া মগা I সা সা -া । রা মা গা I

I ০ ০ ০ ০ ০ ০০ কয় দি ন্ থা ক্মু ০

I বা -রা া । -া -া -া I মা া মা । মা মা -া I

I আ ০ র্ ০ ০ ০ আ য় না দি য়া ০

I পা া পা । পা ধা -া I র্সা র্সা া । র্সা র্সা পা I

I চা ই য়া দে খি ০ পা ক্ না চুল আ ০

I পা -ধা -পা । মা গা -া II

I মা ০ র লো কে ০

II সা সা -া । রা রা -া I পা পা -া । পমা মা -া I

I এ ই ভা বি য়া ০ হা ছ ন্ রা০ জা ০

I মা -া -া । -া -া মগা I সা সা -া । রা মা গা I

I ০ ০ ০ ০ ০ য়০ ঘর্ দু য়া র না ০

I রা -রা া । -া -া -া I মা -া মা । মা মা -া I

I বান্ দে ০ ০ ০ ০ কো থা য়্ নি য়া ০

I পা -া পা । পা ধা -া I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা পা I

I রা খ্ বা আ ল্লা য় এর লা ০ গি য়া ০

I পা -ধা -পা । মা গা -া II

I কা ন দে লো কে ০

II সা সা -া । রা রা -া I পা পা -া । পমা মা -া I

I হা ছ ন্ রা জা য় বু ঝ তো য০ দি ০

I মা -া -া । -া -া মগা I সা সা -া । রা মা গা I

I ০ ০ ০ ০ ০ ০০ বাঁ চ্ ব ক ত ০

I রা -রা া । -া -া -া I মা -া মা । মা মা -া I

I দি ন্ ০ ০ ০ ০ বা না ০ ই ত ০

I পা -া পা । পা ধা -া I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা পা I

I দা লা্ ন্ কো ঠা ০ ক রি ০ য়া র ং

I পা -ধা -পা । মা গা -া IIII

I গি ০ ন লো কে ০

(লাকী, ২০১৫, ৯৭)

এই গানের সুরে রয়েছে ধামাইল গানের ঐতিহ্যবাহী দুলুনীর মতো ছন্দ, করতালসদৃশ তালে গাথা গানের গঠন এবং গীতিনৃত্য উপযোগী গতি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– হাসন রাজার গানে প্রেম ও ভক্তির মিলন, অন্যদিকে ধামাইল গানেও একইভাবে রাধা কৃষ্ণের প্রেমের আকুতি, আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ।

এই বিষয়গত মিল গানগুলোর সুর ও আবেগের ক্ষেত্রে এক ধরনের অন্তঃসংযোগ তৈরি করে। এছাড়া ধামাইল গানের বহুরৈখিক আবেগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক সুররীতি হাসন রাজার গানের গঠনেও প্রতিফলিত হয়। তাই সার্বিকভাবে বলা যায় হাসন রাজার গান কেবল আধ্যাত্মিকতার বাহক নয়, বরং লোকঐতিহ্যের ধারক হিসেবেও ধামাইল সুরের এক ধারাবাহিক উত্তরাধিকার। তাঁর সৃষ্টি কর্মে ধামাইল গানের ছন্দ, রিদম ও আবেগ এমনভাবে মিশে আছে যা বাংলার লোকসংগীতকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।

৪.২.৫ হাসন রাজার গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব

বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাসান রাজার গানগুলোতে যে সুরপ্রবাহ বিরাজ করে, তা শুধু লোকায়ত সুর নয়; অনেক ক্ষেত্রেই রাগভিত্তিক সংগীতের প্রভাব রয়েছে। বিশেষত, তাঁর বহু গানে ব্যবহৃত হয়েছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের নির্দিষ্ট রাগের স্বররচনার ছায়া। এই রাগপ্রভাব একদিকে গানের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে গভীরতা দেয়, অন্যদিকে শ্রোতার মানসিক অনুভূতির উপর সুরের প্রভাব সঞ্চার করে।

ভৈরবী রাগ হাসান রাজার গানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাগ হিসেবে দেখা যায়। ভৈরবী রাগে ব্যবহৃত কোমল স্বরগুলো (ঋ, জ্ঞা, দা, ণা) মূলত বিষণ্নতা, মরমিয়া ভাব এবং আত্মদর্শনের প্রতীক। এই রাগ সাধারণত শেষ রাত বা প্রভাতকালে পরিবেশিত হয়, যার ভাববাচকতা হাসান রাজার দর্শনের সাথে মিলে যায়। যেমন:

ওবা মুর্শিদ আল্লাহ্‌জি ওবা হাদি আল্লাহজি
আমারে ভাসাইলায় বা আল্লাহ ভবসিন্ধু নীরে
বঞ্চিতে না পারি আমি তিলেক মাত্র তীরে।।
(লাকী ২০১৫ : ৩৬)

এই ধরনের গানে ভৈরবী রাগের সুরের ছোঁয়া শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রোতারা অনায়াসে টের পান। এই রাগের আবেগ তার আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

খাম্বাজ রাগের প্রভাব হাসান রাজার কিছু গানে পাওয়া যায়, যেখানে কিছুটা নাচন-ভঙ্গিমা, অথবা প্রেম ও দেহতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। খাম্বাজ রাগ মূলত সন্ধ্যার রাগ এবং এটি প্রায়শই ঠুমরি বা দাদরার মতো সংগীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

পীড়িত করিয়ে পীড়িত করিয়ে
মোর মোন উদাসী

প্রাণ গেলো প্রাণ গেলো বন্ধুরে ভালোবাসি
মোর মন উদাসী
কথা কয় প্রাণ বন্ধে যখন হাসি হাসি
দেখিয়ে তাঁর রূপের বাহার
আইসে মোর বেহুশী
(রাজা, ২০০৯ : ২২০)

হাসন রাজার এই গানে ধীরলয়ের তালে কিন্তু গাঢ় অনুভবের বিস্তার রয়েছে, তা খাম্বাজ রাগের প্রয়োগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

হাসন রাজার গানে পিলু রাগের ব্যবহারও লক্ষণীয়। পিলু রাগ একটি লঘু রাগ, কিন্তু এতে প্রেম, আবেগ ও বিষাদের মিশেল রয়েছে। হাসন রাজার অনেক গানেই মানবপ্রেমকে ঈশ্বরপ্রেমে রূপান্তর করার চেষ্টা দেখা যায়–এই রূপান্তরের সংগীতিক ভঙ্গিতে পিলু রাগের স্বরচর্যা যুক্ত হতে দেখা যায়। "তুমি কে আর আমিবা কে, তাইতো আমি বুঝি না রে, একবিনে দ্বিতীয় আমি অন্য কিছু দেখি নারে" (রাজা, ২০০৯ : ১৯৭) –এই ধরনের গানে যে সুরপ্রবাহ দেখা যায়, তা পিলুর স্বরবিন্যাসের কাছাকাছি।

কিছু গান দেশ রাগের ছায়াও বহন করে। দেশ রাগ সাধারণত প্রেম, আশা এবং চঞ্চল ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। হাসান রাজার কিছু গান–বিশেষত যেখানে মানবপ্রেম বা রূপতত্ত্বের উপস্থাপন রয়েছে–সে সব গানে দেশ রাগের চলন লক্ষ করা যায়। যদিও এ প্রভাব স্পষ্ট নয়, তবুও দেশ রাগের স্বরের সম্ভাব্য প্রয়োগ গানগুলিকে একটি বহুমাত্রিক সুরভঙ্গি দিয়েছে।

তাঁর সুরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব গানের ধারাকে একটি সংগীতিক শৈল্পিকতা ও পরিমার্জিত রূপ দিয়েছে। এইসব বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, হাসন রাজার গান একদিকে লোকায়ত অনুভব, অন্যদিকে ধ্রুপদী সুরচর্চার এক অনন্য সংমিশ্রণ। তিনি প্রথাগত রাগ প্রয়োগ করেননি, বরং রাগের ছায়া, স্বরের আবেশ ও গঠনের মধ্যে দিয়ে তাঁর গানকে এক অনন্য আবহ সৃষ্টি করেছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই সূক্ষ্ম উপস্থিতি তাঁর গানকে করেছে গভীর, সুরলহরিতে পূর্ণ এবং আধ্যাত্মিকভাবে প্রভাবিত।

সর্বোপরি, হাসান রাজার গানে লোকধারা ও ধ্রুপদী সংগীতের সংমিশ্রণ বাংলা সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাংগীতিক ধারার সৃষ্টি করেছে, যা মরমিয়া সংগীতের এক নতুন মাত্রা নির্দেশ করে। এই ধারায় রাগের ব্যবহার সরাসরি না হলেও, সুরের যে সৌন্দর্য ও বুনন তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা বাংলা সংগীতকে দিয়েছে এক পরিশীলিত, হৃদয়স্পর্শী রূপ।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা লোকসংগীত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি জীবনের আবেগ বিশ্বাস, আশা ও বেদনার এক প্রাকৃতিক ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেছে, আর এই ধারার অন্যতম শক্তিশালী অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই মরমি সাধক হাসন রাজার গানে। তিনি লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারা যেমন বাউল, ভাটিয়ালি, সারি ইত্যাদি সৃষ্টি নিজের সংগীতের মধ্যে এমনভাবে ধারণ ও একীভূত করেছেন যা তাঁর গানের আবেদনকে বহুমাত্রিক, গভীর ও সার্বজনীন করে তুলেছে। বাংলা লোকসংগীত হাসন রাজার গানে শুধু সুরের বৈচিত্র্য এনে দেয়নি, এটি তাঁকে এক দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক সত্তায় রূপান্তর করেছে।

তথ্যসূত্র

১. ওয়াহাব, আবদুল, (২০০৭), *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, আবদুল ওয়াহাব, ঢাকা

২. আহমদ, ওয়াকিল, (২০১৫), *মারফতি ও মুর্শিদি গান*, গতিধারা, ঢাকা

৩. আহ্‌মাদ, মোস্তাক, (২০১৯), *হাছন রাজার মরমী সংগীতের সূফিরহস্য*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা

৪. কবীর, জাহিদুল, (২০২১), *বাঙালির মরমী সাধনায় হাসন রাজার গান*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

৫. চক্রবর্তী, মৃদুলকান্তি, (২০২০), *লোকসঙ্গীত ও স্বরলিপি*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা

৬. চক্রবর্তী, সুধীর, (২০১৪), *বাউল ফকির কথা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (২০১৭), *গীতবিতান*, অনিদ্য প্রকাশ, ঢাকা

৮. দাশ, সুমনকুমার, (২০১০), *বাংলাদেশের ধামাইল গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৯. পাল, অমর ও চৌধুরী, দুলাল, (১৯৪৮), *বাংলার লোকসংগীত*, পাঁচালি প্রকাশন, কলকাতা

১০. মাননান, আবদেল, (২০১০), *লালনসমগ্র*, নালন্দা, ঢাকা

১১. মুখোপাধ্যায়, শ্রী হরেকৃষ্ণ, (১৯৯৮), *পদাবলী পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১২. মুখোপাধ্যায়, শ্রী হরেকৃষ্ণ, (১৪২৩), *কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১৩. রহমান, ম. হাবিবুর, (২০০৮), *বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, বিজয় প্রকাশ, ঢাকা

১৪. রাজা, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার, (২০০৯), *হাছন রাজ সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

১৫. লাকী, লিয়াকত আলী, (২০১৫), *হাছন রাজার ৫০টি গানের স্বরলিপি*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা

১৬. সরকার, যতীন, (২০১৪), *জালালগীতিকা সমগ্র*, নন্দিত, ঢাকা

১৭. হাই, মুহম্মদ আবদুল, ও পাশা, আনোয়ার (সম্পা.), (২০১৯), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

১৮. হোসেন, আবু ইসহাক, (২০১৯), *বাংলার মরমি মানস*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা

পঞ্চম অধ্যায়

রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের বিষয় ও সুর : তুলনামূলক পর্যালোচনা

পঞ্চম অধ্যায়

রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজার গানের বিষয় ও সুর : তুলনামূলক পর্যালোচনা

৫.১ পটভূমি

বাংলা লোকসংগীতের অন্যান্য ধারার ন্যায় বাউল, বৈষ্ণব, সুফি প্রভৃতি ধারা আমাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত। এই ধারাগুলো বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির গভীরতম স্তরগুলোকে স্পর্শ করেছে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বাউলের দেহবাদী সাধনা, বৈষ্ণবের ধর্মীয় ভক্তি এবং সুফি সাধনার আধ্যাত্মিক ঐক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের লোকসংগীত বিশ্বজনীন ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ তথা বাংলা লোকসংগীতের এই ধারায় রাধারমণ ও হাসন রাজার গান যুগ যুগ ধরে এ জনপদের মানুষের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। এই দুই লোক সাধকের গান কেবল সংগীত বা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নয় বরং এ দেশের মানুষের জীবন দর্শন, সমাজিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার গভীর প্রকাশ। এই দিক থেকে রাধারমণ ও হাসন রাজা–উভয়ই বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির প্রাণ। এবং তাদের গানের মাধ্যমে আমরা বাংলার গ্রামীণ জীবনের রূপ-রেখা, মানুষের অনুভূতি, ধর্মীয় ভক্তি ও সামাজিক বাস্তবতার একটি জীবন্ত চিত্র লক্ষ করি। এই দুই লোক কবির গানগুলোতে বৈষ্ণববাদী ভক্তি ও সুফিবাদী আধ্যাত্মিকতার চমৎকার মিশ্রণ লক্ষণীয়– যা বাংলা লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যকে এক অনন্য দিশা দিয়েছে। রাধারমণ ও হাজান রাজার গান যে কেবল স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংগীত হিসেবে সীমাবদ্ধ তা নয়, বরং ধর্মীয় দর্শন ও লোকজ জীবনমুখি চিন্তাধারার দিক থেকে ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্ব মানব সংস্কৃতির এক উচ্চতর সংস্কার।

রাধারমণের গানে বৈষ্ণব দর্শনের পাশাপাশি প্রকৃতি ও মানব জীবনের মেলবন্ধন দৃশ্যমান। তাঁর গানগুলোতে গ্রামীণ জীবনের সাদামাটা অথচ অর্থবহ ঘটনাবলি, কৃষিজীবিদের জীবন সংগ্রাম, প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ, প্রেম ও ভক্তির সরল প্রকাশ লক্ষ করা যায়। রাধারমণের গানে প্রকৃতি কেবল ক্ষেত্র নয়, বরং একটি প্রাণবান সত্ত্বা হিসেবে বিবেচিত–যা মানুষের আবেগ অনুভূতি, সুখ-দুঃখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রাখে।

এ সবই এই অঞ্চলের মানুষের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। যেখানে মানুষের জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলো গভীর মানবতাবোধ ও নৈতিকতা দ্বারা আলোচিত করার মূলে পিতৃদেবের দর্শনের প্রভাব রয়েছে। শৈশবে বৈষ্ণব-সহজীয়া দর্শনে অনুপ্রাণিত হওয়ায় তিনি পরবর্তীকালে প্রায় ৮০ বছরের জীবনকালে মহাত্মা রাধারমণ দত্ত মানব ও প্রকৃতি প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ যে সব সৃষ্টিকর্ম রেখে গেছন তা কেবল বাঙালি সংস্কৃতি নয়, ববং তা মানব সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। যেহেতু শৈশবে রাধারমণ পিতৃদেবের কাছে সহজিয়া দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন তাই তাঁর গানের দর্শনে বৈষ্ণব দর্শন স্পষ্টত প্রতিফলিত হয়। তিনি সাধনায় নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সমর্থ হন। গবেষক আবুল খায়ের রাধারমণের দর্শন চর্চার সাধন মার্গ সম্পর্কে বলেন :

> লোকায়ত দর্শন চর্চায় নিজেকে সাধন মার্গের এমন পর্যায় উন্নীত করেন যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ বিরহকে নিজ প্রপঞ্চে ধারণ করে তা স্বকণ্ঠে স্বভাব কবির মতো কথা ও সুরে প্রকাশ করার মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র নিজেকেই সুশোভিত করেন না– উপরন্তু, রাধারমণ হয়ে ওঠেন বড়ু চণ্ডীদাসের বিকাশিত, বর্ধিত ও পূর্ববাদীয় লোকজ রূপ। প্রকৃত অর্থেই হয়ে ওঠেন চিরায়ত বাংলার আত্মা এবং একজন পরিপূর্ণ দার্শনিক কবি। (সেলিম ও রায় ২০১৬ : ১৫৫)

বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব বিশ্বরূপে সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তি আত্মশুদ্ধি ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এ-সব ভাব রাধারমণের গানে প্রখরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এই গানগুলোর কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু হলো রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি যা আধ্যাত্মিক প্রেমের চিত্রায়ণ। কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে গানের ভাষায় মানবজীবনের নান্দনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার এক অসাধারণ সংমিশ্রণ গড়ে ওঠে।

রাধারমণের গানে প্রেমের প্রতীকী ব্যাখ্যার মাধ্যমে জীবনের বেদনা, আনন্দ ও মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়–যা বৈষ্ণব দর্শনের অন্তর্নিহিত দিক। বিষয়টি রাধারমণের গানের উদাহরণের মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয় :

পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে গো যতনে রাখিও তারে
পিরিতি পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে কি আর মিলে,
ফুল চন্দন তুলসী দিয়া রাখিও যতনে।
রমণচন্দে বলে সখা কি ভাবিছ মনেতে,
কর্মদোষে মজল না মন শ্যাম বন্ধের পিরিতে।

(বাগচী, ২০১৩ : ৯৬)

অন্যদিকে হাসন রাজার গানে সুফিবাদী দর্শনের এক সূক্ষ্ম প্রতিফলন লক্ষণীয়। যার গানে মূল ভাবনা হলো সুফিবাদ। মহান আল্লাহর সাথে মিলন ও আধ্যাত্মিক মুক্তি, যা মানুষের অন্তরের গভীরে অদৃশ্য প্রেম ও একাত্মতার অনুভূতিকে জাগ্রত করে। এই প্রেমাস্পদকে পাওয়া ছিলো হাসন সাধনার মূল লক্ষ্য। হাসন প্রেমাস্পদকে 'অন্তরিয়া' বলেছেন। "এই অন্তরিয়াই হচ্ছে হাসন রাজার আল্লাহর খোদা মৌলা হরি, গৌরহরি, শ্যাম, ঠাকুর, প্রাণবন্ধ ইত্যাদি। মুর্শিদ বা প্রেমাস্পদের স্বরূপ দেখে হাসন রাজা আত্মহারা।" (চৌধুরি, ২০০৯ : ৭১৫)

হাসন রাজার সুফি সাধন সম্পর্কে গবেষক মকবুল ইসলাম বলেন, "হাসন রাজা মরমী কবি। তিনি পরমকে অন্বেষণ করেছেন, পেয়েছেনও। তাঁর আরাধ্যকে তিনি 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি কখনও আল্লাহ, কখনও কানাই নামে সম্বোধিত। নাম যাই হোক না কেন, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই হাসন রাজার 'সাধ্য' তাঁর প্রাপ্তির লক্ষ্য, তার আধ্যাত্মিক গন্তব্য।" (ইসলাম, ২০২২ : ১৮)

জগতের স্বামী সকলি তুমি
আমার পানে চাইয়া দেখি আমিও তুমি ॥
তুমি ঘরে তুমি বাইরে তুমি অন্তর্যামী
বুকেতে রাখিয়া কেন চতুর্দিকে ভ্রমি ॥
হাসন রাজায় দেখিয়া পারে না রাখিতে ঠমি
বিচার কইর‍্যা চাইয়া দেখি তুমি এই আমি ॥

(রাজা, ২০০৯ : ৬৪১)

হাসন রাজার গানে আমরা দেখতে পাই সাদাসিধে ভাষায় আধ্যাত্মিক সাধনা, মানসিকতা ও নৈতিকতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। তাঁর গানগুলোতে অহং, মায়া ও শোকের বিরুদ্ধে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ভাবনা প্রকাশ পায়, যা সুফিবাদী তত্ত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষের জীবনের ধ্যান ও আত্মঅন্বেষণকে অনুপ্রাণিত করে। হাসন রাজার গানে আধ্যাত্মিক মুক্তি ও মানবীয় জীবনের সাধনার সংমিশ্রণ লক্ষণীয় যা সুফিবাদী দর্শনের অন্যতম মৌলিক বিষয়।

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বিষয় ও সুরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, প্রেমের ধরন, ভাষা ও ছন্দের প্রকৃতি, গীতিকবিতার আঙ্গিক ও সুর, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবতাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয় বক্ষমান গবেষণায়। রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের আলোচনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো।

৫.১.১ ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে কেবল সংগীতের ক্ষেত্রে নয় বরং ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মানুসন্ধানের এক গভীর ব্যাঞ্জনা বহন করে। রাধারমণ ছিলেন বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু আধ্যাত্মিক ভাবনার ধারক। এজন্য তাঁর গানে প্রকাশ পায় ভক্তি ও প্রেম। তবে রাধারমণের গানের প্রেম মানবিক প্রেমোপাখ্যান নয়। এতে লৌকিক কাহিনি তথা বৈষ্ণবীয় ধর্ম দর্শনের অলৌকিক কাব্যের রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা এবং রাধা জীবাত্মা ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা দুয়ের সম্পর্ক প্রেমের। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে ভেদ ঘুচে গিয়ে অভেদরূপ লাভ করে। (হাই ও শরীফ ১৯৯৮: গ-ঘ)

বৈষ্ণবীয় ধারার এই প্রেম তত্ত্বকে শশিভূষণ দাসগুপ্ত ব্যাখ্যা করেছে এভাবে– "বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা নিত্য কিশোর কিশোরী, এই নিত্য কিশোর কিশোরীর নিত্য প্রেমলীলাই একমাত্র আস্বাদ্য। বলা যাইতে পারে যে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতু রাধা ও কৃষ্ণত স্বরূপতঃ একই; স্বরূপতঃ যাহা এক তাহার আবার যুগলমূর্তির কল্পনা কেন? ইহার জবাব এই যে, উভয়ই এক হইয়াও লীলাবদলে আবার দুই অভেদের ভিতরেই ভেদ। অচিন্ত্য শক্তি বলেই এই লীলাবিলাসে ভেদ ইহাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ।" (দাসগুপ্ত, ১৩৯৬ : ২১৭) সুতরাং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের দিক থেকে রাধারমণের গানে প্রেম এবং ভক্তিই মূখ্য যে প্রেম জগৎ সংসারের বাধা মানে না, লোকলজ্জার ধার ধারে না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে রাধারমণের গানের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– প্রার্থনা। দয়াল, গুরু, দয়াময়, গৌর, বন্ধু হরি– প্রমুখের শরণ নিয়ে রাধারমণ এ জগৎ সংসারের পাপ পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধারের আকুতি জানিয়েছেন। তিনি জানেন যাঁর আশ্রয় তিনি নিয়েছেন তিনি দয়াময় কৃপার সিন্ধু পরম বন্ধু। তাই তিনি রচনা করেন :

আমার মরণকালে কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণনাম ললিতে গো
কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণ নাম।। ধু।।
হাতে বাঁশি মাথে চূড়া কটি তটে পীত ধড়া–
মনোচোরা হয় শ্যামরায়।
হায় কৃষ্ণ (২) বলে পরাণ যায় আমার দেহ ছেড়ে
আমার মরণকালে দেখাইও শ্যাম।
যমুনার কিনারে নিয়ে গঙ্গ জল মৃত্তিকা দিয়ে
আমার অঙ্গে লিখিও কৃষ্ণনাম।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
আমি পরকালে পাই যেন কৃষ্ণনাম।
(শর্মা, ২০১৯ : ৪)

অন্যদিকে, হাসন রাজার গানের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখতে পাই সুফিতত্ত্বের নিগূঢ় সত্ত্বা। যেখানে মারফতি সাধনায় তিনি সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলেমিশে একাকার। আত্মার সঙ্গে আল্লাহর নূরের ঝলকের স্পর্শ অনুভব করে ফানা হয়ে যাচ্ছেন নিমেষেই। আর তখনই অচেতন মনে হাসন রাজা গেয়ে উঠছেন :

দেখিয়া নূরি অঙ্গ, আর দেখিয়া ঝলমল রঙ্গ
হাসন রাজা পাগল হইয়া, লইল রে তোমার সঙ্গ

(রাজা, ২০০৯ : ২১১)

মানবদেহে অর্থাৎ জীবাত্মার ভেতরেই পরমাত্মার বাস। হাসন রাজা তাঁর সংগীতের ভেতর দিয়ে পরমাত্মা রহস্যের সন্ধান ব্যক্ত করেছে। তার গানের বিষয় হলো আল্লাহর প্রেম ও সেই প্রেমে প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। হাসন রাজার জীবন ছিল মরমি ভাবধারার গার্হস্থ্যধর্মকে এড়িয়ে বৈরাগী বা ব্রহ্মচারী হয়ে সাধু সন্ন্যাসীর জীবন তিনি গ্রহণ করেননি। বরং তিনি সংসার ধর্মের ভেতরে বাস করেই পরমাত্মাকে (প্রাণবন্ধু) পাবার, তাঁর নুরের সাথে মিশে যাওার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। বাইন মাছ যেমন কাদায় বাস করলে নিজের গায়ে কাদা লাগায় না, হাঁস যেমন জলে বাস করেও গায়ে জলের ফোটা রাখে না, হাসন রাজাও তেমনি সংসারের ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে, ভোগবিলাসের বাসনা কামনা থেকে নিজের মনকে মুক্ত রেখেছেন। কঠিন দুশ্চর এই সাধনা অতন্দ্র প্রহরীর মতো এই নির্লিপ্ত, এই নিরাসক্তির সাধনাকে তিনি যে অন্তরে সদা জাগ্রত রাখতে চেষ্টারত ছিলেন তারই নিদর্শন রয়েছে তাঁর গানে :

লোকে বলে বলেরে ঘর-বাড়ি ভালা না আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরই মাঝার।
ভালা করি ঘর বানাইয়া, কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি, পাকনা চুল আমার।
এই ভাবিয়া হাসন রাজায় ঘর-দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়, তার লাগিয়া কান্দে
জানত যদি হাসন রাজায় বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান-কোঠা করিয়া রঙিন

(আহমেদ, ২০১৯ : ২৮৩)

সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে হাসন রাজা তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েননি। জমিদার হয়েও হাসন ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন নিঃসঙ্গতারসের রসিক। ভাব সাগরে ডুবে তিনি মুক্ত আহরণে নিজেকে

নিয়োজিত রাখলেন। তিনি আসমান জমিন খুঁজে যে মহান রবকে পাননি, আত্মাঅনুসন্ধানে তিনি সেই মহান রবকে তাঁর নিজের অন্তরেই আবিষ্কার করলেন। হাসন রাজা অনুধাবন করলেন মহান আল্লাহ বড়ো সাধ করে আপন প্রেমের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে স্বীয় জাত সত্তা থেকে নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করেছেন। আর সেই জ্যোতির্ময় নূরই হলো এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব সৃষ্টির মহান সুরত ও স্বভাব গুণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশস্থল।

৫.১.২ গীতিকবিতার আঙ্গিক ও সুর

আধার, আধেয় এবং সুরের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে অনন্য শিল্প কবিতা এবং গীতিকবিতা। মানুষের চিন্তা, কল্পনা, আবেগ, আসক্তি, অনুভূতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গীতিকবিতা বৈচিত্র্যপূর্ণরূপে নির্মিত হয়, তেমনি নানা উপাদানে অনবদ্যভাবে সজ্জিত হয় গীতিকবিতার বাহ্যিক অবয়ব। গীতিকবিতার এই বাহ্যিক কাঠামোকে আমরা বলছি আঙ্গিক (From)। ধারণা করা যায় কবিতা বা গীতিকবিতার জন্মলগ্ন থেকেই বিষয়বস্তুর সাথে আঙ্গিক প্রসঙ্গটি সমান গুরুত্ব পেয়েছে। কালের প্রবাহে সমকালীনতাকে ধারণ করতে গিয়ে গীতিকবিতার বিষয়বস্তুতে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি কাঠামোতেও এসেছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। সাহিত্যে কবিতাকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় : মন্ময় কবিতা ও তন্ময় কবিতা।

মন্ময় কবিতা : কবি যখন ব্যক্তিগত আবেগানুভূতি, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধকে শিল্প উপকরণরূপে গ্রহণ করে এর অনন্য প্রকাশ ঘটান, তখন তা মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতারূপে পরিগণিত হয় (চৌধুরী, ২০০৮ : ১০২)। মন্ময় কবিতার নানা বিভাজন হলো : ভক্তিমূলক, স্বদেশ-প্রীতিমূলক, চিন্তামূলক, প্রেমমূলক, শোলকমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক, সনেট, লঘুবৈঠকী, স্তোত্র কবিতা।

তন্ময় কবিতা : যে কবিতায় কবি নৈর্ব্যক্তিকভাবে কল্পিত ঘটনাবলি বা চরিত্র, কিংবা বস্তুজগতের যাথাযথ পরিস্ফুটন ঘটান, তখন তাকে তন্ময় কবিতা বা বস্তুনিষ্ট কবিতা বলে (চৌধুরী, ২০০৮ : ১০২) তন্ময় কবিতা নানাভাবে বিভক্ত যেমন–গাথা, মহাকাব্য, নীতি কবিতা, রূপক, ব্যঙ্গ কবিতা, লিপি কবিতা।

মন্ময় কবিতায় কবির ব্যক্তিগত নিবিড় অনুভূতির প্রাধান্য এবং তন্ময় কবিতায় বস্তুসত্তার আধিপত্য লক্ষ করা যায় (দাস, ২০০৩ : ৪২)। এই মন্ময় কবিতার অপর নামই গীতিকবিতা। ইংরেজি Lyric শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা গীতিকবিতার প্রচলন। গীতিকবিতা মোটামুটি ছোট কবিতা যা কাহিনি বা গল্প বর্ণনা করে না, যার মধ্যে একজন মানুষের মনের ভাব, অনুভূতি বা চিন্তাধারার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটে (চৌধুরী, ২০০৮ : ৮৮)। গীতিকবিতার পরিসর নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন "গীতিকবিতায় একটিমাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টলমল করিয়া ওঠে (ঠাকুর, ২০১১ : ৪৪৮)। যে কবিতায় গীত এবং কাব্যের উদ্দেশ্য

অভিন্ন এবং বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতমাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য বলা যায় (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৮০ : ১৮৭)। সুনির্দিষ্ট আবেগানুভূতি বা চিন্তা, কিংবা অবস্থার শৈল্পিক প্রকাশ হচ্ছে গীতিকবিতা। আন্তরিকতাকে বলা হয়ে থাকে গীতিকবিতার প্রাণ। আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতি অবয়বে কৃশতা, সংগীত মাধুর্য এবং গতি স্বচ্ছন্দ– এই কটি অনুসঙ্গ গীতিকবিতার পূর্ণতায় প্রত্যাশা করা হয়।

রাধারমণ ও হাসন রাজার জীবন ইতিহাস পাঠ করলে খুব সহজেই বোঝা যায় তাঁরা লোককবি ছিলেন। সহজিয়া বৈষ্ণবানুসারী রাধারমণ এবং সুফি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হাসন রাজা দুইজনই সহজ সরলভাবে নিজেস্ব ভাষায় তাঁদের দর্শন প্রকাশ করেছেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রাধারমণ গান রচনা করতেন এবং নিজেই শিশ্যকুলের সামনে গাইতেন সেই গান। বৈষ্ণবীয় প্রেম ফুটে উঠত তার গানের সুরে। যেমন :

শ্যাম নাগাল পাইলে বন্ধন করি ভাসব যমুনায়
ললিতা বিশখা সখী আয়গো তোরা আয় যমুনার
ঘাটে গিয়া হাতের কলসী ভূসে থৈয়া
নিরখির শ্যামরূপে তার দিকে তাকাইয়া
বাঁশির সুরে প্রাণ বিদরে রইতে নারি ঘরে
কুলবধূর কুল মজাইল শ্যামের বাঁশির টানে
যারে দংশে শ্যামের বাঁশি নাহি বাঁচে জান
ভাইবে রাধারমণ বলে আয়গো সখী আয়
ধরতে গেলে পাইনা নাগাল সে কোন দেশে যায় ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ৭০)

আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে গীতি কবিতায়। রাধারমণ ও হাসন রাজার গীতিকবিতায় হৃদয় নিংড়ানে দরদের প্রকাশ ঘটে এভাবে :

বাঁশির ধ্বনি কর্ণে শুনি গৃহে রইতে পারি না আর
মধুর মধুর মধুর ধ্বনি মধুর মধুর যায় শুনা
শোনো নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশি রাধার নামটি কল্পনা
সখীগণ করে মন মানা সহে না আর যাতনা
মনে লয় সখী সই তেয়াগিব গৃহ
আমি যাইতে নারি যাইতে নারি বিষম হইল যন্ত্রণা

ভাইবে রাধারমণ বলে পাইলে চরণ ছাড়ব না
সেই চরণে হইতাম দাসী মনে ছিল বাসনা।

(শর্মা, ২০১৯ : ২৬৮)

সোনা বন্ধের লাগি মনে আমার কি করে গো।
ছটফট ছটফট ছটফট করে ধৈর্য্য নাই ধরে গো।
বঞ্চিতে না পারি ঘরে।
মনে আমার কি যে করে।
দিনে রাইতে তার লাগিয়া মন প্রাণ জ্বলে গো।
হাছন রাজা বন্ধের
লাগিয়া নাচে, আছে ধোলাইয়া।
করিয়া কেবল পিউয়া পিউয়া ধড়ফড় ধড়ফড় করে গো।

(রাজা, ২০০৯ : ৪৪১)

কথা ও সুরের সমন্বয়ে তৈরি হয় গীতিকবিতা। একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশে গীতের ইন্দ্রজাল সমন্বিত হয়ে যে সুরকাব্য তৈরি হয়, রাধারমণ ও হাসন রাজার উপর্যুক্ত পদসমূহে তা সুস্পষ্ট। সংগীতের মাধুর্য নিয়ে বিকশিত গীতিকবিতায় গতির স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশিত হয়েছে লোকছন্দ ও অন্যান্য ছন্দের নিপুন প্রয়োগে। রাধারমণ ও হাসন রাজার পদ উপর্যুক্ত লক্ষণ ও গুণাগুণকে ধারণ করে শিল্পরূপ লাভ করেছে। যার ফলে নিশ্চিতভাবেই এই লোককবিদ্বয়ের কবিতা গীতিকবিতা হয়ে ওঠে। ভক্তি, প্রেম বা আত্মনিবেদনের আকুতি, কিংবা সমপর্ণের একনিষ্ঠতাকে ধারণ করা এই দুই কবির গান ভক্তিমূলক গীতিকবিতার শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

এই দুই লোককবির গীতিকবিতায় অন্তর্নিহিত দর্শন যেমন গভীর, তেমনি সুরের রয়েছে এক অপার মাধুর্য ও মানবিক আকুতি। এই সুরের ভূবনে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় তারা শুধু গানের স্রষ্টা নয়, বরং আত্মার আরাধনাকারী সুরতীর্থের যাত্রী।

রাধারমণের গানের সুরে সাধারণত ধামাইল, ভাটিয়ালি, কীর্তন ও বিভিন্ন রাগরাগীনির পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে তাঁর গানের সুরে নদীর স্রোতের মতো এক অনবদ্য প্রবাহ থাকে, যা হৃদয়ে প্রশান্তির আবেশ ছড়িয়ে দেয়। লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস, বৈষ্ণব ভক্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে তাঁর সুর যেন শ্রোতাকে টেনে নেয় আত্মিক জিজ্ঞাসার জগতে। রাধারমণ তাঁর গানে যে সুর ব্যবহার করেছেন তা মূলত সহজ সরল,

কিন্তু তাতে লুকিয়ে থাকে এক অন্তর্নিহিত বেদনাবোধ, যা আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের সুরেলা মিশ্রণে গঠিত। তাঁর গানের সুর শ্রোতার মনে তন্ময়তা আনে এবং গানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, হাসন রাজার গানের সুরে রয়েছে এক অদ্ভুত আকর্ষণ, যা একাধারে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক। হাসন রাজার গান গ্রামবাংলার বিচিত্র সুর ও ধুয়োরীতির মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হলেও তাতে রয়েছে আত্মানুসন্ধান ও মরমিয়া ভাবের এক নিগূঢ় সুরসৌরভ। হাসন রাজার গানের সুর অনেকটা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মতো; তাঁর সুর কেবল বাহ্যিক আনন্দ নয়, বরং অন্তর্গত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার এক গভীর যাত্রা। তাঁর গানে ব্যবহৃত সুর কখনো বিচ্ছেদী, কখনো উদ্দীপক (ফানা) যা সুফিতত্ত্বের ভেতরে আত্মার দোলন তুলে দেয়। রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বাণী ও সুর মূলত মৌখিক ধারায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে এসেছে। এতে কখনো কখনো শাস্ত্রীয় সুরের ছোঁয়া থাকলেও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হৃদয়গ্রাহীতা ও আবেগপ্রবণতা। এই সুরের গঠনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের নিজস্ব গায়কীর ধরন ও অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত করেছেন। যে কারণে রাধারমণের গান শুনলে যেমন শ্রোতার মনে এক আত্মিক শান্তি মেলে, তেমনি হাসন রাজার গানের সুর শুনলে মনে হয় জীবাত্মা পরমপ্রেমাস্পদে লীন হচ্ছে।

এই দুই সাধকের গান বাংলার লোকসংগীতকে যে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে তার মূল ভিত্তিই সুরের এই আধ্যাত্মিক ভাষা। তারা সুরকে শুধু সংগীতের বাহন হিসেবে নয়, আত্মপ্রকাশ ও দেহতত্ত্ব উপলব্ধির অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং বলা যায়, রাধারমণ ও হাসন রাজা তাঁদের গানের সুর শুধু সংগীত নয়, এক পরম উপলব্ধির দ্যুতি।

৫.১.৩ ছন্দ ও অলংকারে প্রকৃতি

গীতিকবিতা এক অনন্য শিল্পভাষা যা হৃদয়ে গভীরতম অনুভূতি ও চিন্তাধারাকে রূপ দেয় সুর, শব্দ ও চিত্ররূপের মধ্যদিয়ে। গদ্যের তুলনায় গীতিকবিতার ভাষা অনেক বেশি ঘন, সংকেতময় ও সুষমায় ভরা। এই ঘনত্ব এবং সৌন্দর্যের প্রধান দুই রূপকাঠামো হলো– ছন্দ ও অলংকার। গীতিকবিতার শৈল্পিক গঠন ও গুণগত উৎকর্ষতা বিচার করতে গেলে এই দুইটি উপাদানকে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। ছন্দ গীতিকবিতাকে দেয় প্রাণ ছন্দময় গতি। আর অলংকার তাকে করে তোলে রূপময় ও ব্যঞ্জনাবহ। ছন্দ বলতে বোঝায় একটি সুনির্দিষ্ট তাল বা ছক, যার মধ্য দিয়ে গীতিকবিতার শব্দগুলো বয়ে চলে এক সংগীতময় গতিতে। এটি শুধু গীতিকবিতাকে পরিবেশনযোগ্য করে তোলে না, বরং শ্রুতিমাধুর্যের একটি ভিত্তি গড়ে দেয়। বাংলা কবিতা

এবং গীতিকবিতা ছন্দ প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে : মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ধ্বনির দৈর্ঘ্য বা মাত্রা অনুসারে পঙ্‌ক্তির ছন্দ নির্মিত হয়। যেখানে প্রতিটি ধ্বনি একটি মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়। অপর দিকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতিটি শব্দে ব্যবহৃত অক্ষরের সংখ্যা নির্ধারিত থাকে এবং তা অনুসারেই পঙ্‌ক্তির গঠন হয়। বাংলা গীতিকবিতার বা কবিতার ইতিহাসে এই দুই ধরনের ছন্দ ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য ও কুশলতা দেখা যায়, তা নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার ছন্দতাত্ত্বিক সমৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে।

অন্যদিকে, অলংকার হলো গীতিকবিতার রূপশৈলির প্রতীক। এটি শব্দ ও ভারের শৈল্পিক ব্যঞ্জনা বৃদ্ধির একটি কৌশল। গীতিকবিতায় অলংকার থাকলে তা পাঠকের মনে সজীব চিত্র ও গভীর অনুভব সৃষ্টি করে। অলঙ্কার মূলত দুইভাগে বিভক্ত : শব্দ অলংকার ও অর্থ অলংকার। শব্দ অলংকারে ধ্বনিগত সৌন্দর্য যেমন অনুপ্রাস বা একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ব্যবহৃত হয়, যা গীতিকবিতার সংগীতধর্মিতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। অর্থ অলংকারে ভারের গভীরতা, কল্পনার বিস্তার এবং চিত্ররূপেই দ্যুতি স্পষ্ট হয়। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধাভাস প্রভৃতি অর্থ অলংকার গীতিকবিতার ভাষাকে কেবল নয়, বরং তার ভাবনাকেও করে তোলে বহুমাত্রিক ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ।

গীতিকবিতায় ছন্দ ও অলংকারের সম্পর্ক অনেকটা শরীর ও অলংকারের মতো। ছন্দ হলো গীতিকবিতার কঙ্কাল ও দেহের গঠন নির্মাণ করে; আর অলংকার সেই দেহকে করে তোলে সৌন্দর্যমণ্ডিত। কাব্যিক অনুভবের গভীরতা যত বেশি অলংকারের উপস্থিতিও তত সুনিপুন। তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে অলংকার কখনোই বাহুল্য বা অপ্রয়োজনীয় সাজসজ্জা নয়; বরং এটি কবিতার ভাবের সঙ্গেই মিশে গিয়ে অর্থবোধক হয়ে ওঠে।

রাধারমণ ও হাসন রাজার গীতিকবিতা লোকজ ঐতিহ্যর ধারায় আবদ্ধ হলেও ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের যথাযথ ব্যবহার তাঁদের রচনাকে দিয়েছে শিল্পগুণ ও কাব্যিক সৌন্দর্য। এই দুই লোককবির রচনা যেহেতু গান হিসেবে রচিত ও গীত, তাই এ সকল গীতিকবিতায় তাল ও লয়ের সৌন্দর্য অনেক বেশি স্পষ্ট।

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, স্বরবৃত্ত ছন্দসহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাদের গানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার তুলে ধরা হলো। পূর্বেই উল্লেখ করেছি মাত্রবৃত্ত ছন্দে ধ্বনির দৈর্ঘ্য বা মাত্রা অনুসারে পঙ্‌ক্তির ছন্দ নির্মিত হয়, যেখানে প্রতিটি ধ্বনি একটি মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন :

অতি সাধের ঘর ভাঙিয়া নিল এক দিনের তুফানে
এগো ভক্তিভাবে লাগাও পালা যে কোন সন্ধানে
(বাগচী, ২০১৩ : ৪২)

কিসের ভাবনা ভাব হাসন দিন তো গেলো গইয়া
কি ভাবিয়া বসিয়াছো কার পানে আছ চাইয়া
(রাজা, ২০০৯ : ১৭৬)

রাধারমণ ও হাসন রাজার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের গানগুলোর সুর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাটিয়ালি সুর দ্বারা প্রভাবিত, কেননা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত গানগুলো ধীর ও স্থীর লয়ের।

এবারে রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে স্বরবৃত্ত ছন্দের উপস্থিতি তুলে ধরব। স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেন, "স্বরবৃত্ত ছন্দে মূলপর্ব শুধু চারমাত্রার হয়। একে দলবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ কিংবা ছড়ার ছন্দ বলা হয়ে থাকে। বাংলা লোকসাহিত্য প্রাচীনকাল থেকে এই ছন্দে রচিত হয়ে আসছে। ছড়া, ঘুমপাড়ানি গান, ব্রতকথা, গ্রাম্যসংগীত, কবিগান প্রভৃতিতে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রচলন দেখা যায়। এই ছন্দে সকল প্রকার অক্ষর একমাত্রা (রায় ১৯৯৩ : ৫৭)। রাধারমণ রচিত ধামাইল ও জলভরা পর্বের গানগুলোতে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রভাব লক্ষণীয়। হাসন রাজার ক্ষেত্রে ফানাফিল্লা পর্যায়ের গানে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। হাসন রাজার ক্ষেত্রে ফানাফিল্লা পর্যায়ের গানে স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

কীরূপ হেরিনু পরাণসই
সাধ করে তারে হৃদয়ে থুই ॥
রূপের চটকে উন্মাদিনী হই
গৃহেতে পাগলী কেমনে রই ॥
সেরূপ সজনী পাব গো কই
রূপের কারণে কলঙ্কী হই ॥
শ্রীরাধারমণ আমার বই
শ্যাম রূপের তুলনা কই ॥
(বাগচী, ২০১৩ : ১৭৭)

একইভাবে হাসন রাজার ফান্নাফিলা পর্যায়ে গানে পাই :

প্রেমের আগুন লাগল রে, হাছন রাজার অঙ্গে।
নিভে না আগুন, ডুবলে সুরমা গাঙ্গে।।
ধা ধা করি জ্বলছে আগুন, কিসে কি করেঙ্গে।

আনিয়া দে গো প্রাণের বন্ধুরে গলেতে ধরেঙ্গে।
হাছন রাজা বন্ধু বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে।
বন্ধুর আশায় নাচে হাছন, প্রেমেরই তরঙ্গে।।
হাছন রাজায় বলে আমি, যাইমু বন্ধের সঙ্গে।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া মিশব তার রঙ্গে।।

(রাজা, ২০০৯ : ২৩২)

রাধারমণের বেশ কিছু গানে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রভাব রয়েছে। যেমন :

নয়নে লাগল রূপ হানল পরানে
পাসরা না যায় রূপ শয়নে স্বপনে

(দত্ত, ২০০২ : ১৭৫)

যমুনা পুলিনে নাগর ত্রিভঙ্গ
মুরালী মধুর স্বরে মোহিল আনঙ্গ

(দত্ত, ২০০২ : ১৭৮)

গীতি কবিতায় রাধারমণ ও হাসন রাজা ছন্দ নৈপুন্যতার পাশাপাশি অলংকার নির্মাণেও তারা রেখেছেন অসামান্য প্রতিভার সাক্ষর। রাধারমণ ও হাসন রাজার গান থেকে কয়েকটি অলংকারে উদাহরণ দেয়া হলো:

ক. অনুপ্রাস :

মধুর মধুর অতি সুমধুর মোহন মুরলী বাজে

(দত্ত, ২০০২ : ৩৬৬)

কি হইল মম প্রেম জ্বালা জ্বলে জ্বলে জ্বলে।
অন্তরে বাহিরে জ্বলে কলে কলে কলে

(রাজা, ২০০৯ : ১৭৮)

হরিগুণাগুণ কৃষ্ণগুণাগুণ রাধাগুণাগুণ গাও হে
সদাই আনন্দ রাইখো মনে

(দত্ত, ২০০২ : ৫০)

খ) যমক :

দয়ালরে দয়াল বলে সয়াল সংসার
দয়ালের না থাকলে দয়া দয়াল নাম অসার

(দত্ত, ২০০২ : ৪২)

৫.১.৪ ভনিতার ব্যবহার

ভনিতা বাংলা গীতিকবিতার একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক অলংকারিক রীতি, যার মাধ্যমে কবি বা গীতিকারের নাম, আত্মপরিচয় কিংবা দর্শন মূল গানের অংশ হিসেবে যুক্ত হয়। এটি কেবল নাম ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত হয় না; বরং ভনিতার মধ্য দিয়ে কবি আত্মজিজ্ঞাসা, বিনয়, বোধ এবং নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করে তোলেন। বাংলা লোকসাহিত্যের দুই মহান সাধক কবি রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা তাঁদের গানে ভনিতার যে সুষম, সাবলীল এবং ভাবানুগ ব্যবহার করেছেন, তা বাংলা গীতিকাব্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তবে এই ভনিতার ঐতিহাসিক শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত। ভনিতার উৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে দৃষ্টিপাত করতে হয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিকে। সংস্কৃত সাহিত্যে ভণিত বা কবির উক্তির রেওয়াজ থাকলেও তা ছিল মূলত রচনার বাইরে বা গ্রন্থসূচকের অংশ। বাংলা সাহিত্যে ভনিতা প্রথম গঠনমূলকভাবে দেখা যায় মধ্যযুগে, বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলিতে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জয়দেব প্রমুখ কবিগণ তাঁদের রচনার শেষে নিজের নাম জুড়ে দিতেন–কখনো দাসত্বের ভঙ্গিতে, কখনো ভক্তির অনুরণনে। এই রীতির মধ্য দিয়েই কবি কেবল নিজের উপস্থিতি জানান দেন না, তাঁর ঈশ্বর-ভাবনা ও জীবনবোধও প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে এই রীতি ছড়িয়ে পড়ে সুফি-মরমি সাহিত্যে, বাউল ও মারফতি গানে।

এই ধারাবাহিকতায় রাধারমণ দত্ত ভনিতাকে তাঁর গানে সুচারুভাবে ব্যবহার করেন। রাধারমণের গানের মূল সুর হচ্ছে বৈষ্ণব প্রেম–রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্য দিয়ে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনপ্রয়াস। তাঁর গানে ভনিতা কখনো 'রাধারমণ কয়', কখনো 'রাধারমণ বলেরে ভাই', 'ভাইবে রাধারমণ বলে', 'শ্রী রাধারমণ বলে' এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে, মনে হয় এটি গানের স্বাভাবিকই অংশ। এই ভনিতায় শুধু কবির নাম নয়, রয়েছে ভক্তির নিবেদন, ভাবপ্রকাশের গভীরতা এবং দার্শনিক উপলব্ধি।

অন্যদিকে, হাসন রাজার গানে ভনিতা গ্রহণ করেছে এক অন্য মাত্রা। তিনি ছিলেন সুফি ধারার মানুষ, তাঁর চিন্তায় ছিল দেহতত্ত্ব, আত্মোপলব্ধি ও মানবধর্মের গভীর দার্শনিকতা। তাঁর গানের ভনিতাগুলো কখনো আত্মসমালোচনামূলক, কখনো আত্মপ্রশ্নমূলক, কখনো বা আধ্যাত্মিক আহ্বানস্বরূপ। যেমন তিনি বলেন–'হাসন বলে' কিংবা 'হাসন রাজা কয়', 'হাসন জানে কয়', 'উন্মাদ হাসন বলে'। এই ভনিতাগুলো শুধুই পরিচয় নয়, বরং গানের মূল দর্শনের স্বরূপ উন্মোচন করে। হাসনের ভনিতা একান্তভাবেই গানের ভাষ্য, যা শ্রোতাকে তাঁর উপলব্ধির দরজায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে ভনিতা কখনো বাহুল্য নয়, কখনো কৃত্রিম নয়। বরং ভনিতা এখানে আত্মপ্রকাশ ও উপলব্ধির সংক্ষিপ্ত অথচ গূঢ় পংক্তি। এটি গানের ভাব ও সুরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, ভনিতা ছাড়া গানটি অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়। এই দুই সাধকের গানে ভনিতা হয়ে উঠেছে এক দার্শনিক মন্তব্য–যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁদের আত্মপরিচয়, ধর্মতত্ত্ব এবং মানবিক বোধ। সুতরাং, ভনিতা বাংলার লোকগীতিকে শুধু সমৃদ্ধ করেনি, বরং কবি ও গানকে একীভূত করে তুলেছে। রাধারমণ ও হাসন রাজা এই ঐতিহ্যকে গভীর জীবনবোধের সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন বলেই তাঁদের গান আজও শ্রোতার মনে দাগ কাটে, আর ভনিতা হয় আত্মার প্রতিধ্বনি।

৫.১.৫ প্রেমের ধরন

বাংলা লোকসংগীতের জগতে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা দুই মহিমান্বিত সাধকসত্তা। তাঁদের গান যেন ধর্ম, দর্শন ও প্রেমের এক চিরন্তন সংগীতধারা। যদিও উভয়ের সাধনার পথ আলাদা–রাধারমণ বৈষ্ণব ভক্তি ও প্রেমধারায়, আর হাসন রাজা সুফি ও মারেফতি প্রেমে অনুপ্রাণিত–তবুও তাঁদের গানে রয়েছে এক গভীর আত্মিক মিল। এই মিল মূলত মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক অদ্ভুত রসায়ন, যেখানে ঈশ্বর কখনো প্রেমিক, কখনো প্রভু, কখনো আপনজন।

রাধারমণ দত্তের গান ভক্তি ও বৈষ্ণব প্রেমের এক অনন্য রূপ। তাঁর গানে প্রেমিক ও প্রেমিকার রূপে কৃষ্ণ ও রাধার মিলন-বিরহ, পার্থিব আবেগ আর অতীন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষার এক অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়। এখানে ঈশ্বর কেবল পূজ্য নন, তিনি প্রেমাস্পদ, জীবনের সব অনুভূতির সঙ্গে যিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। রাধারমণ বিশ্বাস করতেন, কৃষ্ণকে পাওয়া যায় হৃদয়ের প্রেমময় অনুভবের মাধ্যমে, ভক্তির দ্বারা। তাঁর গানে ঈশ্বরের সঙ্গে মেলাবার জন্য প্রেম, নিবেদন, আকুলতা ও এক ধরনের রসময় দেহতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যেমন, অনেক গানেই তিনি কৃষ্ণকে প্রিয়জনের মতো ডেকে বলেন- 'কালো রূপ দেখিবার লাগি হৃদয় ফাটিয়া যায়, তারে আনি দেখাও গো আমায়' (দাস, ২০১২ : ২৫) যেখানে ঈশ্বর একান্ত আপন, ব্যক্তিগত, মধুর ও ব্যথাময় প্রেমের প্রতিমা।

অন্যদিকে, হাসন রাজার গানে সুফি ও মারফতি ভাবধারা প্রকট। ইসলামি ভাববাদ, বিশেষ করে সুফিবাদের অন্তর্নিহিত দর্শন অনুযায়ী, মানুষ আর স্রষ্টার মধ্যে পর্দা কেবল মায়া, অহং বা জাগতিকতা। এই পর্দা সরিয়ে হৃদয়কে শুদ্ধ করে যদি কেউ প্রেম করতে পারে, তবে সে আল্লাহর আসল রূপ দেখতে পায়। হাসন রাজার গানে সেই আধ্যাত্মিক প্রেমের তৃষ্ণা, সেই 'আশিক' হয়ে 'মাশুক'-এর সন্ধান করার আর্তি। ঈশ্বর এখানে

আল্লাহ, তবে তিনি রূপহীন, নিরাকার- অথচ তিনি প্রেমের মাধ্যমে ধরা দেন। হাসনের গানে এই প্রেম কখনো পার্থিব রমণীর প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে, আবার কখনো সরাসরি আত্মিক ও দার্শনিক রূপে ফুটে ওঠে।

হাসনের গানেও বিরহ আছে, তবে তা সংসার ত্যাগের বিরহ নয়, বরং এক অদেখা, অজানা প্রভুর কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা। তিনি বলেন, "লোকে বলে বলেরে, ঘর বাড়ি ভালা না আমার"- যেখানে 'ঘর' মানে সংসার নয়, বরং দেহঘর, ইহজাগতিক আসক্তি। তিনি দেহ, মন, আত্মা-সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে এক অনন্ত প্রেমের সন্ধানে মগ্ন। এখানেই হাসনের গানের দর্শন সুফিবাদের মারফত দর্শনের সঙ্গে মিশে যায়।

রাধারমণ এবং হাসন রাজা- উভয়ের প্রেমই ঈশ্বরকেন্দ্রিক, কিন্তু তাদের উপলব্ধির ভাষা আলাদা। রাধারমণের প্রেম দৃশ্যমান রাধা-কৃষ্ণের প্রেমরস, যেখানে ঈশ্বর মানবিক অনুভবে ধরা দেন। সেখানে হাসনের প্রেম রূপহীন, নিরাকৃতি, দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসার পথ ধরে চলে। রাধারমণ ঈশ্বরকে 'প্রেমিক' মনে করে কাছে টানেন, হাসন রাজা ঈশ্বরকে 'মাশুক' ভেবে অন্তরের আকাশে অনুভব করেন।

তবে উভয়ের প্রেমেই রয়েছে এক গভীর ব্যাকুলতা, এক তীব্র আকর্ষণ, যা মানুষকে আপন অহং থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথে নিয়ে যায়। এই প্রেম ব্যক্তিগত, আন্তরিক, গভীর ও পরম সত্যের অনুসন্ধানে উন্মুখ। এইভাবেই রাধারমণ ও হাসন রাজা– দুই ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাধক হলেও, তাঁদের প্রেমের সাধনা এক সর্বজনীন আত্মার অভিমুখে গিয়েছে। তাঁদের গান শুধুই গান নয়– তা একাধারে প্রেম, ভক্তি ও মুক্তির দর্শন। নিম্নে রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে প্রেম দর্শনের উদাহরণ দেওয়া হলো :

সদায় পিঞ্জরে বসে রাধাকৃষ্ণ ভাবো না।
যেই নাম তুমি বল আমি শুনি, আমি বলি নাম তুমি শুন না॥
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে, আটাইশ অক্ষর দেও না ছেড়ে।
রাধাকৃষ্ণ নাম চাইর অক্ষরে, সাধু জপে নাম অন্যে জানে না।
সেই হরি নাম নিতে জীবে, আনন্দ বাড়িবে চিতে।
মনের কৈতব জ্বালা যাবে দূরে নিরানন্দের গন্ধ দেহায় রবে না।
ভেইবে রাধারমণ বলে, মানব জনম যায় বিফলে
আমার মনের আশা রইল মনে, মন মিলে, মনের মানুষ মিলে না ॥

(বাগচী, ২০১৩ : ১০৮)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আমি দেখি।
আল্লাহ্ দেখিয়া হাছন রাজা সুখী।।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আমি দেখি।
আচানক' সুন্দর আল্লাহ্ কেমনে আমি লেখি
লেখিতে না পারিয়া দিলের মাঝে রাখি।।
চাইয়া থাকি নিরবধি ফিরাই নারে আঁখি।
হাছন রাজা চৌধুরী গেছে আল্লাহ্র প্রেমে ঠেকি।
আমার আল্লাহ্ আমারে যে দেয় নারে লুকি
বিচার করিয়া দেখি দুই নয়নে একি।।
দুই নয়রে দুই নয়রে জ্ঞান চক্ষে দেখি।
বিচার করিয়া দেখি আল্লাহ্ আমি একি।।

(রাজা, ২০০৯ : ৩৩৪)

৫.২ বৈষ্ণবতত্ত্ব ও সুফিতত্ত্বের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় ভাবধারার এক অনন্য স্থান দখল করে আছে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সুফিতত্ত্ব। যদিও এ দুটি তত্ত্ব ভিন্ন ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত, তবুও মানবিকতা, প্রেম, ভক্তি ও অন্তর্জগতের মুক্তির দিকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে অভিন্ন। এই ধর্মতাত্ত্বিক রচনাগুলো শুধু আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন নয়, বরং সমকালীন সমাজব্যবস্থা, বৈষম্য এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদও বটে।

বৈষ্ণবতত্ত্বের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বৈষ্ণব সাহিত্য, বিশেষ করে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিবাদ, সমাজে এক বৃহৎ পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। তখনকার হিন্দু সমাজে জাতপাত, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব ব্যাপক আকারে ছিল। এর বিপরীতে বৈষ্ণবতত্ত্ব জোর দেয়–সবার জন্য ঈশ্বরভক্তি, ভক্তির অধিকার জাত বা বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের। এমনকি নিম্নবর্ণের লোকরাও ভগবানের প্রেমলীলায় অংশ নিতে পারে। মীরাবাঈ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের মতো রাধারমণও সাধারণ মানুষের ভাষায় ভক্তিসাহিত্য রচনা করেছেন, যা সমাজে এক নতুন গণচেতনাকে উস্কে দেয়।

নারীর মর্যাদা ও প্রেম: রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্র করে গঠিত এই সাহিত্য নারীর কামনা, বেদনা ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থানকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছে। যদিও কখনো কখনো এর

রূপকল্প রোমান্টিকতায় ঢেকে গেছে, তবুও তা নারীর আত্মিক চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা রাধারমণের গানে তার প্রমাণ পাই :

মাইয়া সামান্য তো নয়, মাইয়াতে উৎপত্তি সৃষ্টি
মাইয়াতে উৎপত্তি প্রলয় ॥
অনন্তগুণ মাইয়ার কাছে সর্বশক্তিময় ॥
মাইয়া জানেন মহেশ্বরে মাইয়ার চরণ ধরে শিরে।
আরেক মাইয়া হৃদিপরে উলঙ্গ হইয়া রয়।
মাইয়ার কাছে বস্তু আছে সাধনেতে সিদ্ধ হয় ॥
মাইয়ার প্রেমে বান্ধা হরি দাসখতে দস্তখত করি।
সাধলেন মাইয়ার চরণ ধরি সে মাইয়া কে সামান্য কয়।
দেবদানব গন্ধর্ব মানব সে মাইয়ার বশে রয় ॥
স্ত্রীরত্বধন বহু কষ্টে যদি কারো ভাগ্যে ঘটে
মরে ভূতের বেগার খাইটে না পাইয়ে মাইয়ার পরিচয়।
রসিক জানে মাইয়ার মর্ম, রাধারমণ কয় ॥
(বাগচী, ২০১৩ : ৩১২)

প্রতিবাদী সুরঃ চণ্ডীদাস বলেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" এই কথা তখনকার জাতপাতভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে এক সাহসী উচ্চারণ। ঠিক একইভাবে রাধারমণ তাঁর গানে উল্লেখ করেন :

এ মানুষে সেই মানুষ আছে ভেবে দেখো মন
হৃদেরে চক্ষু খুইলে করো তার আকিঞ্চন ॥
(বাগচী, ২০১৩ : ৭৯)

সুফিতত্ত্বের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সুফি সাহিত্য ইসলামি মরমি ধারার প্রকাশ, যার শিকড় গ্রামীণ জীবন, দরিদ্র জনগণ এবং ব্যক্তিগত ঈশ্বরানুসন্ধানের মাঝে। বাংলা সাহিত্যে লালন, ফকির ভানু শাহ, হাছন রাজা প্রমুখের রচনায় এই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। জাত-পাত ও ধর্মীয় ভেদাভেদের বিরোধিতা প্রসঙ্গে লালনের গান বারবার প্রশ্ন তোলে :

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান

জাতি গোত্র নাহি রবে।।

(মাননান, ২০১০ : ১২)

একইভাবে সাধক জালাল খাঁ তাঁর গানে উল্লেখ করেন :

ধর্ম কি জান বিচারে-
যোগী ঋষি মহাজনে, সবাই দেখে সমান করে ॥
করিম-রহিম রাধা-কালী, এ-বোল সে-বোল যতই বলি
শব্দ ভেদে ঠেলাঠেলি হইতেছে সংসারে ॥

(সরকার, ২০১৪ : ৫৫)

সাধক শাহ আবদুল করিম তাঁর সংগীত দর্শনে জাত পাতের ভেদ ঘুচিয়ে মানুষেই খুঁজেছেন অমূল্য রতন :

মানুষ যদি হইতে চাও করো মানুষের ভজনা
সবার উপরে মানুষ সৃষ্টিতে নাই যার তুলনা ॥

(ইমাম, ২০১৩ : ২৫০)

মানুষকে গুরুত্ব দিয়েই বাংলার লোকসাধকেরা তাদের সংগীতের দর্শন প্রচার করেছেন, যেখানে ধর্ম নয়, মানুষই মুখ্য। ধর্মীয় পরিচয় বা জাতি-গোত্র ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই লোকসাধকদের সাহিত্যে এক ধারালো প্রতিবাদ আছে। হাসন রাজার গানেও মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করি :

আমি হি মূল মূলাধার।
যত দেখি সবই দেখি হাছনও রাজার।

(রাজা, ২০০৯ : ৬২৭)

সাম্যবাদী চেতনা: সুফি কবিগণ গানে গানে বলেছেন, ঈশ্বর ধনী-গরিবে ভেদ করেন না। সমাজে ধনীদের যে প্রভাব, তার বিপরীতে তারা দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। একইভাবে হাসন রাজা তাঁর গানের মধ্য দিয়ে ধনী গরিবের ভেদাভেদ ভুলে প্রাণবন্ধুর প্রেমে সকলকে লীন হওয়ার আহ্বান করেছেন।

সাধনার মাধ্যমে মুক্তি: বাহ্যিক আচার নয়, অন্তরের সাধনা বা মারেফতের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান অর্জনই হাসন রাজার গানের মূল লক্ষ্য। এ দর্শন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমতা ও মানবিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গান রচনা করেছেন।

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের বৈষ্ণব ও সুফি সাহিত্যে সমাজের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে, তা একান্তই মানবতাবাদী ও গণমুখী। একদিকে ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত নড়িয়ে দেওয়া, অন্যদিকে সমাজে সমতা, ভালোবাসা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা–এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের সাহিত্যধারাকে চিরন্তন করে রেখেছে। আজও এ সাহিত্য আমাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সামাজিক সমতা ও মানবিক চেতনার পথে আলো দেখায়।

৫.৩ রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

বাংলার লোকসংগীতের জগতে রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা দুই আলাদা ধারার প্রতিভা হলেও, তাঁদের গান একই উৎস থেকে সঞ্চারিত– মানুষের হৃদয়, আত্মার সাধনা ও ঈশ্বর অনুসন্ধানের পথ। একজন বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রেম ও ভক্তির গান রচনা করেছেন, আরেকজন সুফি-মনস্ক হয়ে আত্মার মুক্তি, মরমিয়া ভাব এবং মানবিক বোধকে ছুঁয়ে গেছেন। এই দুই সাধকের গানে ব্যবহৃত লোক-বাদ্যযন্ত্র কেবল সংগীতের ছন্দ নয়, বরং তাদের সাধনার পরিপূরক এক সুরতরঙ্গ – যা গানকে শুধু শোনার জন্য নয়, অনুভব করার এক মাধ্যম করে তোলে।

রাধারমণ দত্তের গান মূলত বৈষ্ণব পদাবলির ধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি তাঁর গানে কৃষ্ণ-রাধার লীলা, বিরহ, প্রেম ও ভক্তিকে কেন্দ্র করে এক গভীর আত্মিক জগৎ নির্মাণ করেছেন। এই জগতের সংগীত-সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে যে বাদ্যযন্ত্রগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একতারা, দোতারা, খমক, খোল ও বাংলা ঢোল। একতারার টানটান টুংটাং সুরে যেমন প্রেমের আকুলতা ধরা পড়ে, তেমনি তা এক ধ্যানমগ্ন চেতনারও জন্ম দেয়। দোতারা, যা একাধিক তারবিশিষ্ট তন্ত্রি যন্ত্র, তাতে সুরে বৈচিত্র্য ও আবেগের ঘনত্ব তৈরি হয়। রাধারমণের গান খুবই আবেগময় ও আধ্যাত্মিক; সেই অনুভূতির সাথে সংগতি রেখে খমকের তাল ও খোলের গভীর ছন্দ গানের ভেতরে প্রবাহ তৈরি করে। খোল, বিশেষ করে কীর্তনের পরিবেশে ব্যবহৃত একধরনের তালবাদ্য, যা রাধারমণের ভজনাত্মক গানগুলোতে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণের আত্মরূপকে সংগীতায়িত করে। রাধারমণের গানে সচেতনভাবে বাঁশি ব্যবহৃত হয়, যা কৃষ্ণের ঐতিহ্যিক প্রতীক এবং গানকে মাধুর্য ও রস দিয়ে পূর্ণ করে তোলে।

রাধারমণের গানগুলো মূলত গ্রামীণ পরিবেশে, বিশেষত বৈষ্ণবী আখড়ায়, বৃন্দাভজন বা নাম-সংকীর্তনের সময় পরিবেশিত হতো। সেখানে এই লোক-বাদ্যযন্ত্রগুলো শুধু সংগত নয়, সাধনার অংশ হয়ে উঠত। একতারার একটানা ধ্বনি যেন ভক্তির অন্তহীন ধারা, আর খোলের ছন্দ সেই ধারাকে ঘিরে তৈরি করে

আধ্যাত্মিক একতাবদ্ধতার আবরণ। রাধারমণের গানে বাদ্যযন্ত্র কখনোই কণ্ঠকে ছাপিয়ে ওঠে না, বরং তার অনুভূতির শিরা-উপশিরায় সুরের রস ঢেলে দিয়ে পুরো পরিবেশনাটিকে একটি সাধনামূলক অভিজ্ঞতায় রূপ দেয়।

অন্যদিকে, হাসন রাজার গান একেবারে ভিন্ন ধাঁচের হলেও, তাতে লোক-বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ ছিল নিপুণ ও পরিমিত। হাসন রাজা একজন জমিদার হয়েও ছিলেন আত্মান্বেষী সুফি মননের মানুষ। তাঁর গানে আত্মার কথা, দেহতত্ত্ব, মায়ার জাল, মুর্শিদের পথনির্দেশ ও পরকালচিন্তা পাওয়া যায়। এই দার্শনিক ও মরমি সুরে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো, সেগুলো গানের ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও আবেগপ্রবণ। হাসনের গানে দোতারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই বাদ্যযন্ত্রের মৃদু কিন্তু গভীর সুর আত্মিক ব্যথা, দেহ ও আত্মার সংঘর্ষ, এবং নিঃসঙ্গতার প্রতিধ্বনি করে। পাশাপাশি দফ, ঢোলক এবং কারতাল ব্যবহৃত হতো ছন্দ ও পরিবেশনার গাম্ভীর্য বজায় রাখতে।

হাসনের গানগুলো অনেকাংশে জারি-সারি গানের প্রভাবে গড়া, যেখানে প্রশ্ন-উত্তর, আহ্বান-সাড়া ধরনের বিন্যাস থাকে। এই বিন্যাসে তাল ও ছন্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর সেজন্য দফ বা ঢোলকের ব্যবহার গানের কাঠামোকে দৃঢ় করে তোলে। দফ সাধারণত হাত দিয়ে বাজানো একধরনের ফ্রেম ড্রাম– যা সুফি ও ফকিরি গানে একধরনের আধ্যাত্মিক ধ্বনি তৈরি করে। এতে গানের ভেতর একটি তন্ময়তা আসে, যা শ্রোতাকে বহির্বিশ্ব থেকে অন্তর্জগতের দিকে আকৃষ্ট করে। কখনো কখনো হারমোনিয়ামও ব্যবহৃত হতো, বিশেষত যখন গানটি দলগতভাবে পরিবেশিত হতো বা সুরে গভীরতা আনার প্রয়োজন পড়ত।

হাসন রাজার গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত ও নিঃশব্দ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। সেখানে বাদ্যযন্ত্রের তীব্রতা নেই, আছে এক ধীরগতি, ভেতরের তাড়না, এবং ঈশ্বরের প্রতি আকুল প্রার্থনার শব্দ। হাসনের গানেও যেমন আত্মা–পরমাত্মার মিলনের কথা রয়েছে, তেমনি আছে সংসার-বিমুখতার অভিজ্ঞান। দোতারার দীর্ঘ-টানা সুর, ঢোলকের মৃদু ছন্দ, দফের প্রতিধ্বনি–সব মিলে তা হয়ে ওঠে এক আত্মাবিশ্রান্ত সংগীতচর্চা।

এই দুই সাধকের গানের মূল ভিত্তি যতই আধ্যাত্মিক হোক না কেন, তাঁদের গান বাংলার মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাঁদের গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলোও সেই মাটির, সেই নদীর, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে জড়িত যা বাংলার লোকসংস্কৃতিকে আজও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। বাদ্যযন্ত্রগুলো কোনো আলংকারিক উপাদান, নয় বরং সাধকের মন-প্রাণের ভাষা। তাই রাধারমণের একতারার প্রতিধ্বনি আর হাসনের দোতারার হাহাকার, দুটোই মিলিয়ে বাংলার লোকসাধনার এক অসাধারণ সংগীতিক মানচিত্র গড়ে তোলে।

৫.৪ রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে ব্যবহৃত তাল

রাধারমণের গান প্রধানত বৈষ্ণব ভক্তির সুরে গাঁথা। তাঁর গানে কৃষ্ণ-রাধার প্রেম, বিরহ ও ভক্তির যে আবেগ প্রকাশ করে, তা মূলত তালের মধ্য দিয়ে একটি সুষম প্রবাহ পায়। তাঁর গানগুলোর তাল সাধারণত সহজ, কিন্তু তা গভীর রসে পরিপূর্ণ। যেমন– দাদরা, কাহারবা, একতাল– এসব তালের ব্যবহারে গানগুলি মাধুর্য পায় এবং শ্রোতাকে সুরের সঙ্গে তালেও নিমগ্ন করে তোলে।

অন্যদিকে, হাসন রাজার গান সুফি মরমিয়া ধারার, যেখানে আত্মিক জিজ্ঞাসা, দেহতত্ত্ব, মৃত্যু ও অনন্ত জীবনের ভাবনা প্রবল। তাঁর গানে তাল ও লয়ের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত চঞ্চল প্রকৃতির। দাদরা, কাহারবা, বা কাওয়ালী তালের মতো সহজ তালের ব্যবহার এখানে গানের ভাবানুগ থাকে। হাসনের গান যেখানে দর্শনচিন্তামূলক, সেখানে তাল এক ধরনের ধ্যানের আবেশ তৈরি করে–যা গান শোনাকে নয়, 'অনুভব'কে মুখ্য করে তোলে।

এই দুই সাধকের গানে তালের প্রয়োগে একটি বড় পার্থক্য হলো–রাধারমণের গান যেখানে তুলনামূলকভাবে ধীরগতিসম্পন্ন, সরল তালের মাধ্যমে ভক্তির আবেগ ছড়িয়ে দেন, সেখানে হাসন রাজার গানে অধিক গতিসম্পন্ন লয়ের ব্যবহার করে তোলে আত্মোপলব্ধির গাম্ভীর্য। তবে উভয়ের গানের তালই গানের ভাব ও অর্থকে সুনিপুণভাবে বয়ে নিয়ে যায়।

৫.৫ সমসাময়িক জনপ্রিয়তা ও পরিবেশনা

বর্তমানে রাধারমণ ও হাসন রাজার গান শুধু গ্রামীণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নেই। শহরের লোকসংগীত প্রেমীদের কাছেও এই গানগুলোর আবেদন বাড়ছে। বিভিন্ন লোকসংগীত উৎসব, টেলিভিশন রিয়েলিটি শো, ইউটিউব চ্যানেল এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এ ধরনের গান পরিবেশিত হচ্ছে নতুন ধারায়। জনপ্রিয় শিল্পীরা এই গানগুলোর আধুনিক সংগীতায়োজন করছেন, যেখানে কখনও কখনও পাশ্চাত্য যন্ত্রের মিশ্রণ দেখা যায়। যেমন, সম্প্রতি Coke Studio Bangla-তে হাসন রাজার "ধরো দিলারাম ধরো দিলারাম আঞ্জা কইরা ধরো, হাসন রাজারে বাইন্ধা রাখো দিলারাম তোর ঘরো" অথবা রাধারমণের "ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে রাধার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া" গানগুলো আজ নতুন প্রজন্মের কণ্ঠে নতুন ঢঙে পরিবেশিত হচ্ছে। এই গানগুলোতে সুর ও কথা অপরিবর্তিত রেখে শুধু বাদ্যযন্ত্র ও উপস্থাপনায় পরিবর্তন এনে শ্রোতাদের কাছে নতুন স্বাদে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

রাধারমণ ও হাসন রাজার গান বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্ব পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈষ্ণব ও মরমিয়া সংগীত নিয়ে গবেষণা চলছে। গবেষকরা এই গানগুলোর দর্শন, ভাষা, ছন্দ ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করছেন। বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকেও নানা সময় এসব গানের সংকলন, গবেষণাগ্রন্থ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এভাবে একাডেমিক চর্চার মাধ্যমে এ গানের গভীরতা ও তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। একইসাথে বিশ্বব্যাপী রাধারমণ ও হাসন রাজার গান প্রচারণার লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। যেমন :

১

ভোমর কইও গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।
ও ভোমররে কইও কইও আরে ভোমর কৃষ্ণরে বুঝাইয়া ॥

ওরে ভোমর রে না খায় অন্ন না খায় জল নাহি বান্দে কেশ
ঘর থেকে বাইর হইলা যেমন পাগলিনীর বেশ ॥

ও ভোমর রে উজান বাঁকে থাকোরে ভোমর
ভাইটাল গাঙে থানা
চোখের দেখা মুখের হাসি কে কইরাছে মানা ॥

ও ভোমর রে ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
নিভিয়া ছিল মনেরই অনল কে দিল জ্বালাইয়া।

(Haroonuzzaman, 2011 : 142)

2

O bumble-bee, go and tell
Estrangement from Krishna burns Radha's body
O my bee
Please make Krishna understand my situation, I beseech you!

O my bee

Tell him she isn't having meal or water;
neither is she braiding her hair
Dressed as a madwoman, she has left home.

O my bee
Up the river's turn, you stay; your home is in downstream
Who has stopped you from seeing me for a moment,
exchange smile?

O my bee
Contemplatively Radharomon says:
"Who has rekindled the dying fire of mental anguish?"
(Haroonuzzaman, 2011 : 143)

৩

আমি তোমায় ডাকি গুরু হে
ডাক দিলে ডাক শুনো না।
সাধন ভজন কিছুই জানি না ॥

গুরু গুরু আমি তোমার অধম ভক্ত
লোহা হতে অধিক শক্ত
আগুন দিলে লোহা গলে
গুরু আমার মন তো গলে না ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে ভবে আইলাম অকারণে
আমার মনের এই বাসনা, গুরু রাঙ্গাচরণ ছাড়ব না ॥
(Haroonuzzaman, 2011 : 44)

4

Guru, I call out
But you don't respond
About meditation and worship
I know nothing.

Dhaka University Institutional Repository

Guru, I am your worthless admirer
Stronger than iron
Iron melts in fire
But my mind doesn't liquefy, Guru.

Radharomon thinks and says:
"Purposeless I have come to this world;
I won't leave the crimson feet of Guru;.
This is what my mind desires."

(Haroonuzzaman, 2011 : 45)

৫

সজনী গো গুরু কি ধন চিনলাম না
অমূল্য ধন গুরুর চরণ ভজন হইল না ॥

বেচলাম জিনিস নগদ বাকী, লইয়া গেল দিয়া ফাঁকি
আর কতদিন বসে থাকি আসল উসল হৈল না ॥

আমার মনেতে মন পাগল, বনে পাগল ময়না
হৃদয় পিঞ্জিরার পাখি সয়ালে বেড়ায় না ॥

কামনদীতে তিনধারা চিনতে পারলাম না
সেই নদী চিনতে পারলে তন্ত্রমন্ত্র লাগে না ॥

শ্রীরাধারমণ বলে আমার ঘাটে যাওয়া হইল না
বেভুলেতে দিন গয়াইলাম গুরুর চরণ ভজলাম না ॥

(Haroonuzzaman, 2011 : 70)

6

O my confidante
I couldn't recognize
What the Guru-wealth is
Invaluable wealth are Guru's feet
I couldn't worship them.

Dhaka University Institutional Repository

In cash, on credit I sold things
He decamped with everything hoodwinking me
How long have I to wait?
Even the principal amount remained unrealized.

In my mind is the sweetheart; in the woods the crazy Moyna
The bird of the heart's cage doesn't wander in the open.

I couldn't recognize the three streams in the river of Kam
No esoteric charms or incantations needed if that is known.

Radharomon laments: "I couldn't reach ashore;
Idled away my days being oblivious,
not worshipping the Guru- feet."

(Haroonuzzaman, 2011 : 71)

৭

আমার বন্ধু দয়াময়, তোমারে দেখিবার মনে লয়
আরে তোমারে না দেখলে রাধার জীবন কেমনে রয় ॥

কদম ডালে বইসারে বন্ধু রঙ্গে ঢঙ্গে আগা
শিশুকালে প্রেম শিখাইয়া যৌবন কালে দাগা ॥

তমাল ডালে বইসারে বন্ধু বাজাও রঙ্গের বাঁশি
সুর শুনিয়া রাধার মন হইল উদাসী ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে মনের কথা কয়
কৃষ্ণ প্রেমে রাধার মন প্রেমানলে দয় ॥

(Haroonuzzaman, 2011 : 130)

৪

O my kind friend, I would like to see you
How can Radha survive without seeing you?

Sitting on the branch of *Kodom* tree,

Dhaka University Institutional Repository

you do all your fun and frolic
Teaching love in childhood, you cheat me during my youth.

O my friend,
You play the funny flute sitting on the dark-colored bough
Listening to the tune, Radha becomes oblivious.
His heart speaks through it, Radharomon contemplates
In Krishna's love, Radha is consumed by burning passion.

(Haroonuzzaman, 2011 : 131)

৯

আসি রবনা রবনা গৃহে বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না
বন্ধু আমার চিকন কালা নয়নে লাইগাছে তালা
বিষম কালা ধইলে ছাড়ে না।

বন্ধু বিনে নাইযে গতি কিবা দিবা কিবা রাতি
জ্বলছে আগুন আর তো নিভে না।
এমন সুন্দর পাখি হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি
ছুটলে পাখি ধরা দেবে না।

হাতে আছে স্বরমধু গৃহে আছে কূলবধূ
কী মধু খাওয়াইল জানি না।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
জ্বলছে আগুন আর তো নেভে না।

(Haroonuzzaman, 2011 : 136)

10

I won't, I won't stay at home; sans friend I'll die
My friend is dazzlingly black; it appears as a delight of the eye
He is terribly black, doesn't leave once caught.

Dhaka University Institutional Repository

No way out without the friend; be it in day or night
Fire burns, doesn't get extinguished ever
Such a wonderful bird it is! I keep it in my heart
Once freed, it won't surrender.

Sweet voice on one hand; chaste bride at home on the other
I don't know what sort of honey I was made to drink
Lovesick I am, Radharomon contemplates
Fire burns; it never gets blown out.

(Haroonuzzaman, 2011 : 137)

১১

ওরে হাসন রাজা মিয়া, প্রেমের বান্ধন বান্ধরে
দিলের জিঞ্জির দিয়া
ছুটিতে না পারে যেন প্রাণবন্ধু প্রিয়া ॥
এমন বান্ধন বান্ধরে তারে দিল দড়াইয়া
এক মনে তার প্রেমেতে যাইও রে মজিয়া ॥
দৃঢ় মনে প্রেম করিও বুঝিয়া সুজিয়া
দিন রাইতে তার পানেতে রইও রে চাহিয়া ॥
তিলে পলে কোনো কালে না থাকিও ভুলিয়া
থাকিও থাকিও হাসন দিল লাগাইয়া ॥
প্রাণবন্ধে লইবে তোরে কোলে উঠাইয়া
দিলের হযরত তোর যাইবে রে মিটিয়া ॥
হাসনজানে বলে তোরে তুর মাঝে থাকিয়া

(কবীর, ২০২১ : ১৩৫-১৩৬)

12

Oh Hason Raja Miya
Bind the love to Him with shackles of your heart
Don't let your Beloved escape.

Dhaka University Institutional Repository

Tie your heart with Him in such a way
That you'll be intoxicated with His love.
Let a strong love in mind stick to Him
Day and night, don't be bewildered looking upon his face.
Don't forget Him for blink of your eye.

He'll take you into His arms
and fulfill the desire of your heart.
The Heart of Hason says:
If you stick to me, you'll find the great pleasure
Hason Raja agrees to it and wishes to marry for ever.

(কবীর, ২০২১ : ১৩৬)

১৩

হাসনরাজা বাউলা মনে সদা আল্লা
আর কিছু মনে আসলে পড়ো নাওজুবিল্লা ॥
হাসনরাজা বাউলা মনে সদায় রাইখো আল্লা
দিলের মাজে সর্বদাই রাখিও ইল্লাহল্লাহ ॥
হাসনরাজা বাউলা মনে সদায় রাখিও
আল্লা আর কিছু মনে আসলে পড় নাওজুবিল্লা ॥
এই মত দিলে রাখলে, কোলে লইবা মউলা
আল্লার জাতে মিশিবায় তুমি, হাসনরাজা উল্লা।

(আহমেদ, ২০১৯ : ৩০১)

14

Hason Raja always harbors Allah in his mind
If anything else comes in mind, read Naojubillah
Hason Raja always remembers Allah

Dhaka University Institutional Repository

Keep in your heart all the time Illahallah.
Hason Raja! Keep in your heart only Allah
And discard if anything comes into your mind.
If you carry on this opinion in your heart,
Mowla will embrace you
Then you'll merge into Allah.

(আহমেদ, ২০১৯ : ৩০১)

১৫

হাসন রাজা মনে, খেলব এবার বন্ধের সনে
পাশা, চৌপর, শতরঞ্জ খেলা, আমার বন্ধে জানে ॥
হাসনরাজা বড়রে রঙ্গী
খেলব খেলা, ছাড়ব না হইয়াছে জঙ্গি
যে হারিবে বিক্রি হইবে, কুলে আর মানে ॥
খেলব এবার বন্ধের সনে ॥
এক চিত্তে হইয়া রাজি, হাসনরাজায় ধরিয়াছে বাজি
সে হারে কী আমি হারি, বুইঝ্যা লইব দানে ॥

(আহমেদ, ২০১৯ : ৩০৩)

16

Hason Raja thinks of playing with his Friend this time
My Friend knows playing dice all the day and chess
Hason Raja will have great fun and not let up on his opponent
He'll sell out honesty, he'll wager his family name
and honour
I'll play this time with my Friend
With full concentration and certainty
Hason Raja places his bet
We'll understand who wins or loses when we see the prizes.

(আহমেদ, ২০১৯ : ৩০৩)

Dhaka University Institutional Repository

১৭

হাসনরাজা কয়, এক বিনে দুই নয় আল্লাহ জগতময়
কোনো জায়গা ছাড়া নয় মাবুদ আল্লাহ হয় ॥
হাসনরাজা নয় আল্লাহ বিনে কিচ্ছু নয়
ত্রিজগৎ জুড়িয়া দেখি কেবল আল্লাহময় ॥
আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ হাসনরাজা কয়
আমিত্বকে নাশ করিলে সবই দয়াময় ॥

(আহমেদ, ২০১৯ : ২৬৭)

18

Hason Raja says there is no duality,
Allah is one and omnipresent.
Sans Allah, there's no place anywhere.
There's nothing but Allah
Everything becomes Allah.
Throughout the universe I see only Allah exists
I'm Allah, I'm Allah; Hason Raja says
Killing my own entity, I see only my Lord is the Merciful.

(আহমেদ, ২০১৯ : ২৬৮)

১৯

নিশা লাগিল রে, বাঁকা দুই নয়নে
নিশা লাগিল রে
হাসনরাজা প্যারীর প্রেমে মজিল রে ॥
ছটফট করে হাসন, দেখিয়া চান্দমুখ
হাসনজানের মুখ দেখি, জন্মের গেল দুখ ॥
হাসনজানের রূপটা দেখি, ফালদি ফালদি উঠে
চিড়াবারা হাসনরাজার বুকের মাঝে কুটে ॥

(আহমেদ, ২০১৯ : ২৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

20

Infatuation, its infatuation in two eyes
Hason Raja has lost himself in love with Darling
He became impatient observing Her moon-like-face
The pains of whole life cease to exist.
His heart leaps up to see Her beauty
The longing creeps in the mind of Hason Raja.

(আহমেদ, ২০১৯ : ২৩৭)

২১

বাউলাকে কে বানাইল রে, হাসনরাজা রে
বাউলা কে বানাইল রে ॥
বানাইল বানাইল বাউলা, তার নাম হয় যে মৌলা
দেখিয়া তার রূপের ছটক, হাসনরাজা হইল আউলা ॥
হাসনরাজা হইছে পাগল, প্রাণবন্ধের কারণে
বন্ধু বিনে হাসনরাজায়, অন্য নাহি মানে ॥
হাসনরাজা গাইছে গান, হাতে তালি দিয়া
সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া শোনে, হাসনরাজার প্রিয়া ॥

(আহমেদ, ২০১৯ : ২৫৭)

22

Who turned Hason Raja into pieties?
Who is He who made him crazy?
The One who made him Maula?.
When Hason Raja saw effulgence of His form he
became deranged
Hason Raja has become crazy because of his Friend
Besides his Friend he acknowledges no one else
Hason Raja sings his songs and claps his hands

(আহমেদ, ২০১৯ : ২৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. আহমেদ, সৈয়দ জামিল, (২০১৯), *হাসন রাজা ও তাঁর সাধনা*, হাসনরাজা মিউজিয়াম ট্রাস্ট, সুনামগঞ্জ

২. ইমাম, শুভেন্দু, (২০১৩), *শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

৩. ইসলাম, শেখ মকবুল (২০২২), *হাসন পদাবলি : সাধন-সৃজনের বোধান্বয়ন*। রিসার্চ পাবলিকেশন, কলকাতা

৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, (১৩৮০), *রঙ্কিম রচনাবলি*, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬১)

৫. চৌধুরী, কবীর, (২০০৮), *সাহিত্যকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৬. চৌধুরী, মোমেন, (২০০৯), *একজন প্রেমিক মন*, *হাসন রাজা সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (২০১১), *প্রবন্ধসমগ্র*, সময় প্রকাশন, ঢাকা

৮. দত্ত, রাধারমণ, (২০০২), *রাধারমণ গীতিমালা*, নন্দলাল শর্মা (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৯. দাস, শ্রীশচন্দ্র, (২০০৩), *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা

১০. দাস, সুমনকুমার, (২০১২), *অগ্রন্থিত রাধারমণ*, অ্যাডর্ন পাকলিকেশন, ঢাকা

১১. দাসগুপ্ত, শশিভূষণ, (১৩৯৬), *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে*, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১২. বাগচী, তপন, (২০১৩), *রাধারমণের গান*, বর্ণায়ন, ঢাকা

১৩. মাননান, আবদেল, (২০১০), *লালনসমগ্র*, নালন্দা, ঢাকা

১৪. রাজা, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার, (২০০৯), *হাছন রাজ সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

১৫. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ, (১৯৯৩), *বাঙলা ছন্দ*, একাদশ সংস্করণ, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ (প্রা.) লি., কলিকাতা (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৬)

১৬. শর্মা, নন্দলাল, (২০১৯), *রাধারমণ গীতিমালা*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

১৭. সরকার, যতীন, (২০১৪), *জালালগীতিকা সমগ্র*, নন্দিত, ঢাকা

১৮. সেলিম, মাহমুদ ও রায়, বিশ্বজিৎ, (২০১৬), *স্মৃতিসত্ত্বায় রাধারমণ*, রাধারমণ সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র, ঢাকা

১৯. হাই, মুহম্মদ আবদুল ও শরীফ, আহমদ, (১৯৯৮), *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

২০. Haroonuzzaman, (2011). *Radharomon*. Adorn Publication, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা–দুই বাংলার লোকসাহিত্যের জগতে দুটি শক্তিশালী নাম, যাঁরা ভিন্ন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারক হলেও একই মূলধারার একটি অভিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। রাধারমণ দত্ত ছিলেন বৈষ্ণব ভাবধারার অনুসারী, আর হাসন রাজা ছিলেন সুফি ও ইসলামি মরমিয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের এই ধর্মীয় অবস্থান তাঁদের গানকে ভিন্ন এক আধ্যাত্মিক রূপ দিলেও মানবিক অনুভূতি, আত্মার আর্তি এবং স্রষ্টার প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা-এই মৌলিক চেতনাতেই তাঁরা অভিন্ন হয়ে ওঠেন। তাঁদের গান ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আধ্যাত্মিকতা কখনো সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না, বরং তা মানবিক সত্তার চূড়ান্ত প্রকাশ হয়ে ওঠে।

এই দুই সাধক কবির গান সমাজের প্রান্তিক মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে, কারণ তাঁরা তাঁদের কাব্য ও সুরে তুলে এনেছেন সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ এবং অতল এক অন্তর্দর্শনের খোঁজ। রাধারমণ যেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের রূপককে ব্যবহার করে আত্ম-উন্মোচনের পথ দেখান, সেখানে হাসন রাজা ইশক-ই-মজাজি ও ইশক-ই-হাকিকির মধ্যে এক সূক্ষ্ম সেতুবন্ধন তৈরি করেন। তাঁরা উভয়েই স্রষ্টাকে খুঁজেছেন প্রেমের ভেতর দিয়ে–কেউ সামাজিক আচার ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে, কেউবা একাকী ধ্যান ও ত্যাগের চর্চায়। যেমন রাধারমণ বলেন :

শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধু রে, বন্ধু তুমি আদরেরি ধন।
তুমি আমার আমি তোমার জানে সর্বজন ॥
কত কোটি আরাধনে রে ও বন্ধু- পাইয়াছি চরণ।
ওরে অভাগিনীর প্রেম জ্বালা কর নিবারণ ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে রে ও বন্ধু- করি নিবেদন।
তোমারে লইয়া কোলে আমার হয় যেন মরণ ॥

ইশকি মজাজির মধ্য দিয়ে ইশক-ই-হাকিকির ভিতরে প্রবেশ করে হাসন রাজা বলেন :

আমিই মূল নাগর রে
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে ভব সাগরে রে ॥

Dhaka University Institutional Repository

আমি রাধা আমি কানু আমি শিব শঙ্করী
অধর চাঁদ হই আমি আমি গৌর হরি ॥
খেলা খেলিবারে আইলাম এ ভবের বাজারে
চিনিয়া না কোনজনে আমায় ধরতে পারে ॥
আমিই মূল আমিই কূল আমি সর্ব ঠাঁই
আমি বিনে এ সংসারে আর কিছু নাই ॥
নাচ নাচ হাসন রাজা কারে কর ভয়
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া জাতে হইছ লয় ॥

রাধারমণ দত্তের গান প্রধানত বৈষ্ণব পদাবলির আদলে রচিত, কিন্তু সুর ও ছন্দে তিনি লোকসংগীতের পরম্পরাকে এক নতুন মাত্রা দেন। তাঁর সৃষ্ট ধামাইল গান আজও গ্রামীণ বিয়ের অনুষ্ঠানে জনপ্রিয়; এর মধ্য দিয়ে একধরনের সামষ্টিক ভক্তি ও আনন্দের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, হাসন রাজার গান একেবারেই অন্তর্মুখী। তাঁর গানে পাওয়া যায় মরমি আত্মজিজ্ঞাসা, পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব এবং স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর রচনায় সুফি দর্শনের যে উপাদানগুলি বিদ্যমান, তা কোনো বিশেষ ধর্মের প্রচারের চেয়ে বরং একটি সার্বজনীন মানবিক চেতনার ওপর জোর দেয়।

সুর ও ছন্দের বিচারে রাধারমণ ও হাসন উভয়েই লোকসঙ্গীতের নানা উপধারা যেমন ভাটিয়ালি, মারফতি, মুর্শিদি, সারিগান প্রভৃতি ধারার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। রাধারমণ বৈষ্ণব রাগ-রাগিণীর সঙ্গে ধামাইলের মিলন ঘটিয়ে এক নবতর ঘরানার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর গানগুলোয় শাস্ত্রীয় রাগের ছায়া যেমন দেখা যায়, তেমনি লোকছন্দ ও কথ্য ভাষার সহজতা সেগুলোকে করে তুলেছে সাধারণ মানুষের সম্পদ। হাসন রাজার ক্ষেত্রে, তাঁর গানগুলোয় প্রচলিত রাগ–ছন্দে না চলেও আবেগ ও সুরের নিজস্ব ধারা তৈরি হয়েছে, যা সিলেটি উপভাষার গভীর আত্মনিবেদন ও আত্মজিজ্ঞাসার উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠেছে।

তাঁদের গানে সাহিত্যমূল্য বিচার করলে দেখা যায় যে, তা কেবল সংগীতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক একটি কাব্যিক রচনার মতোই তা গভীর জীবনবোধ ও মানবিক চেতনার ধারক। রাধারমণের ভাষা ছিল সহজ, ছন্দবদ্ধ এবং চিত্রময়। প্রেম, বিরহ, ভক্তি ও প্রকৃতির এক অপূর্ব সমাহার তিনি গড়েছেন তাঁর পদাবলিতে। অন্যদিকে হাসন রাজা তাঁর গানগুলোয় ব্যবহার করেছেন সরল সিলেটি উপভাষা, যা তাঁর মরমি ভাবনার গভীরতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে অসাধারণ দক্ষতায়। তাঁর শব্দচয়ন, উপমা ও রূপকল্প একাধারে কবিত্বপূর্ণ ও দার্শনিক-যা লোকসাহিত্যের পরিধিকে প্রসারিত করেছে বহু দূর।

Dhaka University Institutional Repository

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানে যে নান্দনিক বৈচিত্র্য পাওয়া যায় তা কেবল তাঁদের সুরকার বা গীতিকার পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁরা ছিলেন চিন্তাবিদ, সমাজ-ভাবুক ও আধ্যাত্মিক পথের পথিক। রাধারমণের গানে যেমন পার্থিব আনন্দের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মোক্ষের মিলন ঘটে, তেমনি হাসন রাজার গানে ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ, ত্যাগ ও নিঃস্বতা এক গভীরতর দার্শনিক উচ্চতায় পৌঁছে যায়।

এই দুই লোককবির অবদান বাংলা লোকসংগীতকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি বরং তারা প্রমাণ করেছেন যে আধ্যাত্মিক চেতনা, সংগীত এবং কাব্য মিলেই মানুষের আত্মার প্রকৃত ভাষা। ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা সামাজিক পরিচয়কে অতিক্রম করে তাঁরা যে ধারা তৈরি করেছেন, তা আজও জীবন্ত এবং প্রাসঙ্গিক। তাঁদের গান আজও গীত হয়, চর্চিত হয়, গবেষণা হয়–এটা কেবল তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বকেই নয়, বরং তাঁদের সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতাকেও প্রমাণ করে।

যদিও তাঁদের গানের প্রতি শিল্পী ও গবেষকদের দিনদিন আগ্রহ বাড়ছে, কিন্তু মূল দর্শন ও রচনাশৈলী অনেক সময় মূল হারাচ্ছে। কিছু শিল্পী শুধু গানটির জনপ্রিয় অংশ গ্রহণ করে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবেশন করছেন, যার ফলে গানগুলোর মূল ব্যঞ্জনা হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, অনেক গান এখনো গ্রন্থিত হয়নি, ফলে মৌলিক রচনাগুলোর সংরক্ষণ ও সঠিক পরিবেশনার অভাব রয়েছে। এছাড়া, প্রযুক্তি–নির্ভর পরিবেশনায় যন্ত্রানুষঙ্গ কখনো কখনো মূল ভাবধারাকে ছাপিয়ে যায়, যা গানগুলোর বৈষ্ণব ও মরমি আবহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

রাধারমণ ও হাসন রাজার গানের চর্চা এখন এক নবজাগরণে পৌঁছেছে বলা চলে। নতুন প্রজন্মের শিল্পী, গবেষক ও শ্রোতারা যদি এই গানগুলোর আত্মিক দিক ও দর্শন অনুধাবনের চেষ্টা করেন, তবে এই গানের ঐতিহ্য আরো সমৃদ্ধ হবে। প্রামাণ্য দলিল, সংরক্ষণশীল পরিবেশনা এবং গবেষণাভিত্তিক চর্চার মাধ্যমে রাধারমণ ও হাসন রাজার গান বাংলা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে টিকে থাকবে বহুদিন।

সবশেষে বলা যায়, রাধারমণ দত্ত ও হাসন রাজা–যাঁরা ভিন্ন পরিমণ্ডলের মানুষ, কিন্তু অভিন্ন এক সাধনার পথিক। তাঁদের গানের মধ্যে নিহিত রয়েছে বাঙালির আত্মা, ভাবনা, বিশ্বাস এবং বোধ। তাঁদের গানে আমরা খুঁজে পাই প্রেমের অন্তহীন পথ, আত্মার আত্মসন্ধান এবং স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের এক অনবদ্য সম্পর্ক। এই সংগীত কেবল শোনা বা গাওয়ার জন্য নয়, বরং উপলব্ধির জন্য–নিজেকে জানার, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এক অনন্ত যাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আলী, মীর লিয়াকত, (২০১৫), *হাসন রাজার গান*, মুন্নী প্রকাশ, ঢাকা

আলী, মুহম্মদ আসাদ্দর, (২০১৫), *মরমী সাহিত্যে জালালাবাদ*, জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, সিলেট

আহমদ, আফসার, (১৯৯৮), *গাজীর গান : শিল্পরীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আহমদ, ওয়াকিল, (১৯৯২), *বাংলার লোকসঙ্গীত : সারিগান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

....., (২০০১), *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা

....., (২০০৬), *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা

....., (২০০৯), *বাংলা লোকসংগীত : ভাটিয়ালী*, লেখক সমবায়, ঢাকা।

আহমেদ, সৈয়দ জামিল, (২০১৯), *হাসন রাজা ও তাঁর সাধনা*, হাসনরাজা মিউজিয়াম ট্রাস্ট, সুনামগঞ্জ

ওয়াহাব, আবদুল, (২০০৯), *লালন-হাসন জীবন-কর্ম-সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আহ্মাদ, মোস্তাক, (২০০০), *হাসন রাজার মরমী সংগীতে সূফিরহস্য*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা

আহমেদ, মোস্তাক, (২০১৯), *হাসন রাজার মরমী সংগীতের সুফি রহস্য*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা

ইমাম, শুভেন্দু, (২০১৩), *শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

ইসমাইল, তরফদার মুহাম্মদ, (২০০৪), *সূফী দার্শনিক কবি শেখ ভানু*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, মোহাম্মদ আজহারুল, *লোককবি রাধারমণ : জীবনদর্শন ও কবিতা*, ঢাকা

ইসলাম, শেখ মকবুল (২০২২), *হাসন পদাবলি : সাধন-সৃজনের বোধান্বয়ন*। রিসার্চ পাবলিকেশন, কলকাতা

ইসলাম, সামীয়ূল, (২০০৭), *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের শ্রেণীবিন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

উল্লাহ, আহমদ, (২০১৫), *রাধারমণ দত্ত স্মারকগ্রন্থ*, জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ

ওয়াহাব, আবদুল, (২০০৮), *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমি

কবীর, জাহিদুল, (২০২২), *রাধারমণ দত্ত লোকদর্শন ও গীতিরূপ বিশ্লেষণ*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

....., (২০২১), *বাঙালির মরমি সাধনায় হাসন রাজার গান*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

কাদির, আবদুল, (২০০১), *ছন্দ-সমীক্ষণ*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা

খান, মোহাম্মদ আলী, (২০০৬), *মরমি কবি রাধারমণ দত্ত*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা

গোবিন্দদাস, (১৯৯৮), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

....., (২০১০), *বৈষ্ণব পদাবলি*, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

গোস্বামী, করুণাময়, (১৯৮৫), *সঙ্গীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, (২০০৮), *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

চক্রবর্তী, মৃদুলকান্তি, (২০২০), *লোকসঙ্গীত ও স্বরলিপি*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, (১৩৮০), *রঙ্কিম রচনাবলি*, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৩৬১)

চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র, (১৯৯১), *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত : ভাওইয়া ও চটকা*, গ্রন্থমন্দির প্রকাশন, কোলকাতা

চৌধুরী, অনিমেষ বিজয়, (২০২১), *অনিন্দ্য সুষমার কবি রাধারমণ*, গীতবিতান বাংলাদেশ।

চৌধুরী, অমিয়শঙ্কর, (২০০০), *প্রসঙ্গ হাসন রাজার সঙ্গীতমালা*, কলকাতা

চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পা.), (২০০৯), হাসন রাজা মরমি মৃত্তিকার সফল, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

চৌধুরী, কবীর, (২০০৮), *সাহিত্যকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

চৌধুরী, বিজনকৃষ্ণ, *বাউল কবি রাধারমণ*, বাংলা লাইব্রেরি, আগরতলা, ত্রিপুরা

চৌধুরী, মোমেন, (২০০৯), *একজন প্রেমিক মন, হাসন রাজা সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

চৌধুরী, রামশঙ্কর, (১৯৯১), *লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

ছাইফুদ্দিন, খাজা মুহম্মদ, (১৯৯৪), *আহলে বাইত ও শহীদে কারবালা*, মুজাদ্দেদিয়া তরিকত মিশন একাডেমী, ময়মনসিংহ

ছামিরউদ্দিন, মোঃ, (১৯৯৫), *ফুরাত কূলে ইমাম হোসাইন*, দ্বীনে হক প্রকাশনী, গাজীপুর

জলিল, মুহাম্মদ আব্দুল, (১৯৯৩), *লোকসাহিত্যের নানা দিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জুবেরী, আবু সাঈদ, (২০১৭), *মরমী কবি হাসন রাজা*, দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (২০১১), *প্রবন্ধসমগ্র*, সময় প্রকাশন, ঢাকা

....., (২০১৬), *সংগীতচিন্তা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

দত্ত, রাধারমণ, (২০০২), *রাধারমণ গীতিমালা*, নন্দলাল শর্মা (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

দাশ, নৃপেন্দ্রলাল, (২০০৮), *রাধারমণ, তাঁর শাক্ত পদাবলী*, শ্রীমঙ্গল

দাস, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৭৫), *ধর্ম ও দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

দাসগুপ্ত, শশিভূষণ, (১৩৯৬), *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে*, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

দাস, শ্রীশচন্দ্র, (২০০৩), *সাহিত্য-সন্দর্শন, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ : পুনর্মুদ্রণ*, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা

দাস, সুমনকুমার, (২০১০), *বাংলাদেশের ধামাইল গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

....., (সম্পা.), (২০১১), *অগ্রন্থিত রাধারমণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

......, (২০১১), *আরকুম শাহ সমগ্র*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

দেব, সৌমিত্র, (২০১৯), *হাসন রাজার জীবন ও গান*, প্রকাশ বাংলা, ঢাকা

নূরী, আবদুল মালেক, (২০০৮), *সুফীবাদ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

পাল, আশিস্, (২০০১), *নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত : বাংলা লোকসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, শ্রী সজনীকান্ত, (১৩৫৮), *পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী*, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

বাউল কবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ, (১৯৮৮), সরস্বতী বুক ডিপো, আগরতলা, ঢাকা

বাগচী, তপন (সম্পা.), (২০০৯, ২০১৩), *রাধারমণের গান*, বর্ণায়ন, ঢাকা

বিল্লাহ, বাকি, (২০১৭), "হাসন রাজার অন্তঃপুরে", *প্রথম আলো*, ঢাকা

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, (১৯৫৭), *বাংলার লোকসংগীত*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা

ভট্টাচার্য্য, বিপ্রদাস (সম্পা.), (২০১৫, ২০২১), *রাধারমণ-এর গান ও স্বরলিপি*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা

ভট্টাচার্য, শরদিন্দু, (২০০৯), *বাউল বৈষ্ণব সুফী*, রেনেসাঁ প্রকাশনী, ঢাকা

ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, (১৯৬৮), *বৈষ্ণ কবিতা*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা.লি, কলকাতা

ভবানন্দ, দীন, (২০১২), *বাংলাদেশের বাউল ফকির : পরিচিতি ও গান*, সুমনকুমার দাস সম্পাদিত, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা

মজনু, সাখাওয়াত হোসেন, (১৯৯৭), *সুফীতত্ত্বের গবেষক ছৈয়দ আহমাদুল হক*, সৃজনী প্রকাশনী সংস্থা, চট্টগ্রাম

মজুমদার, বিবানবিহারী, (১৩৯৮), *পাঁচশত বছরের পদাবলী*, জিজ্ঞাসা প্রকাশন, কলকাতা।

মণ্ডল, অনুপম হীরা, (২০১০), *বাংলাদেশের লোকধর্ম : দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মল্লিক, শ্রী শ্রী হর্ষ, (১৯৮৬), *প্রসঙ্গ লোকগীতি*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা

মাননান, আবদেল, (২০১০), *লালনসমগ্র*, নালন্দা, ভারত

মিত্র, রাজেশ্বর, (১৯৯৫), *বাংলার সংগীত (মধ্যযুগ)*, মিত্রালয়, কলিকাতা

মোস্তফা, গোলাম, (১৯৯৬), *বিশ্বনবী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

রশীদ,ফকির আবদুর, (২০০০), *সূফী দর্শন*, প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ঢাকা

রহমান, আবদুর, (২০০৪), *বিশ্ব নবী (সঃ)-এর মেরাজ*, তানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

রহমান, চৌধুরী শামসুর, (২০০২), *সূফিদর্শন*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা

রহমান, ফজলুর, (১৯৯৪), *সিলেটের একশত একজন*, সিলেট

রহমান, হাবিবুর, (১৯৮২), *বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রাজা, দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার (সম্পা.), (২০০৯), *হাসন রাজা সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

রায়, জীবেন্দ্র সিংহ, (১৯৯৩), *বাঙলা ছন্দ*, একাদশ সংস্করণ, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ (প্রা.) লি., কলিকাতা, (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৬)

রায়, নীহাররঞ্জন, (১৩৭৩), *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা

রায়, বিশ্বজিৎ (সম্পা.), *রাধারমণের অপ্রকাশিত গান*, ঢাকা

শরীফ, আহমদ, (১৯৯৮), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

শর্মা, নন্দলাল, (১৯৯৫), *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন*, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, সিলেট

....., (সম্পা.), (২০১৪), *রাধারমণ গীতিমালা*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

....., (সম্পা.), (২০১৯), *রাধারমণ গীতিমালা*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

শর্মা, প্রভাত কুমার, " মরমি কবি হাসন রাজা",...

শরীফ, আহমদ, (২০১০), *বাউল ও সুফী সাহিত্য*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা

শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, (২০০৯), *বাংলার বাউল*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, (১৯৮৪), *ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

....., (১৯৯২), *বাংলার বাউল দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

....., (১৯৯৪), *লালন শাহের মরমী দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সরকার, যতীন, (২০১৪), *জালালগীতিকা সমগ্র*, নন্দিত, ঢাকা

সাহা, অসীম, (২০১৬), "রাধারমণ দত্তের গানের অন্তর্গত মহিমা", *দৈনিক সুনামকণ্ঠ*

সিংহ, যোগেশচন্দ্র, (১৯৮০), *ধ্যাণী রবীন্দ্রনাথ*, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, অন্দরকিল্লা, চট্রগ্রাম

সিদ্দিকী, আশরাফ, (২০০৮), *লোক-সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)*, গতিধারা, ঢাকা

সুবাসউদ্দীন, মোহাম্মদ, (২০১৩), *বৈষ্ণব কবি রাধারমণ দত্ত ও তাঁর ধামাইল গান*, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

সেন, নীলরতন, (২০০০), *বৈষ্ণব পদাবলি পরিচয় : নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

সেন, সুকুমার, (২০১০), *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ প্রকাশ, কলকাতা

সেলিম, মাহমুদ ও রায়, বিশ্বজিৎ, (২০১৬), *স্মৃতিসত্তায় রাধারমণ*, রাধারমণ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা

হাই, মুহম্মদ আবদুল ও শরীফ, আহমদ, (১৯৯৮), *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা*, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

হাবিব, রহমান, (২০০৯), *বাংলা গানের ভাবসম্পদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হাফিজ, আবদুল, (১৯৭১), *বাঙ্গালীর আত্ম-অনুসন্ধান ও লোক ঐতিহ্যের চর্চা*, মুজিবনগর

হোসাইন, আবু আলী সাজ্জাদ, (১৯৯৫), *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা

Haroonuzzaman, (2011), *Hason Raja*, Adorn Publication, Dhaka

Rizvi S.N.H. (1970). *Bangladesh (East Pakistan) District Gezetteers,* Sylhet

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

রাধারমণের বংশলতিকা

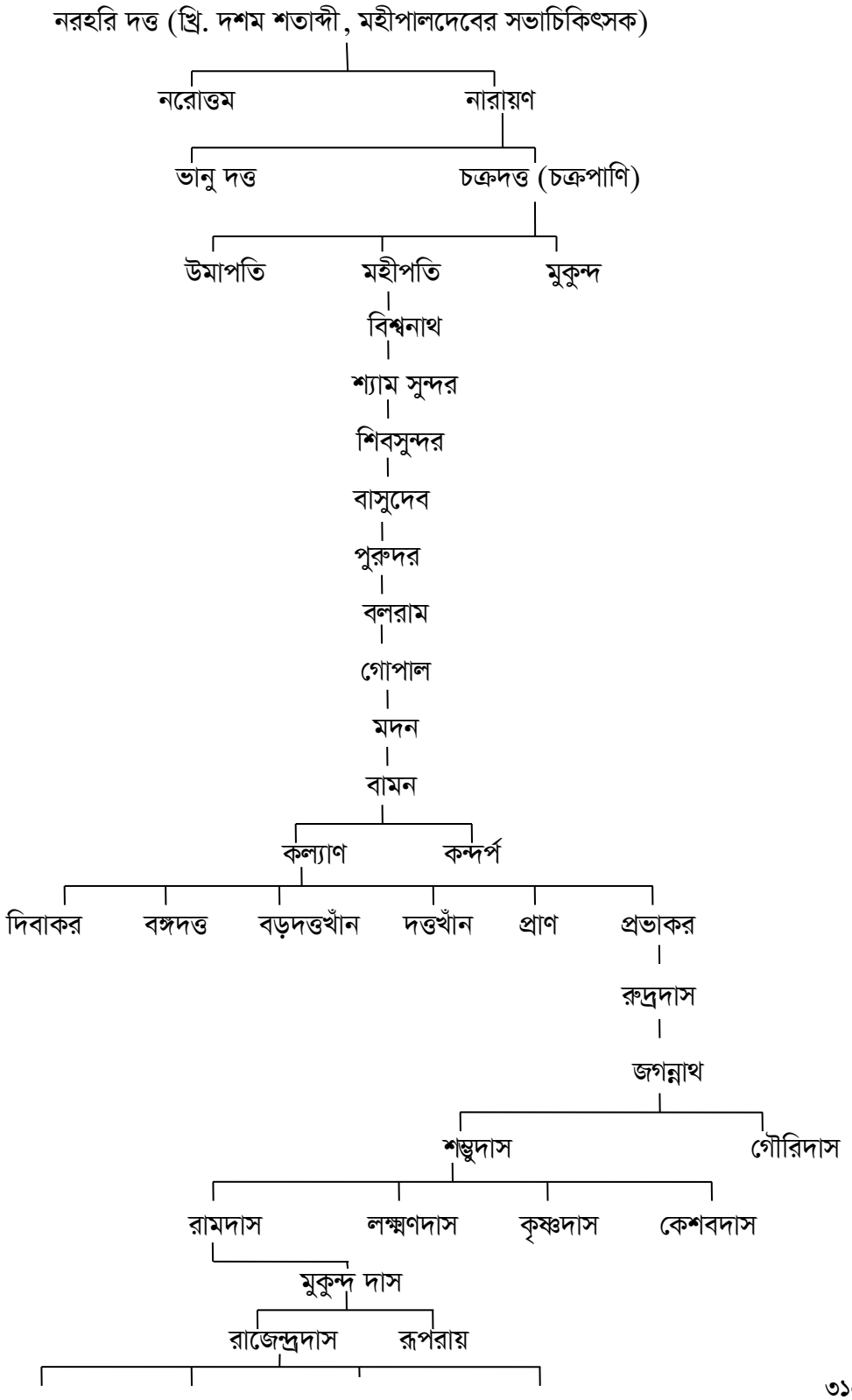

Dhaka University Institutional Repository

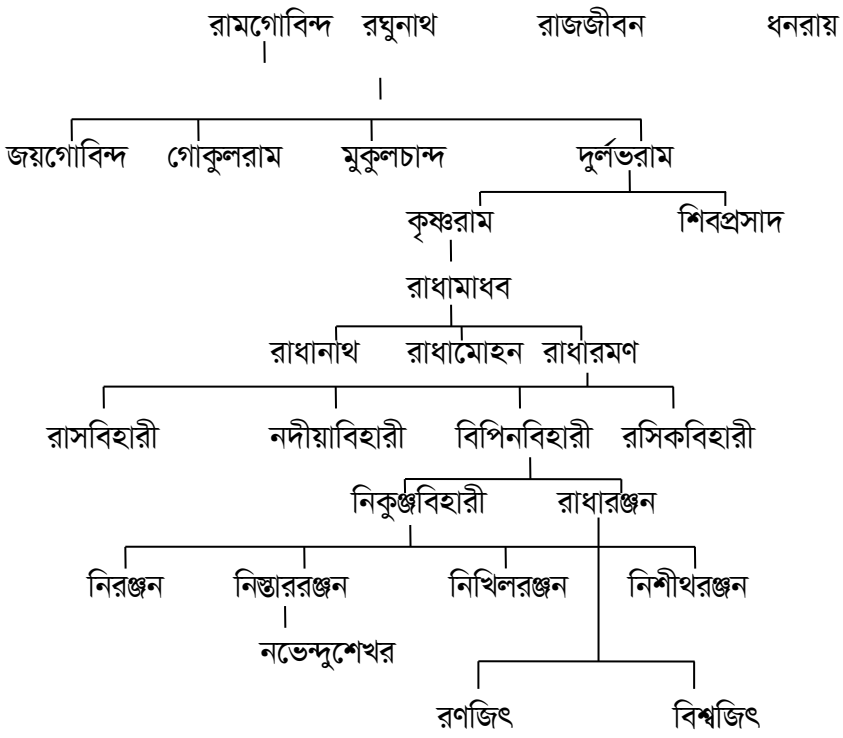

উৎস : রাধারমণ গীতিমালা থেকে সংকলিত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

হাসন রাজার বংশলতিকা

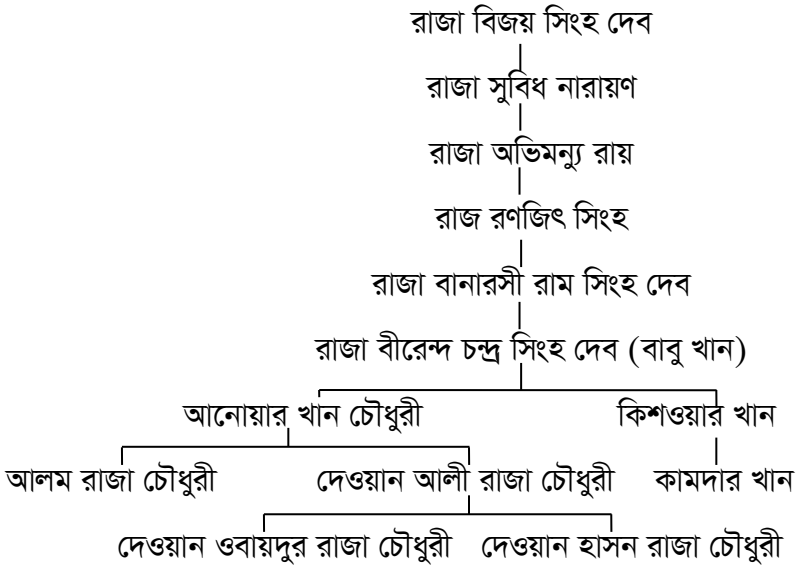

উৎস : হাছন রাজা সমগ্র থেকে সংকলিত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

রাধারমণের আত্মপরিচয়ক ত্রিপদী

রাধারমণকৃত আত্মপরিচয়ক ত্রিপদী

দক্ষিণরাঢ়েতে ধাম নাম তার সপ্তগ্রাম
পূর্বত্তর সুরধুনী ধার ॥
অতি সুপ্রসিদ্ধ নাম গুণ অতি অনুপম
চক্রদত্তখ্যাত সংসার ॥ ১॥
গয়ার মুকুন্দ দত্ত নরোত্তম ভাগবত
ভগবত ভক্তির আধার ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্ত মহন্ত মধ্যে গণিত
সাধু শাস্ত্রেতে আছে প্রচার ॥ ২॥
আপন রচিত গ্রন্থ নাম তার চক্রদত্ত
দৈব ঔষধ চিকিৎসার ॥
নিদানাদি নাড়িজ্ঞান রোগনাশে অনুপম
পরিমিত ব্যবস্থা তাহার ॥৩॥
ঐ চক্রদত্ত জাত দক্ষ বড় দক্ষ খ্যাত
বৈদ্য শাস্ত্রে পূর্ণ অধিকার ॥
কৃত সাধ্য বৈদ্য যুত জাতিতে পূর্ণ কায়স্থ
ধন্য ধন্য নদীয়া মাঝার ॥৪॥
গৌড় দেশে পুরাতন গৌড় গোবিন্দ রাজন
স্ত্রী জল দয়িতে সবাকার ॥
দেশে নাই কবিরাজ মরণের নাই ব্যাজ
লক্ষণেতে করিয়া বিচার ॥৫॥
নদীয়ার রাজা স্থানে লিপি লিখে ততক্ষণে
পাঠাইতে দত্তের কুমার ॥

Dhaka University Institutional Repository

অতি বৃদ্ধ চক্রদত্ত দূরে চলিতে অশক্ত
রাজ আজ্ঞা যায় নদীয়ায় ॥৬॥
পুত্র দিতে মনদুঃখী রাজ-আজ্ঞা কিসে রাখি
মনে ভাবি বারংবার ॥
বড় দত্ত খাঁ সত্তর যেতে হবে দেশান্তর
স্ত্রী চিকিৎসা করিতে রাজার ॥ ৭ ॥
ভালো হইলে মিলবে রাজ্য টাকা পয়সার কার্য
রাজ-আজ্ঞা কর্তব্য স্বীকার ॥
দত্ত খাঁ দেন উত্তর যাব দুই সহোদর
এ বাঞ্ছা হইয়াছে আমার ॥ ৮ ॥
কোন দিকে গৌড় দেশ পন্থ কহ সবিশেষ
যাব পিতা আদেশে তোমার ॥
কদ্দূর পূর্বসীমানা উত্তর-দক্ষিণ জানি না
দীর্ঘে প্রস্থে কতই বিস্তার ॥ ৯ ॥
লোক কথোপকথন রাঢ় গৌড় বৃন্দবন
প্রত্যুত্তর জান সারাসার ॥
প্রত্যুত্তরে নিবেদন গৌড়রাজ্য বিবরণ
যাহাতে অদ্বৈত অবতার ॥ ১০ ॥
এই স্থির করি মনে তিনভাই এক স্থানে
ক্রটি হবে নিজ ব্যবসার ॥ ১১॥
সুলগ্নে অতি সত্বরে আতুযান কেশবপুরে
চলিলেন স্থান দেখিবার
নিকটেতে রাজধানী বিজয় সিংহ নৃপমণি
ব্রহ্ম বংশে জন্ম তাহার ॥ ২৬ ॥
নিত্যনব জলে স্নান পূজা সন্ধ্যা জ্ঞান ধ্যান
সদ্‌চরিত্র সদ্ব্যবহার ॥

Dhaka University Institutional Repository

স্থান অতি মনোরম মৎস্য দুগ্ধে সুগম
যজ্ঞভূমি কৃষি ব্যবসার ॥ ২৭ ॥
আম কাঠাল ছন বাঁশ অতি উত্তম গোগ্রাস
ব্রাহ্মণ ভদ্র বহু চতুর্ধার ॥
হেরি দত্ত প্রভাকর কেশবপুর করি ঘর
হইয়ে রাজনিধিস্থাধার ॥ ২৮ ॥
সেই বংশে সম্ভ্রান্ত যে রাধামাধব দত্ত
বহু তত্ত্ব গ্রন্থে অধিকার॥
জয়দেব পাণ্ডবগীতা জ্যোতিষাদি ভ্রমরগীতা
মনসা পুরাণের পয়ার ॥ ২৯ ॥
তাল রাগ অনুবন্ধ দ্বিপদী ত্রিপদী ছন্দ
মূলকবি শ্লোকার্থ অনুসারে ॥
সুবর্ণে মণিমুকুতা অতি সুকোমল গাথা
কবিতা মাধুর্য চমৎকার ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ গুরু বাক্যে প্রাণে পণ
সদা সাধু সঙ্গ সদাচার ॥
ঐ কৃষ্ণভক্ত জাত আমি অতি অপদার্থ
শ্রীরাধারমণ দুরাচার ॥ ৩১ ॥
এ বংশে পূর্বাপরে যজ্ঞ বিজ্ঞ ভক্তি রে
লিখিতে গ্রন্থ সবিস্তার ॥
গতানুশোচনা নাস্তি শুনিলে না হবে প্রীতি
বর্তমানে লিখি সারাসার ॥ ৩২ ॥
প্রসন্ন কুমার দত্ত স্থির দান্ত খেমাবন্ত
অতি যত্ন টাকা পয়সার ॥
যতনে রতন মিলে পাকাঘাটে জলস্থলে
পাকা টিন ঘর বিছানার ॥ ৩৩ ॥

Dhaka University Institutional Repository

তবু নাহি মিটে আশা সতত ধন পিপাসা
সুসন্তান না হয় তাহার ॥
সৎকার্যে আছে মন তীর্থধামে পর্যটন
সৎ সঙ্গ সদ্ব্যবহার ॥ ৩৪ ॥
বাবু অভয়চরণ দত্ত পতি বিচক্ষণ
অনুপম জ্ঞান বুদ্ধি যার ॥
অল্প বয়সে উন্নতি উত্তম পদেতে স্থিতি
ডিস্ট্রিক কমিশন সিরিস্থাধার ॥ ৩৫ ॥
সদা সৎ অনুষ্ঠান যোগ্য পাত্রে কন্যাদান
বাসাবাড়ি করিয়ে শিলচার ॥
অমরচন্দ্র মাস্টার দুই এক সহোদর
একত্রেতে বাস দুহুকার ॥৩৬॥
বাবু আনন্দ কিশোর দত্ত সরকারি ডাক্তার
পিতা নবকিশোর পেশকার॥
অতিব্যয়ী লোক শক্তিমন্ত্র উপাসক
মার পূজা ষোড়শোপচার ॥৩৭॥
বহু ধন উপার্জন সৎ কার্যে বিসর্জন
গুরু ঋণ করি পরিষ্কার ॥
জগতে রহিল কীর্তি এই মত গুরুভক্তি
গুরু সেবা জীবের উদ্ধার ॥ ৩৮ ॥
অল্পকাল লোকান্তর কৃষ্ণকিশোর মাস্টার
জেঠাত্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার ॥
পুরাণাদি বেদব্যাস সর্বশাস্ত্রে সক্ষম
পঞ্চ ব্যাকরণে অধিকার ॥ ৩৯ ॥
পঞ্চ ভাষা ছিল জ্ঞাত পণ্ডিত মধ্যে গণিত
প্রকাশিত জিলার মাঝার ॥

Dhaka University Institutional Repository

সামান্য উপায়ী যারা প্রলাপে কম্পিত তাঁরা
সিংহ রাশি সিংহের হুংকার ॥ ৪০ ॥
সিংহ বীর্য অন্য পুত্র জ্ঞানন্দ্রকুমার দত্ত
পুলিশ ইন্সপেক্টর ॥
ইহার জেঠাত্ব ভাই গুণের তুলনা নাই
অতি শান্ত প্রকৃতি তাহার ॥ ৪১॥
যেন কুম্ভে পূর্ণ জল শব্দ নাহি কাম কল
সুগভীর চরিত্র উদার ॥
ব্রজেন্দ্রকুমার নাম গুহ্য জ্ঞান গুণধাম
মোনাসিফির সিরিস্তাধার ॥ ৪২ ॥
নিকটে মাতুলাশ্রম স্থান অতি মনোরম
বর্তমানে মৌলবী বাজার ॥
আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রমোহন দত্ত
হেডপণ্ডিত পঞ্চ ভাষার ॥ ৪৩ ॥
আমার ঔরসজাত এক পুত্র ধীর শান্ত
যাহা লিখন ব্রহ্মার ॥
পেয়ে শ্বশুর সম্পত্তি হয়ে রাজ চক্রবর্তী
বৈসে সিংহাসন মথুরার ॥ ৪৪ ॥
আছেন পরম সুখে ভালোবাসে প্রজালোকে
যেন পিতাপুত্র ব্যবহার ॥
সেন শিবানন্দ দৌহিত্র বিপিনবিহারী দত্ত
খ্যাত পুরকায়স্থ প্রচার ॥ ৪৫ ॥
তস্যপুত্র মমপৌত্র নিকুঞ্জবিহারী দত্ত
বিন্দু আদি সপ্ত ভগ্নী তার ॥
যেন বৃন্দাবন শূন্য মথুরা হইল ধন্য
কৃষ্ণলীলা বুঝা অতি ভার ॥ ৪৬ ॥

Dhaka University Institutional Repository

চিরস্থায়ী কিছু নয় চন্দ্র হ্রাস বৃদ্ধি হয়
দিবানিশি সেইতো আকার ॥
এক বিনে নাম নিত্য আর যত লীলামাত্র
স্থিতি ভঙ্গ আছে সবাকার ॥ ৪৭ ॥

কোথা সেই হনুমান কোথা লক্ষ্মণ শ্রীরাম
কোথা শোভা গেল অযোধ্যার ॥
শূন্য লঙ্কা লঙ্কেশ্বর শূন্য কাশী বিশ্বেশ্বর
কোথা ইন্দ্র রাজা দেবতার ॥ ৪৮ ॥

ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ তুচ্ছ এ সুখ সম্পদ
জম্বু দ্বীপে যম অধিকার ॥
এই বংশে বিখ্যাত দর্পনারায়ণ দত্ত
পাটোয়ারী উপাধি যাহার ॥ ৪৯ ॥

কালেক্টরি কাগজেতে নাম লিখা দস্তখতে
আছে শ্রীহট্ট জৈন্তা কাছাড় ॥
শ্রীহট্ট নগর মাঝে প্রথম কম্পাস কাজে
ইনি নেটিব সারভেয়ার ॥ ৫০ ॥

গিরিশচন্দ্র তস্য নাতি ধনউপার্জনে মতি
টিন ঘর সমূহ তাহার ॥
হরি শঙ্কর মাষ্টার যজ্ঞবিজ্ঞ প্রাজ্ঞবর
সদা মনে পরোপকার ॥ ৫১ ॥

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

রাধানাথ চৌধুরী কর্তৃক রচিত হাসন রাজার আত্মপরিচয়ক ত্রিপদী

রাধানাথ মহাশয় তার গুণ কবার নয়
জাতিতে ব্রাহ্মণ চৌধুরী ॥
আগিয়ারামে যার ঘর শ্রীহট্টের খবর
জানান তিনি নাহি হয় দেরী॥
পর উপকারী সদায় মুখে হরি
এক আল্লা হৃদে আছে গাঁথা ॥
অতি গুণী মান্যমান কে আছে তাঁর সমান
বংশানুক্রমে তাঁরা দাতা ॥
সরল অন্তর যাঁর ঈশ্বরে করিবা পার
এক আল্লার পদে যাঁর ভক্তি ॥
সর্বদা ঈশ্বরে মতি হবে তাঁর সদ্‌গতি
খোদায় করিবা তারে মুক্তি ॥
হীন হাছন রাজা কয় তাঁর গুণ কবার নয়
লেখতে গেলে কলম না চলে ॥
কলম না চলে ভাই তাঁহার মত লোক নাই
প্রতিজ্ঞা পূর্বক হাছন বলে ॥

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

রাধারমণের ছবি

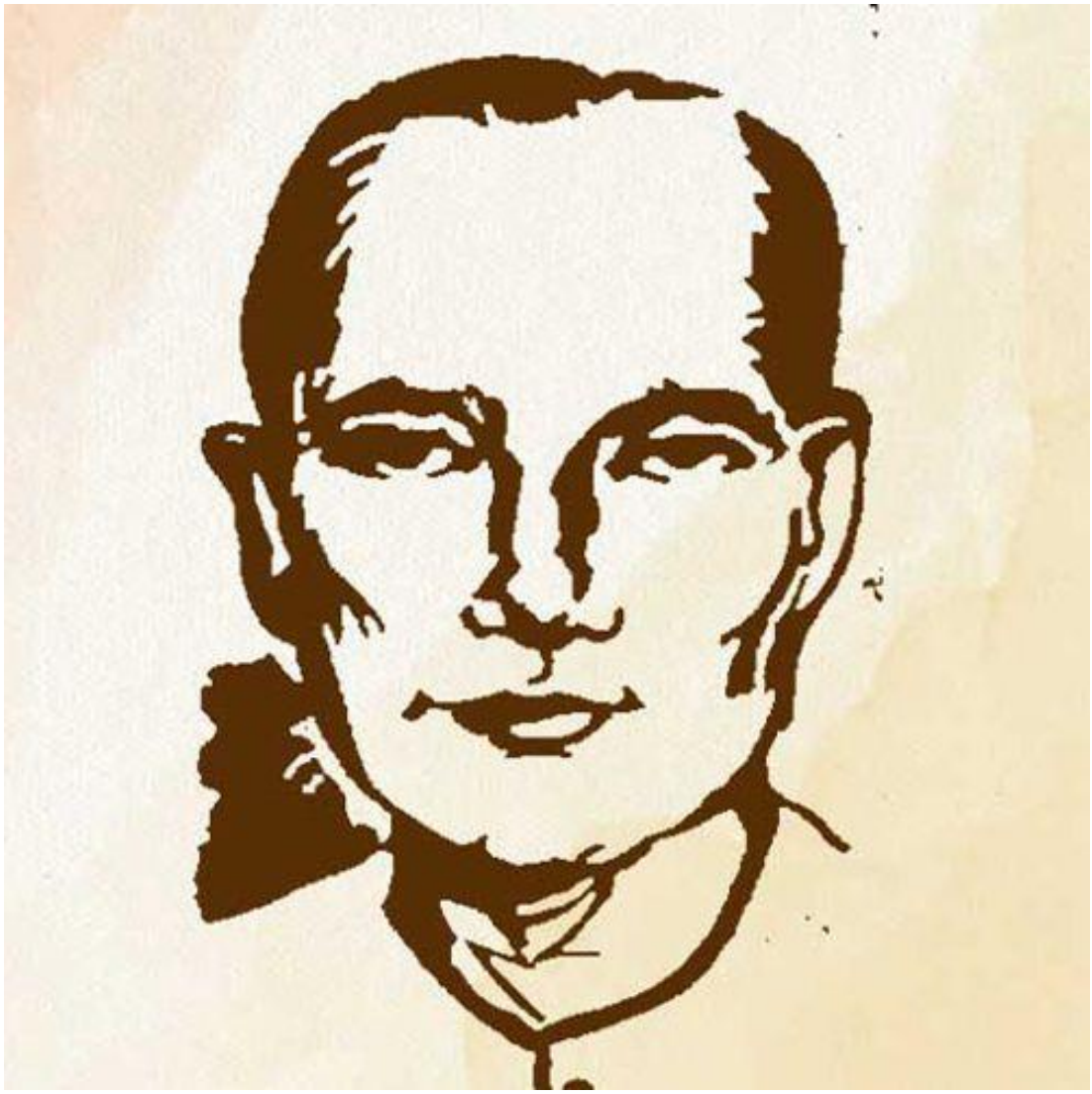

ছবি : রাধারমণ দত্ত। সূত্র : *jiosaavn.com*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

হাসন রাজার ছবি

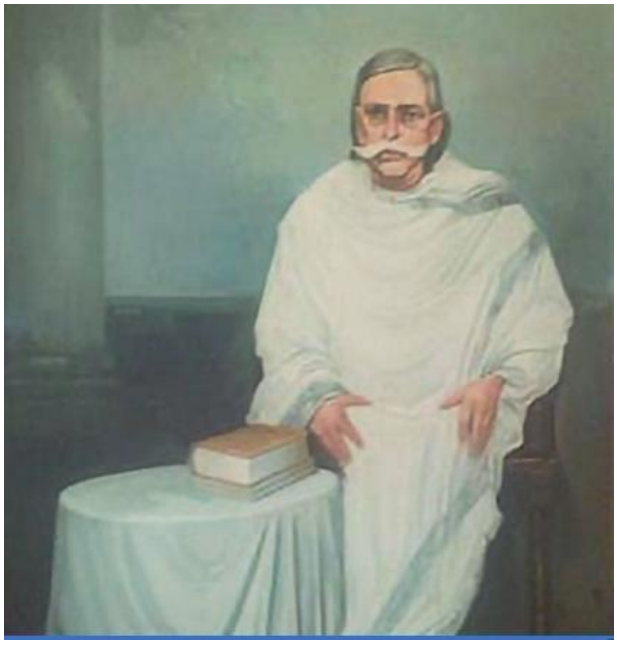

ছবি : হাসন রাজা। সূত্র : *newsg24.com*

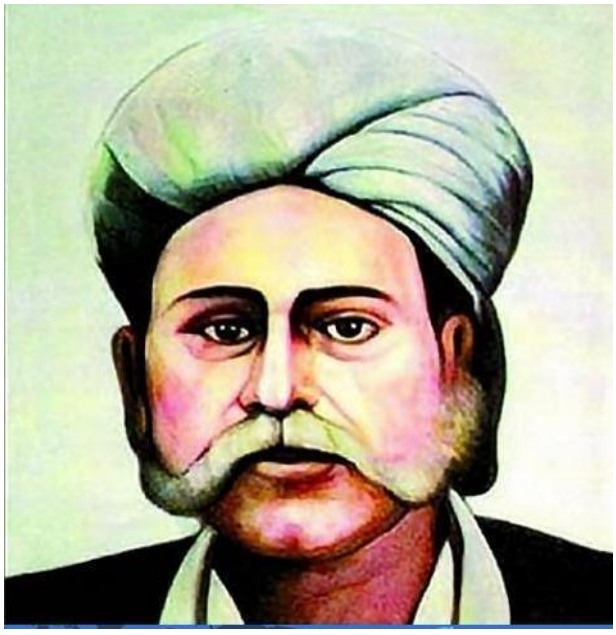

ছবি : হাসন রাজা। সূত্র : *newsg24.com*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

হাসন রাজার বাড়ি

ছবি : হাসন রাজার বাড়ি। সূত্র : *banglanews24.com*